তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক ঃ

সুপ্রিয় সরকার

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫১

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫২

মূল্য চার টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

'দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এবং বন্ধুবর শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ও এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্সের শ্রীসুপ্রিয় সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় 'তিলাঞ্জলি' পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এই সম্পর্কে তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম। শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনী রায় প্রচ্ছদপটের জন্য যে ছবি এঁকে দিয়েছেন তা তাঁর শুভেচ্ছার প্রতীক হিসাবে কৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করেছি।

লেখক

বালিগঞ্জ প্লেসের এই একতলা বাড়িটার দক্ষিণ কোণের ঘরটা সত্যিকারের আর্টিস্ট ও ভাবুক মানুষের পক্ষে একটি আদর্শ আশ্রয়। জানালার পাশেই মাঠটার আরম্ভ। কলকাতার বর্ষার আদরে ঘাসভরা মাঠটা যেন আহ্লাদে ফেঁপে উঠেছে—সতেজ সবুজে কানায় কানায় ভরা। চারদিকের পীচঢালা চারটে রাস্তা যেন পালিশ করা চারটে কালো ফ্রেম, এই সবুজের উচ্ছলতাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। জানালার ঠিক বাইরেই পর পর কতগুলি কাঁঠাল আর শিউলি—একটা বারোমেসে ছায়া জায়গাটাকে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছে। গাছের গোড়ায় কদিন থেকে ঝরা শিউলি জমে উঠেছে। কাঠবিড়ালীর দল গাছ থেকে নেমে মাঝে মাঝে হুটোপুটি ক'রে চলে যায়। বাসি ফুলের থমকানো গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে—বাতাসের আস্বাদ বদলে দেয়।

সূর্য ওঠে আর ডোবে—খোলা জানালার ধারে সময় মত বসে থাকলেই উদয়াস্তের দুই ঘাটে বসে থাকার মত আনন্দ পাওয়া যায়। মাঠের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে কর্নফিল্ড রোডের বাড়ি আর বাগানগুলি একটু উদ্ধত হয়ে ওপরের আকাশপটকে ছুঁয়ে ছোট করে দিয়েছে। যখন বৃষ্টি হয়, তখন স্পষ্ট দেখা যায়—এক গম্ভীর নিসর্গের গলিত জটার মত মেঘগুলি গাছের মাথা ছুঁয়ে ভেসে চলেছে।

অনেক রাত্রে ট্রেন যায় ডায়মণ্ড হারবারের দিকে। শব্দহীন রাত্রির

তিলাঞ্জলি

সুষুপ্তির মধ্যে পথিক-ট্রেণের আভরণগুলি ঠুং ঠুং করে স্বচ্ছন্দে বেজে চলে যায়। শুনতে বেশ লাগে।

এই ঘরটিতে শিশির থাকে। কেউ হয়তো জানে না, শিশির আজকাল গানবাজনা নিয়ে একটা গবেষণা করছে। ঘরের দেয়াল ঘেঁসে একটা লম্বা বেঞ্চ। তার ওপর সারি সারি বিঁড়ে বসানো। বিঁড়ের ওপর কয়েকটা বীণ সেতার আর তানপুরা। একটা মেহগনির স্ট্যাণ্ডে তিনটে হুক থেকে গিটার ব্যাঞ্জো আর ম্যাণ্ডোলিন ঝোলানো। খাটের নীচে আরও হরেক রকমের যত বাদ্যযন্ত্র—তার মধ্যে সারেঙ্গী থেকে আরম্ভ করে ইরানী বেদিয়াদের বেহালা পর্যন্ত নানা জাতির স্বরশিল্পের যত যান্ত্রিক আধার জড়ো করা হয়েছে। তামার তৈরী একটা প্রকাণ্ড ঝাঁপির মধ্যে নানারকম বাঁশী—হাড়ের, শাঁখের, মোষের শিঙের। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ—স্বরলিপি লেখা। আজ পনের বছর ধরে যখন যেখানে পাওয়া গেছে, প্রত্যেকটি সুরের শ্রুতিচ্ছবিকে সে যেন গণিতের শিকল পরিয়ে বন্দী করে রেখেছে খাতার মধ্যে।

কুম্ভমেলায় কাশ্মীরী সাধুদের মুখে একটা ভজন শুনেছিল শিশির। বিকেল বেলা নদীর চড়ার ওপর বসে চিম্‌টে বাজিয়ে সাধুরা গাইছিল।—হে উদাসী সাধু, তুমি হিমানীর নদীর মত। তোমার বুকে কোন পানকৌড়ি ...া করতে আসে না। তোমার ঢেউ নেই, তাই তুমি ঘোলা হও না। তুমি স্থির, তাই তুমি সুখী।

গানের সুরটা লক্ষ জনতার চাপল্য মিথ্যে করে দিয়ে এমন এক উদাস আবেশ সৃষ্টি করেছিল যা সে আজ পর্যন্ত রাগ বেহাগের কোন রূপের মধ্যে পায়নি। সেই অনুভবের সুর ও স্বরকে এক আবিষ্কৃত রত্নের মত বহু সমাদরে ও সাধনায় পাতায় পাতায় চিহ্নিত করে রেখেছে শিশির। এই সব নিয়েই তার সাধনা।

আরও আছে। বছর কয়েক আগে পূজোর ছুটিতে চাঁদপুরে মামাবাড়ি যাচ্ছিল শিশির। স্টীমারটা যখন মাঝ মেঘনায়, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। ঝড় এল। পূব-দক্ষিণ কোণ থেকে একটা অদৃশ্য আক্রোশ আর্ত শব্দে আকাশ উতলা করে উড়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে হাওয়ার ঝাপ্‌টা। স্টীমারটা একদিকে কাৎ হয়ে দিশেহারার মত কখনও প্রবল বেগে, কখনও ধীরে ধীরে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছিল। সব চেয়ে মাৎ করে দিয়েছিল বিদ্যুতের খেলা। আকাশ থেকে ছোট্ট এক একটা লিক্‌লিকে বিদ্যুৎ আগুনে পোড়া সাপের মত ছটফট করে নদীর জলে লাফ দিয়ে পড়ছিল। পর মুহূর্তে জলতলের আড়ালে যোজনব্যাপী একটা অগ্ন্যুৎপাতের সর্পিল ঝলক নিষ্ঠুর ধাঁধাঁর মত ত্রস্ত যাত্রীদের প্রাণভয় আরও ভয়াবহ করে তুলছিল। সেই ক্ষুব্ধ বাতাস আর ঢেউএর শব্দ, স্টীমারের ইঞ্জিনের অবসন্ন স্বর—তার সঙ্গে যাত্রীদের করুণ আক্ষেপ মিশে গিয়ে যে বিচিত্র বিলাপ সৃষ্টি করেছিল, তার স্বরস্বরূপটি শিশিরের খাতায় পঁচিশটি পাতায় স্বরলিপিতে বাঁধা আছে। মনটা যেদিন কোন কারণে খুবই বিমর্ষ থাকে, সেই দিন এই সুরটিকে একবার মুক্তি দেয় শিশির—স্বরোদের তারে। তুচ্ছ কয়েকটা তারের স্পন্দন ছাপিয়ে এক দিব্যধ্বনির আকুলতায় জড় ও প্রাণের সহমরণের সেই জ্বালা যেন নতুন করে শিখায়িত হয়ে ওঠে।

শিশির গবেষণা করছে অর্থাৎ কিছু একটা খুঁজছে। প্রতিবেশীরা কেউ ভাল করে চেনেও না শিশিরকে। তারা শুধু জেনে রেখেছে, শিশির একজন গানের মাস্টার, যদিও গান নিয়ে মাস্টারী করতে শিশিরকে দেখেনি কেউ। এর বেশী কেউ কিছু বলে না, কোন খোঁজ খবর করবারও প্রয়োজন মনে করে না।

নানা রকম বাদ্যযন্ত্র তৈরী করছে শিশির। প্রতি রবিবার একজন

কামার আর একজন ছুতোর আসে। তাদের সঙ্গে র‍্যাদা হাতুড়ি নিয়ে ঠুক্‌ঠাক্ ক'রে সমানে কাজ করে শিশির। সম্প্রতি একটা আরম্ভ হয়েছে। অর্ধচন্দ্রের আকারে একটা গাম্ভার'কাঠের ফ্রেমের ওপর ছোট বড় পনরটা শঙ্খ বসানো। শঙ্খের মুখের ভেতর থেকে এক একটা তার ঘাট-বাঁধা দণ্ডের ওপর দিয়ে উঠে এক স্তবক হাতির দাঁতের কানের সঙ্গে বাঁধা। আজ এত যত্ন নিয়ে, পয়সা খরচ করে আর ভাবনা ভেবে, শিশির এই যন্ত্র গড়ছে; ক'দিন পরেই এর ওপর একটা পরীক্ষা নেবে, তারপর কি হবে বলা যায় না। হয়তো যন্ত্রটা কোন কাজেই আসবে না। পাশের ঘরে চিরদিনের মত বিদেয় করে দেওয়া হবে। এরই মধ্যে পাশের ঘরটা একটা ভাগাড়ের মত হয়ে উঠেছে। যত জীর্ণ ভগ্ন অপদার্থ ও অকালমৃত বাজনার কঙ্কালে ঘরটা ভরা।

তবু পরীক্ষার শেষ নেই। একটা ব্যর্থ হয়, নতুন একটা ধরে। উদ্ভাবনার ক্লান্তি নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাতটা ঘণ্টা মাত্র তার অন্ন ও অন্নচিন্তার দায়, বাকী সতের ঘণ্টা সুরে বাঁধা না হোক্, সুরের কাছে বাঁধা। একদিন না খেলে, না ঘুমোলেও চলে, কিন্তু বেসুরো হয়ে একটি দিনও কাটতে পারে না শিশিরের।

জীবনে সুর যখন আছে, বিরামও আছে নিশ্চয়। এই বিরাম নিছক শূন্যতা নয়। শিশিরের সম্বন্ধে বলতে পারা যায়, সেখানে তার প্রতিটি মুহূর্ত একটি মেয়ের ভালবাসার আশ্বাসে ভরা।

শিশিরের সঙ্গে যাদের মেলামেশা আছে, তারাও শিশিরকে চিনতে পারে না। শুধু তাই নয়, তারা ঠিক উল্টোটাই বোঝে। শিশিরের যদি কোন দোষ থাকে, তবে সেটা শুধু তার মুখচোরা স্বভাব। আজ পর্যন্ত কখনও মুখ ফুটে বললো না, গান আর বাজনা নিয়ে এই যে তার দিনরাত কায়মন সেবা, তার উদ্দেশ্য কি? পরিচিত ঘনিষ্ঠ অভ্যাগত—সকলেরই

সঙ্গে শিশির সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে—শুধু সেই বিষয়টি ছাড়া, যে-বিষয় তার জীবন গ্রাস করে বসে আছে। কাজেই লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়। নিজের নামের ঢাকে কাঠি পিটিয়ে যদি কেউ নিজেকে জাহির করতে না চায়, তবে অপরে তার বিরুদ্ধে দুর্নামের শিঙে বাজিয়ে বেড়াবে নিশ্চয়। শিশিরের অদৃষ্টে তাই ঘটেছে। শত অনুরোধেও যে-মানুষ কোথাও গাইতে চায় না, বাজাতে চায় না, সে-মানুষ শুধু একটি ক্ষেত্রে এই জেদের ব্যতিক্রম করে বসে—সিতার কাছে। সুতরাং ধরে নিতে হয়, সিতার জন্যই তার গান গাওয়া। পরচাচিকদের গবেষণা এই পর্যন্ত এসে সকল সংশয় প্রশ্ন ও কৌতূহলের একটা সদুত্তর পায়।

কিন্তু সিতাই একমাত্র মানুষ, যে সত্যি করে জানে, শিশিরের সুরের খেয়াল কোথায় ও কোন্ দিকে খেয়া দিয়ে চলেছে।

শিশিরের একটা থিওরি আছে—রাগ-মহাদেশ থিওরি। বিদ্রূপের ভয়ে এই থিওরির কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না শিশির। শুধু জানে সিতা।

শিশির বলে।—ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর কৃপা ভরসা করে থাকলে আর চলবে না। নতুন এক রাগ-সৃষ্টির লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আজ ভারতবর্ষ আর নারদ ঋষির দেশ নয়—সারা পৃথিবীর আত্মীয়। গীতময় ভারতের আকাঙ্ক্ষা আজ এক নতুন সুরস্বরূপকে খুঁজছে। গুণীর কাজ তাকে আবিষ্কার করা, তাকে চেনা, তাকে পূর্ণতা দেওয়া। মিঞা তানসেন একদিন তাই করেছিলেন। কিন্তু তারপর? তারপর থেকে যুগের বাতাসে আমাদের জীবনে কত নতুন পাখি ডেকে গেল—আরও কত বিচিত্র ডাক আসছে, কিন্তু নতুন মুরলী আর তৈরী হলো না।

এই থিওরিটা শিশিরের কাছে একটা উপলব্ধির মত সত্য। কোন

কার্পণ্য না করে শিশির মাত্র একজনের কাছেই বিশ্বাস করে এই উপলব্ধির খবর সঁপে দিয়েছে—গোপন উপঢৌকনের মত ; এত জন থাকতে শুধু বেছে বেছে সিতার কাছে।

সিতার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই শিশিরের মনে পড়লো—আজ সিতা দেখা করতে আসবে, অনেকদিন অদেখার পর।

বোম্বাই থেকে রেকর্ডের পার্শেলটা কালই এসে পৌঁছেছে। য়ুরোপের স্বরগুরু বীটোফেনের নটী সিম্ফনি।

বাইরে মোটরের হর্ণের শব্দ শোনা গেল। শিশির বাইরে এসে দাঁড়াতেই, সিতা গাড়ি থেকে নামলো। যে-ভদ্রলোক স্টীয়ারিংএ ছিলেন, তিনি আর নামলেন না। শিশিরের দিকে তাঁর নজরটাও পড়লো না। যেমন বসেছিলেন তেমনি সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন এবং পরক্ষণেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

সিতা এগিয়ে আসতেই শিশির জিজ্ঞাসা করলো।—উনি চলে গেলেন কেন ? কে উনি ?

সিতা—ওঁর নাম জয়ন্ত মজুমদার।

একটু ব্যস্ততার সঙ্গে একবার ঘাড় উঁচু করে রাস্তার শেষ সীমা পর্যন্ত শিশির তাকিয়ে দেখলো, যদিও জয়ন্ত মজুমদারের গাড়ির কোন চিহ্ন এই সৌজন্যের অপেক্ষায় তখনো রাস্তায় বসে ছিল না। শুধু এলোমেলো কতগুলি ধোঁয়া আর ধুলোর কুণ্ডলী ভাসছিলো পথের বাতাসে।

ঘরে ঢুকে রেকর্ডগুলি একবার নেড়েচেড়ে দেখলো সিতা। তারপর দেয়ালে টাঙানো শিশিরের মায়ের ফটোখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখলো।

রেকর্ড বাজতে সুরু করলো।—এই রেকর্ডটা একটু মন দিয়ে শোন

সিতা। এটা হলো বীটোফেনের তৃতীয় সিম্‌ফনি। এর নাম ফিউনারাল মার্চ, নেপোলীয়নকে এইটি উপহার দিয়েছিলেন বীটোফেন।

শিশির নিঝুম হয়ে বসে থাকে। সিতা চুপ করে মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে। একটু পরেই শিশিরের চোখে মুখে কতকটা অদ্ভুত রকমের রক্তাভ আবেশ দেখা যায়।—শেষের দিকের স্ট্যান্‌জা কয়েকটা মন দিয়ে শোন সিতা। লক্ষ লক্ষ ক্লান্ত আত্মা যেন মার্চ করে এক পরম বিশ্রান্তির দেশে চলেছে। তাদের অবসন্ন পদক্ষেপের ধ্বনি ধীরে ধীরে শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

সিতা শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সপ্তম সিম্‌ফনির সমাধি থেকে নতুন একটা পুলক সেই শূন্যতা ছাপিয়ে তারই মনের মধ্যে রেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সিতা শুধু দেখে, শিশিরের ভুরু দুটো ঠিক তার মায়েরই মত—ঘন টানা ধনুকের মত বাঁকা।

শিশির বলে।—এইবার শোন, আর কিছু নেই। এখন শুধু শূন্যতার সুর শুনে যাও, শুনেছো কখনো?

শিশির অভিভূতের মত দুচোখ বুঁজে বসে থাকে। বিদ্যুতের পাখার প্রতিচ্ছবিটা তার চশমার কাঁচের ওপর এক বন্দী চাঞ্চল্যের মত নিঃশব্দে বিভোর হয়ে ঘুরতে থাকে। সিতা উঠে এসে পাশে দাঁড়ায়। শোনা ও দেখার এক ধাঁধার মধ্যে ফাঁপরে পড়ে সিতা। নরম ক্রীমের মত হাতে প্ল্যাটিনামের চুড়ি দুটো অসাবধানে বেজে ওঠে। শিল্পীর তন্ময়তা ছুটে যায়। হাতটা লুফে ধরে শিশির, পাশে বসিয়ে রাখে সিতাকে।

একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় আরম্ভ হয়। নবম সিম্‌ফনি শব্দের ফুলঝুরি ছড়ায়। শিশির আর সিতা পাশাপাশি ব'সে যেন সুরের রঙীন উল্লাসটুকু চোখ দিয়ে মুখে উপভোগ করে।

শিশির।—এই বাজনাটি বীটোফেন স্বয়ং শুনতে পাননি। এর ব্যাকরণটুকুই শুধু তৈরী করে শেষ করেছিলেন। তারপরেই বধির হয়ে যান। শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় দুঃখ ও বঞ্চনা আর কি হতে পারে ?

সিতা আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। একটা আশ্বাস যেন শিশিরের এই ক্ষণিক বিমর্ষতাকে মুছে ফেলার জন্য অন্তরের দিকে বাহু প্রসারিত করে।

বাজনা শেষ হয়। শিশিরের তৃপ্ত সম্বিৎ এতক্ষণ পরে একটা ধ্যানলোক থেকে ছাড়া পেয়ে পাশের মানুষটীকে ভাল করে দেখতে পায়।—এতদিন পরে তোমার সময় হলো সিতা।

সিতা যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় বসে ছিল। তার সতর্ক ধৈর্য শুধু মিনিট গুনছিল, কতক্ষণে এই শিল্পিপ্রবর তাঁর মানুষী সত্তায় ফিরে আসেন। মনে হচ্ছে এতক্ষণে ফিরেছেন। সিতা ততক্ষণে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে। আঁচলটা দিয়ে হাত দুটি ভাল করে ঢেকে নেয়। সব দিকেই দৃষ্টি পড়ে সিতার, শুধু শিশিরের দিকে পড়ে না।

শিশির।—কথা বল সিতা ?

সিতা অন্যদিকে তাকিয়ে একটু ফিকে হাসির সঙ্গে আস্তে আস্তে বললো।—কথা বলার কি যোগ্যতা আমার আছে বলুন ? তারপর, আপনি গাইয়ে মানুষ, আপনার কাছে গানাৎ পরতর কিছু নেই। আর আমি হ'লাম অকৃত্রিম অগান।

শিশির চেয়ার ছেড়ে উঠে সিতার কাছে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল।—আমার কাছে গানাৎ পরতর যদি কিছু থাকে সে তো তুমি।

সিতার মুখের ভাবে একটু ব্যস্ততা দেখা দিল, দরজার বাইরে যেন কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য উৎকর্ণ

হয়ে রইল সিতা। তার পরেই বললো।—না, জয়ন্তবাবুর গাড়ির হর্ণ নয়।

শিশির প্রশ্ন করলো।—কে জয়ন্তবাবু? সিতা চকিতে একবার স্বরলোকের মানুষটির দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। এরই মধ্যে ভদ্রলোক ভুলে গেছে—জয়ন্তবাবু কে? পাগল গৃহস্থের মত দরজা খুলেই লোকটা ঘুমিয়ে আছে—কোন সতর্কতা নেই—চোরের ভয় নেই। বোধহয় মনে করেছেন, চুরি যাবার ভয় নেই! এমনও হতে পারে, চুরি গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

শিশির ঘরের মধ্যে চুপচাপ পায়চারি করে বেড়ায় কিছুক্ষণ। সিতা লক্ষ্য করে, শিল্পী বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। নিবিষ্ট মনে ভাবছেন। ভাবনার ঘোর মুখের ওপর একটা সান্ধ্য বিষন্নতা বিস্তার করেছে।

অনেকক্ষণ পার হয়ে যায় তবু কথা বলে না শিশির। সিতার বিড়ম্বনা তার মনের শান্তিকে পীড়িত করে তোলে। আঘাত দিয়ে, খুঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে—এই মানুষের মতি সে'ধাতুতে গড়া নয়। তাই তার নাগাল পাওয়া যায় না। ভুল শোধরাতে, নতুন করে বুঝতে, আত্মরক্ষা করতে, নিজেকে জাহির করতে, অধিকার অর্জন করতে ও রাখতে—এ সবের কোন কায়দা জানা নেই শিশিরের। এই অস্বভাবী মনের কাছে সমাদরেরই বা কি মূল্য আছে? যে জিনিষের যাচাই হওয়া সম্ভব নয়, তার খাঁটিত্ব বিচার কি করে হয়?

সিতা বললো।—কি ভাবছেন?

শিশির।—এবার যেদিন আসবে, জয়ন্তবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এস।

সিতা।—তাতে আপনার কি লাভ?

উত্তর দিতে গিয়ে কথাগুলি কতখানি রুক্ষ হয়ে উঠলো, সিতার বোধহয় সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

শিশির।—তার সঙ্গে তুমিও আসবে, এই আমার লাভ।

সিতার সুন্দর মুখ কাতর হয়ে উঠলো। মনের গহন থেকে যেন একটা জ্বালাকর বেদনার আঁচ এসে লেগেছে মুখের ওপর। যত সংকোচ ও অভিমান যেন অনুশোচনায় পুড়তে আরম্ভ করেছে। সিতা উঠে গিয়ে শিশিরের পাশে দাঁড়ালো।—তুমি বলতে বড় দেরি করে দাও শিশির। আগে তোমার গান শেষ হবে, তারপর নির্লজ্জের মত আমাকে সব স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, তারপর তোমার সব মনে পড়বে। সিতাকে তোমার চোখে পড়ে সবচেয়ে শেষে। শুধু এইটুকুই তোমার ভুল। নইলে তোমার চেয়ে প্রিয় আর আমার কি থাকতে পারে শিশির!

সিতা অবসন্ন হয়ে একটা সোফার কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইল। আর বেশীক্ষণ থাকলে পড়ে যাবে। ডুবন্ত মানুষের মত একটা অসহায়তার মধ্যে সিতা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শিশির সিতার হাতটা শক্ত করে ধরে সোফার ওপর বসিয়ে দিল।

সব ক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়। সিতা যেন এতক্ষণে একটা আশ্রয় লাভ করে। তটস্থলীর মত কঠিন ও স্পষ্ট এই আশ্রয়।

সিতা বলে।—শুধু মুখের কথায় আমাকে গানাৎ পরতর বলছো, কিন্তু কাজের বেলায় উল্টো। আমি চাই……।

শিশির।—কি?

সিতা।—আগে আমি, তারপর তোমার গান।

শিশির।—পার্থক্যটা কোথায়?

সিতা—অনেক পার্থক্য। আজ যদি তুমি গান ছেড়ে দাও, তুমি বেসুরো হয়ে যাও, তোমার গলা খারাপ হয়ে …

শিশির—কি বলছো সিতা! এসব কথা বলতে তোমার বাধছে না একটুও?

সিতা শিশিরের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো—গানকে খুব বেশী বিশ্বাস করে বসে আছ তুমি। সেটা তোমার ভুল।

শিশির অপ্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। সিতার কথাবার্তা আচরণের অর্থ তার কাছে ক্রমেই বোধাতীত হয়ে উঠছে। তার মধ্যে এতগুলি ভুল কবে আবিষ্কার করলো সিতা?

সিতা।—একটা জিজ্ঞাস্য আছে। জয়ন্তবাবুর ওপর তোমার হিংসা হয় না?

শিশির।—হিংসা? ছিছি, হিংসা করবো কেন?

সিতা।—আচ্ছা আমি চলি এবার।

শিশির সেইখানেই দাঁড়িয়ে শুন্‌লো, বাইরে মোটর গাড়ির হর্ণের শব্দ বাজছে। জয়ন্তবাবুর গাড়ি নিশ্চয়। নেটের গোলাপী পর্দাটা সামনের দরজার ওপর স্থির হয়ে ঝুলছে। সিতা নেই। সিতার চলে যাবার চাঞ্চল্যটুকুর কোন রেশ পর্যন্ত পর্দার মধ্যে নেই। একটা স্থিরতার সমাধির মত ঘরটা চুপ হয়ে গেছে।

গানকে বিশ্বাস করতে মানা করে দিয়ে গেছে সিতা। শিশিরের চিন্তার ভেতর এক বছরের একটা ইতিহাস বর্ণায়িত হয়ে ওঠে। বৌদির মামাবাড়ি সম্পর্কে সিতা তার আত্মীয়া হয়। গত বছর চেঞ্জে ডালহৌসি যাবার পথে বৌদি ঢাকা থেকে কলকাতায় একবার এসেছিলেন। বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সিতা। তাই সিতার সঙ্গে দেখা হলো শিশিরের—জীবনের প্রথম দেখা। বৌদি যেসব ঠাট্টা করেছিলেন, তা সবই মনে আছে শিশিরের। আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বৌদি বললেন—এইবার দেখবো গুণী মানুষের কেরামতি। সুরের জালে

সিতার মত মেয়েকে যদি ধরতে পার, তবেই বুঝবো তুমি পাকা জালিয়াত।

বৌদি সব কথাই খুলে বলেছিলেন। সিতার বাবার আভিজাত্য একটু বেশী প্রখর। ভাবী জামাইয়ের জন্য তিনি বিলেতের দিকে অথবা কোন বিলিতীগোছের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাজেই তাঁর কাছে প্রস্তাব করে কোন লাভ হবে না। সিতা মেয়েটি যদিও একটু ছটফটে, তবুও ওর মনটা বড় সরল। ফিলসফিতে এম-এ নিয়ে পড়ছে, কিন্তু তাতেও ওর ছেলেমানুসি ঘোচেনি। দর্শনের ভার যেন সইতে পারে না সিতা।

বৌদি যেন শিশিরের কানে কানে এক নতুন যাদুমন্ত্র শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—সিতার বাবা আর সিতা অনেক তফাৎ। সিতা কোন বড়মানুষির ধার ধারে না। ওর এখন মনমানুষি করার বয়স। মাথায় কিছু ঢুকলো স্বরসাধক? নাও, এবার একটা গান গাও।

বৌদির নির্দেশ উপেক্ষা করতে শিশিরের সামর্থ্য সেদিন আর হয়নি। গান শেষ হলে বৌদি জিজ্ঞেসা করলেন—কেমন লাগলো সিতা?

সিতা।—সুন্দর।

বৌদি তাঁর চিকিৎসার সফলতায় মনে মনে খুশিতে ও কৃতার্থতায় গর্বিত হয়ে উঠছিলেন। তারপর সিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কত কথা বললেন, তার কিছুই শোনেনি শিশির। অনুমানে বোঝা যায়।

ডালহৌসী যাবার পথে বৌদি যেন হঠাৎ এসে শিশিরের নিরালা ও একাকিত্বের জীবনে নতুন একটা গুঞ্জন ছেড়ে দিয়ে গেলেন। যাবার সময় পর্যন্ত বলে গেলেন।—সিতা তোমার গুণমুগ্ধা। আমার কর্তব্য এইখানে শেষ। এইবার তোমার কর্তব্য আরম্ভ। ভুল হয় না যেন।

সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটা আজও শিশিরের মনের মধ্যে একটা

উৎসবের স্মৃতির মত জেগে আছে। গানের ভেতর দিয়েই সিতার আবির্ভাব। সিতা গুণমুগ্ধা।

আজ মনে হচ্ছে, সেই সুর ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গুণীর সঙ্গে সিতার হৃদয়ে একটা আড়ির ভাব দেখা দিয়েছে। গানের সঙ্গে তার যেন একটা বৈরিতা ও বিরোধ। আজ সিতা বলতে চায়, তার কাছে শিশিরের গানটা কিছু নয়।

ভাবতে গিয়ে শিশিরের মাথা ধরে এল। কপালের একটা পাশে রগগুলি দপ্ দপ্ করছে। সিতা নিজের থেকেই এক আশ্বাসের পসরা নিয়ে তার মনের পথ জুড়ে বসলো, আবার নিজেই সেই আশ্বাস মিথ্যে করে দিচ্ছে।

সিতা বলে গেল, তার নাকি ভুল হচ্ছে। বৌদি অনেকদিন আগেই বলে গিয়েছিলেন—ভুল হয় না যেন। ভুল খুঁজতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে শিশির, কোন হদিস পায় না।

জানালাটা খুলে দিল শিশির। আশ্বিনের এই স্বচ্ছ দিনটার আলোর প্রসন্নতা আসুক ঘরের ভেতর। নইলে সব যেন বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে। সিতা যদি আর না আসে? গুণীর জীবনে না-চাওয়া উপহারের মত সিতা নিজেই এসেছিল। আজ সিতা শুধু হিসেব করছে—তার নিজেরই মহত্ত্বকে সে অসম্মান করছে।

শিশিরের বার বার শুধু মনে পড়ছিল—সিতা যদি আর না আসে। তার এত সাধের কল্পনার রাগ-মহাদেশ অপমানে আবর্জনা হয়ে যাবে। সিতা বুঝতে পারছে না, কতখানি ক্ষতি ও শাস্তি রেখে গেল সে।

শিশির দেখছিল, মাঠের ওপর চাটাই দিয়ে একটা মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছে। পাড়ার দুর্গোৎসবের আসর। সকাল থেকে ছেলেপিলে আর নরনারীর ভিড় লেগেছে সেখানে। সানাই বাজছে।

বিষাক্ত সুর। সানাইয়ের আলাপটা যেমন কর্কশ, তেমনি তার মধ্যে তাল মানের বালাই নেই। সানাইটা যেন কুৎসিত চীৎকার ক'রে আজকের সকাল বেলার এক অসহায় ভৈরবীর হাত পা কামড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

আর বেশীক্ষণ শোনা অসম্ভব। চারদিকে আজ অ-সুরের আক্রমণটাই প্রকট হয়ে উঠছে। সিতা যেন আজ সকালে এসে আগেভাগেই এই সংকেত জানিয়ে দিয়ে গেছে। এইবার নাদসমুদ্রের সব সরসতা শুকিয়ে যাবে, ঢেউগুলির অকাল মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, চারদিক থেকে একটা কটুমন্দ্রের মারী জাগবে। ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল শিশিরের।

শিশির ঘর ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসলো। এখনি একটা সাইরেন বাজুক, এই সুরহীন কুৎসিত ভিড়টার ওপর একটা জাপানী বোমা এখুনি ফেটে পড়ুক। সব শেষ হয়ে যাক্। সানাইটার চীৎকার থেকে তবু রেহাই পাওয়া যাবে।

পথ দিয়ে একটি ছেলে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। দেখে বুঝতে পারা যায়, ছেলেটি এই দুর্গোৎসবের একটি উদ্যোগী কর্মী। শিশির ডাকলো।—শোন ভাই।

ছেলেটি এগিয়ে এসে বললো—বলুন।

শিশির। —দয়া করে তোমরা ঐ সানাইটা বন্ধ করাতে পার?

ছেলেটি হাসলো।—শুনতে খুব খারাপ লাগছে আপনার?

—আর বলো না, অসহ্য।

—কি করবেন বলুন, এবারকার পূজোয় পীরপুরের হরু ডোমকে পাওয়া গেল না। শুধু হরু ডোম কেন, তার ছেলে নিতাই, তার ভাই শ্যাম, এমন কি হরুদের গাঁয়ের কোন সানাইওয়ালাকে পাওয়া গেল না,

তাই কোন মতে অনেক চেষ্টা করে অন্য গাঁ থেকে একটা আনাড়ী ধরে এনেছি। পূজোয় একটা কিছু না বাজলে উৎসব বলে যে মনেই হয় না।

—হরু ডোমের কি হয়েছে? ওদের পাওয়া গেল না কেন?

—আর কোন কালেই পাওয়া যাবে না। সব খতম হয়ে গেছে। এই দুর্ভিক্ষে ওরা সব মরে গেছে।

কর্মী ছেলেটি ব্যস্ত হয়েই চলে গেল।

বালিগঞ্জ যাবার পথে দশ নম্বর বাসটা শেয়ালদার মোড়ে যাত্রী নেবার জন্য কিছুক্ষণ থামে। বহু যাত্রী নেমে যায়, তার চেয়ে বেশী যাত্রী উঠে আবার মোটর বাসের উদর কৃমিসংকুল করে তোলে। যাত্রীদের তাড়াহুড়া সন্ধ্যে হলেই সব চেয়ে বেশী মারাত্মক।

দশ নম্বর বাস নিয়মিত যাত্রী বহন করে; এর মধ্যে এমন কিছু বিচিত্রতা নেই। কিন্তু তত্ত্ব আছে—বঙ্গীয় সমাজতত্ত্ব বললে খুব বেশী ভুল হবে না।

বাসের মধ্যে পেছনের সীটে ইন্দ্রনাথ বসে অনেক কথা ভাবছিল। টাউনহলের জনসভা থেকে এইমাত্র সে ফিরছে। টাউন হলের বাঙালী বক্তাদের বাক্‌বৈখরী দেখলে অতি বড় সংশয়বাদীরও বিচার ঘুলিয়ে যায়। মনে হয় বাঙালী জাতির রক্তে যেন একটা ঝড় লুকিয়ে আছে; সুযোগ পেলেই এই ঝড় অনায়াসে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। বিদেশী ইংরাজ শাসকের মত সেয়ানা সম্প্রদায়ও এই টাউন হলের বাচনিক আঁধি দেখে অনেক সময় আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ে। তারা রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। ইংরেজ ভুল করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বলেই, টাউনহলী রাজনীতিকেই বাঙালীরা একটা অস্ত্র ঠাউরে বসেন।

টাউন হলে নয়, দশ নম্বর বাসের যাত্রী হয়ে শেয়ালদার মোড়ে এসে

ইন্দ্রনাথের মত একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে শহুরে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের হাড়মাংসটুকু পর্যন্ত দেখা হয়ে যাবে।

বাসের দরজার মধ্যে একটা স্টেলমেট অবস্থা। পাঁচজন যাত্রী নামবে আর গোটা দশেক নতুন যাত্রী উঠবে। বাসের ভেতর জায়গা এখনো প্রচুর আছে। পনেরো জনও উঠতে পারে—একটু ঠেসাঠেসি হবে এই যা।

দরজার কাছে দুটো মারামারি আরম্ভ হলো। একটা দরজার সিঁড়ির ওপরে—উতরনে-ওয়ালা যাত্রী বনাম জন চারেক উঠনে-ওয়ালা। আর একটা মারামারি সিঁড়ির বাইরে রাস্তার ওপর—উঠনেওয়ালাদের মধ্যে, কে আগে উঠবে এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি। একটি মহিলা ভীরু পতঙ্গের মত এক একবার এই মানবব্যূহের ভেতর দিয়ে গাড়িতে ওঠার আশায় এগিয়ে আসছেন, কিন্তু মোটা মোটা কনুইয়ের পৌরুষ দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

এরা সবাই ভদ্রলোক—বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক। এদের মধ্যে সব শ্রেণীর মানুষই আছেন—ধনবান, মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত। এদের পরিচ্ছদে সুরুচির পরিচয় আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটা অধ্যায় বোধ হয় এদের কাছে এখনো একেবারে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। যাত্রী বদল করতে বড় জোর তিন মিনিট সময় লাগতো, সে-ক্ষেত্রে তের মিনিট সময় চীৎকার ধাক্কাধাক্কি গালিগালাজের একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করে এক একটি গলদ্ঘর্ম ভদ্রলোক বাসের ভেতর কৃতার্থভাবে ঢুকলেন। মহিলাটি উঠলেন সবার শেষে।

বাস চলতে আরম্ভ করলো। ইন্দ্রনাথ এই দৃশ্যটাকে মনে মনে নানা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বিশ্বাস্য একটা হেতু আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করছিল। কেন এমন হয়? এঁরা সবাই শিক্ষিত, অথচ মানুষের রীতিতে বাসে উঠবার মত অতি নগণ্য একটা সামাজিক আচরণের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও এঁদের চরিত্রে কেন সত্য হয়ে উঠতে পারেনি?

টাউনহলের জনসভায় আজ যে সংঘের পত্তন হলো, তার বহুবিধ কর্তব্য ব্রত ও দায়িত্বের সুবিশাল ফর্দটি একটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মত ইন্দ্রনাথের মনের চোখে ভাসতে লাগলো। সেই সংঘে আজ যারা সভ্য হিসাবে নাম লেখালো, কর্মী হয়ে যোগ দিল—যারা চাঁদা দিল, যারা আশীর্বাদ অভিনন্দন জানালো—তারা সবাই দশ নম্বর বাসের যাত্রীদের সমগোত্র।

জাগৃতি সংঘের কথা মনে পড়ছিল ইন্দ্রনাথের। উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা আছে সন্দেহ নেই। তাঁরা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা নতুন জাগরণ আনতে চান। তাঁরা বন্যাতে দুঃখ ঘোচাবেন, খাদ্যসংকটে অন্ন যোগাবেন, নতুন গান গাইবেন, নতুন কবিতা রচনা করবেন, নতুন গল্প লিখবেন। নতুন করে নাটক লিখবেন আর নতুন ভাবে অভিনয় করবেন এঁরা। সারা দেশের সাংস্কৃতিক রূপকে এঁরা ঢেলে সাজবেন। এঁরা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা চান। পৃথিবীর গণ-মুক্তির আদর্শকে এঁরা শ্রদ্ধা করেন। তাই যুদ্ধ-তত্ত্বও এঁদের বিচারের বাইরে যায়নি। এঁরা মনে করেন—এই যুদ্ধে মানবতার শত্রু ফাসিস্তির ধ্বংস হোক আগে; তারপর বিশ্বজনতার মুক্তির ঝাণ্ডা ওড়াবার সুদিন দেখা দেবে। বাধা দেবার কেউ থাকবে না। তাই এঁদের বলতে দ্বিধা নেই—এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ।

কিন্তু সবার উপরে সোভিয়েট রুশিয়া সত্য, তাহার উপরে নাই। এ মন্ত্র একেবারে নতুন মন্ত্র। লোকের বুঝতে কষ্ট হয়। হোক্, প্রত্যেক নতুনকে মানুষজাতি চিরকাল দেরীতে বুঝেছে।

ইন্দ্রনাথও জাগৃতি সংঘের সভ্য। তার মত চিরকালের কর্মী মানুষের কাছে কোন কাজের আহ্বান উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য। টাউন হলের জনসভায় জাগৃতি সংঘের প্রতিষ্ঠায় দলে দলে বন্ধুরা যোগ দিয়েছে।

তাদের অনেককে চেনে ইন্দ্রনাথ। তারা সবাই ফ্যাশানেবল্ বুলিবাজ নয়। আরও কত অচেনা মুখ—তাদেরও উৎসাহের অন্ত নেই। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। সিতা বসুর মত নাম-করা ছাত্রী সংঘের আহ্বানে সাড়া দিল। একদল কবি ও সাহিত্যিক সানন্দে সংঘের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। প্রকাশবাবু আছেন। উর্মিলা কাঞ্জিলাল আজই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সংঘে যোগ দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

দশ নম্বর বাস তখন মৌলালি ছাড়িয়ে সার্কুলার রোডের গোরস্থান ঘেঁসে অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে চলেছে। ইন্দ্রনাথের মন অনেকখানি শান্ত হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারলো, এতক্ষণ একটা ক্ষমাহীন উত্তেজনা তার চিন্তা গ্রাস করে বসেছিল। বাসযাত্রীদের ইতরতা দিয়ে সব কিছু বিচার করা উচিত নয়। জাগৃতি সংঘে আজ যারা যোগ দিল, তারা সবাই এমন কিছু নরোত্তম নয়। তবু দশে মিলে কাজ করার একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়, দূরে সরে থেকে লাভ কি? দশে মিলে ভুল করার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে।

কিন্তু এহেন সংঘের মধ্যে জয়ন্ত মজুমদার কেন? ইন্দ্রনাথ একটু হতবুদ্ধি হয়েই বার বার তাকিয়ে দেখেছিল জয়ন্তকে। লোকটা একটা কসাক টুপি মাথায় দিয়ে এসেছে। হাতে একটা ফাইল। বোঝা গেল, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগপর্বে তারও কিছু হাত আছে।

ঠিক সেই সময় প্রকাশবাবুকে যদি দেখতে না পাওয়া যেত, তবে ইন্দ্রনাথ বোধ হয় তখুনি সভা ছেড়ে চলে আসতো। ডায়াসের পাশে ঘোরাফেরা করছিলেন প্রকাশবাবু। সেই চিরকালের সাদা-সিধা মুখচোরা মানুষটি। শীর্ণ শরীরটা খদ্দরের চাদরে জড়ানো। সদাহাস্যে মুখখানা উজ্জ্বল। ইন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে যেতেই বলে গেলেন—তুমিও

এসেছ। জয়ন্ত মজুমদারকে দেখার যন্ত্রণা প্রকাশবাবু যেন একটি কথায় নিরাময় করে দিয়ে গেলেন

জয়ন্ত মজুমদারকে দেখার মত বিদ্‌ঘুটে লেগেছিল আর একটা দৃশ্য। পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র থেকে গোটাচারেক ভদ্রলোক কড়া লাল সেলাম দেগে মারি-মারি খাই-খাই গোছের নিরর্থক কতকগুলি বক্তৃতা করলেন। এই হুড়বাজেরাই দর্শকদের কাছে কান-ফাটা হাততালির বাহবা পেলেন সব চেয়ে বেশী। এঁদের স্বরূপ কতকটা চেনে ইন্দ্রনাথ। আগে কয়েকবার এঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাই চেহারাগুলি পরিচিত। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে শুধু গণ্ডগোল আর উপদ্রব করে এঁরা কেউ কেউ বিখ্যাত হয়েছিলেন। যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না।

ইন্দ্রনাথের চোখে পড়লো—মেয়েদের সীটে পাশাপাশি দুটি বৃদ্ধা বসে আছেন। তার মধ্যে একটি বাঙালী বিধবা, অপরটি হিন্দুস্থানী মহিলা—গরিব গোছের চেহারা ; বোধ হয় কোন ডাল-ওয়ালার মা।

খাকি শার্ট গায়ে রোগা চেহারার একটি ছেলে বুড়ীদের সামনেই পুরুষদের সীটে প্রথম দিকে বসেছিল। ছেলেটির বয়স বাইশ তেইশের বেশী নয়। বাঙালী বিধবা বললেন—নরেন নাকি।

ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে বললো।—হাঁ, আপনি কোথায় চললেন ?

—কি রকম ছেলে গো তুমি, না বলে ক'য়ে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে রয়েছ ? তোমার পিসে খুঁজে খুঁজে কী হয়রানিই হচ্ছে।

ছেলেটি চুপ করে বসে রইল। হিন্দুস্থানী বুড়ী কৌতূহলী হয়ে বিধবা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলো।—বাড়ী থেকে ছেলেটি ভাগিয়েছে কেন ?

বিধবা।—যুদ্ধে কাজ নিয়েছে গো। মাইনে বেশী পাবে তাই।

হিন্দুস্থানী বুড়ী গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে আপশোষ করলো।—ছি-ছি-ছি, প্রাণ থাকলে কত টাকা আসবে। কিন্তু প্রাণ গেলে মাইনে নিয়ে

কার পূজা হোবে ? তোমার বুদ্ধি খারাপ হইয়েছে গো ছেলে। এমন কাজ করো না। যাও, ঘরে ফিরিয়ে যাও।

বিধবা বললেন।—আরও মুস্কিল, মা নেই কি না। তাই তেমন করে বলবারও কেউ নেই। ছেলের মনেও কোন মায়ার বেড়ি নেই।

হিন্দুস্থানী বুড়ী প্রায় ধমক দিয়ে ঝাঁঝালো সুরে ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললো।—হামি লোক কি মা নই ? মা নেই তো কি হইয়েছে ? লড়াইয়ে যেতে হবে ? ছি ছি ছি !

ছেলেটি মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসছিল আর অন্যদিকে তাকিয়ে বুড়ীদের অনুযোগ শুনছিল।

হঠাৎ বাসযাত্রীদের পিলে চম্‌কে দিয়ে একটি যুবকের চীৎকার শোনা গেল।—পঞ্চম বাহিনী ! পঞ্চম বাহিনী। এই কণ্ডাক্টর, একদম বাঁধ্‌কে। বুড়ীকে পুলিসে দিতে হবে। অ্যান্টি-ওয়ার প্রপাগাণ্ডা করছে বুড়ী। বিশ্বাস নেই এদের।

ইন্দ্রনাথ যুবকটিকে চিনলো। গালভরা চাপদাড়িতে পায়জামা-পরা সিড়িঙ্গে চেহারাটা আরও বুনো দেখাচ্ছে। এই পাগলটাই আজকের জাগৃতি সংঘের উদ্বোধনে একটা কবিতা আবৃত্তি করেছে। যতদূর মনে পড়ে, নামটা বোধ হয় রণজিৎ দে বা দত্ত হবে।

বিস্মিত বাসযাত্রীরা রণজিতের চীৎকারের অর্থ বুঝতে না পেরে শুধু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। হিন্দুস্থানী বুড়ী বুঝতে পেরেছে—অভিযোগটা তারই উদ্দেশ্যে। বুড়ী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একটা হিংস্র চীৎকার ছাড়লো।—কি বলছিস্‌ রে বেইমানকা বেটা ? কাকে পুলিশে দিবি ? তুই কার দাড়ি চুরি করে চলেছিস্‌ রে চোর, পাজী…।

ইন্দ্রনাথ একটা লজ্জাকর অস্বস্তিতে মুখ নীচু করে হাসতে লাগলো। কবি রণজিৎ যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ আতঙ্কগ্রস্তের মত বুড়ীর দিকে স্থিরদৃষ্টি

নিয়ে তাকিয়ে রইল। পার্ক স্ট্রীটের মোড় আসতেই প্রায় একটা লম্ফ দিয়ে নেমে পড়লো রণজিৎ।

পাশের ভদ্রলোক হাঁপ ছেড়ে বললেন—পাগল বোধ হয়।

গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থামলে নেমে পড়লো ইন্দ্র। মেঘলার জন্য অন্ধকারটা একটু বেশী ঘোরালো হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাঝে মাঝে বৃষ্টির কুচি ছুটে এসে পড়ছে।

জোছু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। জ্যোৎস্নার দাদা অবনীনাথের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের সম্পর্কটা নিছক সখ্যতার বন্ধন—ছেলেবেলা থেকেই। অবনীনাথ ঠাট্টা ক'রে জোছুকে ইন্দ্রনাথের পলিটিক্যাল মক্কেল নাম দিয়েছিল। অবনীর সঙ্গে বিতণ্ডা সৃষ্টি করে ইন্দ্রনাথ যখন হাঁপিয়ে পড়তো, তখন অবনীকে ছেড়ে দিয়ে ডাক পড়তো অরুণা ও জোছুর।—এস জোছু, আসুন বৌদি। আপনারাই বুঝবেন ভাল। ওকে বাদ দেওয়াই ভাল। অফিস লেজার আর একগুঁয়েমি নিয়েই ওর দিন কেটে যাক্।

অরুণা শান্তভাবে হেসে হেসে বলতো—যাই বলুন, কত কি কাণ্ড তো করলেন আপনারা। কিন্তু কি লাভ হলো? বোমা, বয়কট, চরকা, হরতাল, ধর্মঘট, মীটিং, মিছিল—শুধু জেলে যাওয়াই সার হলো আপনাদের। স্বরাজ তো চোখে দেখলাম না।

অবনীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ জবাব দিত—ঐ রকম মহাশয় ব্যক্তি যদি সংখ্যায় বেশী হয়, তবে স্বরাজ হয়ে বসেছে।

কাঁকুলিয়ার দিকে অনেকদূর এগিয়ে এল ইন্দ্র। আর পাঁচ মিনিট হাঁটতে পারলে অবনীর বাসাটা প্রথমেই পড়বে। মনের মধ্যে তার প্রতিজ্ঞাটাকে আর একবার ভাল করে সেধে তৈরী হয়ে নেয় ইন্দ্র। অবনীদের বাড়িতে গিয়ে আজ একটা হৈচৈ বাধাতেই হবে। অবনীর

একলা স্বভাবের গোয়াতুর্মি ভাঙতে হবে। অরুণা বৌদি আর জোছুকেও আজ কোন কথার ফাঁকির আড়ালে সরে থাকতে দেওয়া হবে না। ওদের সবাইকে জাগৃতি সংঘের মধ্যে টেনে আনতে হবে। অবনী হয়তো ভয়ানক রকমের প্রতিবাদ করবে, ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। আজ কোন আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না ইন্দ্র। অবনী সাধ করে গণ্ডী দেগে তার নিজের একটা পৃথিবী তৈরী করে নিয়েছে; দিন দিন সিনিক হয়ে পড়ছে। সংসারী অনেকেই হয়, কিন্তু অবনীর মত প্রতিভাবান মানুষের সংসারযাত্রা একটু অন্য রকমের হওয়া উচিত ছিল। অফিস বাজার আর ঘর ছাড়া একটু বাইরে গেলেই অবনীর চৈতন্য যেন কোন আলো সইতে পারে না। অবনীর এই পেচক মনোবৃত্তি ভাঙতে হবে।

ইন্দ্রনাথের সেই বিশ্বাস আজও অটুট আছে যে, তার দাবী এ বাড়িতে এককথায় উপেক্ষিত হবার মত নয়। আর একটা দাবী, দাবী কেন, সহজ সত্য—এ বাড়িতে বহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ যদি আপত্তি না করে এবং জোছু যদি মুখ ফুটে একবার হাঁ জানায়, তবে অবনী ও অরুণা খুসী হয়েই ওদের দুজনকে জীবনের পথে মিলিয়ে দেবে। আজও বোধ হয় সেই দাবী অসত্য হয়ে যায়নি; কিন্তু সেই প্রশ্ন ওঠবার আর কোন অবকাশ নেই, কেননা সেই পথ আজ অস্পষ্ট। বহুদিনের ব্যবধানে ও নীরবতায় সে-কাহিনী আজ যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। জেল আর আন্দোলন, আন্দোলন আর জেল—সংগ্রাম ও নির্বাসন পালা ক'রে কত পরিণামের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথের জীবনে। প্রথম অনুরাগের কল্পনা শুধু কটি দিনের জন্য এক নবোষার সাড়া দেখতে পেয়েছিল; কিন্তু প্রথম পাখীর ডাক শোনবার আগেই তাকে সরে যেতে হয়েছে। ঘটনার শঙ্খনাদ আজ তাকে বহু দূরে নিয়ে ফেলেছে।

সেসব কথা ভাবতে গেলে আজও মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ে ইন্দ্র। সুখের কথা, খুব বেশী করে মনে পড়ে না। জীবনে নানা লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ সত্যি করে আজও কোন ক্ষতি দেখতে পায় না। জোছু দূরে সরে গেল, এটাও ঠিক কোন ক্ষতি নয়। একটা লাভ হতে চলেছিল শুধু, একটা শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠতো—সেটা আর হলো না।

দরজা খোলাই ছিল, কড়া নাড়তে আর হলো না। মধ্যের ঘরটা পার হয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ইন্দ্রনাথ।

অবনী বাইরের ঘরে চুপ করে বসেছিল, ইন্দ্র এসেছে জানতে পেরেও সাড়া দিল না। জোছু একবার সামনে এসে দাঁড়ালো মাত্র। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কি এমন পড়ার তাড়া তা সে-ই জানে!

আর বেশীক্ষণ এখানে থেকে লাভ কি? কেউ তো স্পষ্ট ভাষায় চলে যেতে বলবে না। কিন্তু গৃহবাসীর এই সসংকোচ মৌনতা আর সসম্ভ্রমে আলগোছে সরে থাকার চেয়ে স্পষ্টতর নির্দেশ আর কি হতে পারে?

অগত্যা ইন্দ্রকে উঠতে হলো। যাবার সময় একটা লৌকিকতার ফাঁকা হাঁক দিল শুধু—যাই বৌদি।

রান্নাঘরের ভেতর এতক্ষণ অদৃশ্য হয়ে ছিল অরুণা—অবনীর স্ত্রী। ইন্দ্রনাথের হাঁক শুনে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারপর এগিয়ে দরজাটা পর্যন্ত এল—তার বেশী নয়। আজ অরুণার সামাজিকতার সীমানা ঐ পর্যন্ত। ছেঁড়া শাড়ি পরে আছে, তার জন্য নয়। ইন্দ্রকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করে বসতে বলার মত সামর্থ্য নেই। আজ পাঁচ বছর ধরে ইন্দ্রনাথ এ-বাড়িতে আসছে—পূজো-পরবের দিনে, অসুখের সময়, ছুটির

দিনে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গড়পারের মেসে যাবার আগে, সটান এ-বাড়িতেই এসে স্নানাহার করেছে ইন্দ্র। অন্তত এক কাপ চা না খেয়ে ইন্দ্র চলে গেছে, এমন অকল্পেয় ও অশোভন ঘটনা কখনও ঘটেনি। কিন্তু আজ তাই ঘটলো।

জাগৃতি সংঘের একটি নতুন মশালের মতই আজ সোৎসাহে অবনীদের বাড়িতে ঢুকেছিল ইন্দ্রনাথ, কিন্তু ঢোকা মাত্রই যেন নিভে গেল। সারা বাড়ির আলাপী মনটা যেন আব্রু দিয়ে রয়েছে। কিছু ঠাঁউরে উঠতে পারছিল না ইন্দ্র। কেউ কাছে আসতে চাইছে না, এক কাপ চা পর্যন্ত না। ইন্দ্রনাথের সংশয়দিগ্ধ মন চকিতে একটা বাস্তব সত্যের আঘাতে চমকে উঠলো। তাই কি? এক কাপ চা পর্যন্ত ওরা আজ দিতে পারে না? এই অসামর্থ্যের জন্যই কি আজ এখানে সকল প্রীতি কুণ্ঠিত? ইন্দ্রনাথের মনে হলো, আজ এখানে তার উপস্থিতি নিছক শান্তিভঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

—আজ আর চা খাব না বৌদি। কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে দিয়েই পথে নেমে পড়লো ইন্দ্র। কাঁকুলিয়া রোডের নিরালায় এই বাড়িটা তাঁর জন্য ইন্দ্রনাথের কাছে সেই মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল না—হতে পারে না। জোছু পরীক্ষার পড়া পড়ুক, অবনী বাইরের ঘরের অন্ধকারে তার অভিমান নিয়ে বসে থাক, অরুণা বৌদি দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। এরা কেউ দোষ করেনি, ভুল করেনি। যা হবার তাই হতে চলেছে।

কিন্তু আশ্চর্য এই অবনী! একটাও কথা বললো না কেন? অবনীর এই সংকোচ অত্যন্ত বিসদৃশ। ইন্দ্রনাথের হঠাৎ সন্দেহ হয়, অবনীর জীবনের মতবাদটা এখনো নিশ্চয় সেই পুরণো হিংস্রতায় অন্ধ হয়ে আছে। নতুনকে দেখতে চায় না, নতুন কিছু শুনলেই চটে যায়।

ইন্দ্রনাথ যে পলিটিক্সের এক নতুন তত্ত্ব ধরেছে, তার পায়ের শব্দই যেন সেকথা জেনে ফেলেছে অবনী। তাই কি অবনী চুপ করে রইল? অবনী কি চায় না যে, সে এখানে আসে? বেশ তাই হোক্। ইন্দ্রনাথ জানতো, এভুল করবে অবনী। এ ভুলের একদিন প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে অবনীকে। ছেলেবেলা থেকে সুরু দুজনের কর্মজীবনের ইতিহাসে বহু বিরোধের পরীক্ষায় শুধু আঘাত দিতে গিয়েও তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। শত্রুতাও কত মুখোমুখি ছিল। আজ কিন্তু অবনী একেবারে মুখ লুকিয়ে ফেলছে। মুখ দেখতে চায় না, অথবা দেখাতে চায় না। এ কী ভয়ানক সংশয় অবনীর?

ইন্দ্রনাথ চলে গেল।

রোমাঁ রোলাঁ নাকি একটি হিসেব তৈরী করেছিলেন—গত [illegible] একা ফ্রান্সের ক'হাজার শিল্পী সন্তান মারা গিয়েছিল। ফ্রান্সের মাটিতে যব বার্লি আর জলপাই ফলাতে লোকের অভাব পূর্ণ করা যেতে পারে — ভাল ভাল যন্ত্রের লাঙ্গল দিয়ে, ভিন্ দেশের চাষী এনে। কিন্তু ফরাসী হৃদয়ের সুর শোনাতে, ফরাসী কামনার ছবি রাঙিয়ে তুলতে যাদের দরকার, তারা একেবারেই চলে গেল। সে অভাব পূর্ণ হবে কি দিয়ে?

শিশির ভাবছিল—দুর্গোৎসবের ভলাণ্টিয়ার ছেলেটি যা বলে গেল, তার অর্থ কি? এই অধম বাংলা দেশের ততোধিক অধম একটি পাড়াগাঁয়ে হরু ডোমের মত সানাইওয়ালারা মরে গেছে। কত মানুষ কত রকমের পণ্য বেচে পয়সা করে—ভেজাল ঘি থেকে আরম্ভ করে চোরাই চরস্। তারা সবাই বেঁচে আছে। হরু ডোম ছিল সুরবণিক। এক ডালা মুড়ির বদলে তার কাছে ক্ষণিকের জন্য জগৎ বদলে নেওয়া যা

যেত। কত শিশুর জন্মদিনে তার সানাই সুর ছড়িয়ে সূর্যরশ্মির সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে, কত ভীরু নববধূর স্বামিগৃহ যাত্রায় পাল্‌কি চলার পথটুকু সান্ত্বনায় ভরে দিয়েছে হরু ডোমের সানাই। কত বিবাহের মিলনরাত্রি সুস্বরে মধুর করে দিয়েছে। সেই হরু ডোমের সানাই আজ খুন হয়েছে। আর বাজবে না। প্রতি সুলগ্নকে শব্দের মালা দিয়ে বরণ করতে সে আর নেই। জীবনে এই প্রথম যেন দেশের একটা ক্ষতির বেদনাকে হৃদয় দিয়ে ভাব্‌তে পারলো শিশির।

হরু ডোমের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, জীবনে বোধহয় এই প্রথম পরের কথা ভাবলো শিশির। অন্নাভাবের বিপাকে কত নিরীহের প্রাণ প্রতিদিন বাংলা দেশের ঘরে পথে মাঠে প্রতি মিনিটে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন খবরের কাগজে সেসব বিবরণ পড়ে কিছুক্ষণ মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির উপদ্রব চলতো। তার বেশী নয়। কিন্তু আজ যেন আত্মীয়বিয়োগের মত এই দুঃখে একটা ক্ষতি আবিষ্কার করেছে। ফ্রান্সের শিলীরা বন্দুক হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হরু ডোমের গায়ে কোন উর্দি ছিল না, হাতে বন্দুক ছিল না। নিতান্ত নন্‌-এসেন্সিয়াল জীব। তার সানাই নিয়ে সে তার ঘরে বসেছিল। তবু সে নিস্তার পায়নি। তাকে মরতে হয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে একটা উলুখড়ের প্রাণ গেছে। এক লক্ষ গেলেই বা ক্ষতি কি? অক্টারলোনি মনুমেণ্টের ছায়া তার জন্য একটুও শিউরে উঠবে না।

অন্নাভাবের প্রসঙ্গে যুদ্ধের কথাটা অবান্তর নয় কি? হরুডোমের মৃত্যুর প্রসঙ্গে অন্নাভাব কথাটাও তেমনি অবান্তর। হরু পেটের অসুখে মারা গেছে। থানার রিপোর্টে এই সত্য কথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। এক একটি হোয়াইট পেপারের বিশুদ্ধ ভাঁওতায় সভ্য পৃথিবীর সমালোচনা বন্ধ করতে যখন ফ্যাক্টের প্রয়োজন হবে—তখন এই ক্ষুদ্র

পীরপুর থানার ডায়েরীটারই ডাক পড়বে আগে। হরু ডোমের জীবনটা যখন ভুয়ো, তখন এই ডায়েরীর লেখাটা ফ্যাক্ট বৈকি। পীরপুর থানার জমাদারেরাই আর একটু পোক্ত হয়ে ভারতসচিব হয়—তখন তার নাম হয় মিস্টার এমেরি।

শিশিরের মত নিরীহ শিল্পী-মানুষের মুখটাও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠছিল। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম প্রতিহিংসা।

হরুডোমের কথাটা ভুলতে পারছিল না শিশির। তীক্ষ্ণ শলাকার মত ঘটনাটা তার এতদিনের সুরপ্রসন্ন শিল্পিমনের প্রত্যয়গুলিকে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে তুলছিল। ক্ষণে ক্ষণে একটা সংশয় জাগে, তার সাধের রাগ-মহাদেশের ধারণাটা একটা দিবাস্বপ্নের মত অলীক মনে হয়। কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে একবার সমালোচনা করে দেখলো শিশির।

কিন্তু শিশির তো এতদিন শুধু চোখ বুজে ধ্যান করেনি। তার সুরসাধনার উপচার জীবনের পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া। সারা ভারত ঘুরে যেখানে যা দেখেছে—ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে শিশির। সেই কুম্ভমেলায় ত্রিবেণীর চড়া থেকে আরম্ভ করে মেঘনার ডুবন্ত স্টীমারের বুকে দাঁড়িয়ে, চূর্ণরত্নের মত লক্ষ লক্ষ ধ্বনির কণিকা আহরণ করেছে সে। তবে ভুল হলো কোথায়?

সন্দেহ জাগে—ঐভাবে জীবন দেখা সত্যিকারের দেখা কি? দৌড়ন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে টুরিস্টরা দেশের ছবি দেখে। সেটাও একরকমের দেখা। কিন্তু এই দেখাটা সত্য কি?

না, তা হতে পারে না। চোখ দিয়ে শুধু ছবি দেখা যায়। অন্তর দিয়ে দেখা যায় প্রাণ। সেটাই সত্যিকারের দেখা। আজ হরুডোমের

পরিণাম সমস্ত বেদনা নিয়ে যেন শিশিরের দৃষ্টির বাঁধাপথের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কান পেতে শোনা যায়, দুঃখের আঘাতে নিঝুম সারা জাতির চিত্তের কলবেণু বিচিত্র সুরে উথলে পড়ছে। রাগ-মহাদেশ জন্ম নিচ্ছে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম এক উপলব্ধির সাড়া শুনলো শিশির।

সিতা চলে যাবার দিন থেকে অহরহ একটা উদ্‌ভ্রান্তিতে শিশিরের কাজ ও অবসরের মুহূর্তগুলি ছন্নছড়া হয়ে গিয়েছিল। সিতা যদি অকারণে শুধু একটা দুর্ভেদ্য ছলনা রেখে এমনি করে সরে যায়—তাহ'লে আর রইল কি? আজ নিজের দুর্বলতা স্পষ্ট চোখে পড়েছে। সিতার ভালবাসার কাছে তার রাগ-মহাদেশের শ্রদ্ধাটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়ে গিয়েছিল। বড় ভুল হয়েছিল।

শিশিরের দুশ্চিন্তার বিষণ্ণ মূর্তিটা এই নতুন উপলব্ধির স্নিগ্ধতায় যেন স্নান সেরে নিয়ে বসে। দূরে নিকটে, দেখা অদেখা, তার আত্মার প্রতিবেশী শত শত দুঃখী সানাইয়ের সুর আজ তার অন্তরে সঙ্গ এনে দিয়েছে। তারপর? তার পরের অধ্যায় ভাবতে গিয়ে একটু গোলমালে পড়ে শিশির। কাজ করতে হবে এবং সে কাজটা কি, তাও সে জানে। সে গুণী, তাকে গাইতে হবে। শুধু প্রশ্ন, কোন্ সুরে আজি বাঁধিবে যন্ত্র? এইখানে সমস্যা। এইখানে তার রাগ-মহাদেশ রহস্যের কুঞ্জি। সে রাজসভার কবি নয়, দরবারের ওস্তাদ নয়, সিতা বসুর ভালবাসার ঊর্ণাজালে বাঁধা আর্তস্বর মাছির আত্মা সে নয়। তবে?

তার কাজ জনতার সেবা। সে এক চারণ মাত্র। মহারাজা অব্ গৃধ্রকূটম্ তার জন্য তাকে কোন খেতাবের পাগড়ী পরিয়ে দেবে না, সিতা বসু মিষ্টি হেসে ধন্য করে দেবে না। তাতে কিই-বা আসে যায়! হরুডোমের সানাই যেখানে ঘা খেয়ে ফুরিয়ে গেল, সেইখান থেকে নতুন করে রচনার উত্তরাধিকার পেয়েছে সে। তার সৃষ্টি যাচাই

হবে জনতার সাড়ায়। বহুজনের হর্ষে তার গুণীপনার সত্য মূল্যের নির্ণয় হবে।

কি করতে পারে শিশির? খবরের কাগজে একটা কর্তব্যের ঘোষণা রোজই দেখতে পাওয়া যায়—অধিক ফসল ফলাও। ঠিক কথা। এই নিরন্নতাই স্বরমেধ রূপে দেখা দিয়েছে। অন্ন থাকলে হরুডোমের মত জনতার শিল্পী অনশনে বিলীন হয়ে যেত না। তবে কি লাঙ্গল নিয়ে পড়ো জমি চষতে হবে? তাহলে যে শুধু চাষ করাই হবে, সানাইওয়ালা হরুডোমের শিল্পীসত্তার তর্পণ হবে না।

কিন্তু এমন কোন সুরের বোধন কি নিতান্তই অসম্ভব, যে-সুরের স্পর্শে পড়ো মাঠের মাটী সোনার ফসলে ভরে যাবে? নিরন্নতার সংকটে মুহ্যমান লক্ষ লক্ষ দেশের লোক মত্ত সৈনিকের মত আত্মরক্ষার ব্রতে, ফসল ফলাবার উৎসবে মাঠে নেমে পড়বে—লাঙ্গল নিয়ে, মই নিয়ে, খুরপি কোদালি নিয়ে?

সম্ভব বৈকি? জনতার শিল্পীর এই তো কাজ। শিল্পীরা একাধারে চারণ ও সৈনিক। জনতার গুণী শুধু কাজের পথে গান শোনায় না, গান শুনিয়ে কাজের পথে টেনে আনে।

হরু ডোমের মৃত্যুর কথাটা আবার মনে পড়ে। এই ভালমানুষী কাজের চিন্তাটা হঠাৎ অর্থহীন হয়ে যায়। অধিক ফসল ফলাও? কিন্তু কার জন্য ফলাবে? পরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য? দেশ জুড়ে এক প্রচণ্ড কুলিগিরির প্রেরণা জাগাবার জন্যই কি এই প্রবচনটী তৈরী করা হয়েছে?

শিশির জানে, তার পাশের বাড়ীর এক রায় বাহাদুর সম্প্রতি দশটা নতুন টবে কচু ফলিয়েছেন। বেশ করেছেন, অধিক ফসল ফলাবার ব্রত নিয়ে সুখে থাকুন শহুরে বাহাদুরের দল! ফসল ফলিয়েও যারা মরতে

চলেছে, তাদের কাছে এই অধিকতার ইয়াকি না করলেও চলবে। ফসল বাঁচাও, ফসল বেচা বন্ধ কর—বাঁচবার প্রথম মন্ত্র আগে ধ্বনিত হোক্।

শিশিরের মনের ভেতর দুই পাখীর প্রশ্ন আর উত্তর চলে। কঃ পন্থা? বিচার এক কথায় শেষ হয় না। কিন্তু যতক্ষণ কুয়াশার ঘোর থাকে, ততক্ষণই পথ বিপথের প্রশ্ন চলে। ঘোর কেটে গেলে সে-প্রশ্নের প্রয়োজন আর থাকে না—পথ আপনি দেখা দেয়।

শিশিরের মনের কুয়াশার ঘোর কেটে গেছে। পথ দেখা দিয়েছে।

শিশির ডাকলো—বিপিন।

বিপিন কাঁদছিলো। কতকগুলি বাজনার ঢাকা অনেকদিন থেকে ধুলো পড়ে ময়লা হয়ে গেছে, সাবান নিয়ে সেগুলি কলতলায় কাচতে বসেছে বিপিন। তার হাত দুটো অবশ্য কাজে কোন ভুল করছিল না, কিন্তু মাথাটা একেবারে ঝুঁকেছিল—নিঃশব্দে একটা যন্ত্রণাকে যেন মনের ভেতর গিলে ফেলছিল বিপিন। মাঝে মাঝে মাথাটা কাৎ করে হাতের পুটে গালটা ঘসছিল; মুখটা এক একবার কুঁচকে গিয়ে ভেংচানির মত এক বিকৃতির মধ্যে স্থির হয়ে থাকছিল। তারপরেই একটা মুক্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দুটো জলের ধারা দু'চোখের কোণ ফুঁড়ে উথলে পড়ছিল।

আজ ক'দিন ধরেই বিপিন বিমনা হয়ে আছে। প্রভু-ভৃত্য দুজনেরই মনের অবস্থা কতকটা এক। শিশির ঠিক সময় মত স্মরণ করিয়ে দিতে পারে না—'ওরে বিপিন এইবার হোটেলে যা, আর দেরী করিস্ নে।' বিপিনেরও মনে পড়ে না—'এগারটা বেজে গেছে, বাবুকে বাইরে বের হতে হবে, এখনই দৌড়ে গিয়ে হোটেল থেকে খাবারটা আনতে হয়।' লন্ড্রির রসিদটা বিপিনের পকেটেই ক'দিন থেকে পড়ে আছে, কাজের কথাটাই ভুলে গেছে। বাজনার নোংরা ঢাকাগুলি কাচবার জন্য আজ পাঁচদিন

কে শিশির তবু বিপিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ক'দিন থেকেই বিপিনের আজ্ঞাবহ নিষ্ঠাটুকু কি কারণে যেন একটু শিথিল হয়ে গেছে। নেই ছিল না তার। শেষে শিশিরের ধমক খেয়ে কর্তব্যবোধ জেগেছে। একটা নোংরা কাপড়ের পাহাড় নিয়ে সকাল থেকেই কাচতে বসেছে বিপিন।

শিশির ডেকে ডেকে দুবার সাড়া না পেয়ে সামনে এসে ধমক দিল।—কানে শুনতে পাচ্ছ না যে। ধ্যান করছো নাকি?

কথাটা শেষ করেই শিশির একটু বিচলিত স্বরে বলে উঠলো।—তুমি কাঁদছো মনে হচ্ছে?

বিপিনের কান্নার নীরবতার বাঁধ ভেঙে পড়লো। অসহায় আহত মোষের মত গোঁঙিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিল বিপিন। শিশিরের কৌতুহল হঠাৎ একটা বিস্ময়ে যেন হোঁচট খেয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইল। এই রকম একটা হট্টাকট্টা চেহারার জোয়ান পুরুষ, ছেলেমানুষের মত কাঁদতে পারে, দেখতেও কেমন বিসদৃশ লাগে। করুণা হয়, হাসিও পায়।

—কান্না থামিয়ে এবার বল, কি হয়েছে?

বিপিনের কান্না তবু থামে না দেখে বিরক্ত হয়েই শিশির বললো।—কথার উত্তর যদি না দিয়েছ, তবে এখন বাইরে যাও, এখানে বসে কাঁদতে পারবে না।

বিপিন একটা লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। উঠোনের কোণ থেকে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বললো—আমি ফিরে এসে বলবো। কিছু মনে করবেন না বাবু।

শিশির—যাচ্ছ কোথায়?

বিপিন—যাব না কোথাও, এখনই ফিরে আসবো।

বিপিনের চোখে আর জল নেই। গাঁয়ার লাঠিয়ালের মত চোখে

মুখে বেশ একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা উঁকি দিচ্ছে। শিশির ধমক দিল —চুপ করে বসো। কি হয়েছে বল ?

বিপিন আপত্তি ক'রে তবু বসলো।—ছোটমানুষের ছোট কথার মধ্যে কেন আসছেন বাবু। ওসব শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। ঘিন্না হবে আপনার। শেষে খ্যাদিয়ে দেবেন। তখন আবার দু'টো ভাতের নেগে দৌড়রে ছুটরে·····।

শিশির—না, তুমি বল। আমি কিছু মনে করবো না।

বিপিন—ঘরের বউ যদি স্বামীর কথা না মানে, ঘর ছাড়ে—এটাকে আপনি কি বলেন বাবু ?

—খুব খারাপ।

—খারাপ তো বটেই। বেবুশ্যের চেয়ে খারাপ—একবার বাগে পেইছি কি ওর টুঁটি কামড়ে রক্ত চুষে নিইছি। মেরে মাতলার খালে ভাসিয়ে দেব।

—কাকে বাগে পেতে চাইছ ? সে কি করেছে তোমার ?

—এখনও এসে পৌছায় নাই। আসছে।

—সে কে ?

—আপনার দাসী।

—তার অপরাধ ?

—ঘর ছেড়ে দলের সঙ্গে বের হয়েছে—কলকাতায় আসছে।

—ভালই তো হলো। অনেক দিন পরে দু'জনাতে দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

—সে কি আমার কাছে আসছে বাবু ? ভিক্ষে করতে আসছে। আসুক একবার, ভিক্ষে খাওয়াচ্ছি আমি ওকে। মাগী মনে করলে আমি বুঝি মরে গেছি।

বিপিনের চোখ দুটো শিকারী বিড়ালের হিংস্রক দৃষ্টির মত জ্বলতে লাগলো। কথা বলতে বলতে চোয়াল দুটো হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে —একটা দুর্দম আক্রোশ দাঁতে চেপে রাখে।

বিপিন পরক্ষণেই একটু যেন মুষড়ে পড়লো। বললো—টুনার মায়ের কথা আমি বেশী ভাবছি না বাবু। ভাবছি টুনার কথা। একেবারে —বাচ্চা ছেলে বাবু। ও কি বাঁচবে? মাগীদের প্রাণ বড় কঠিন— কাদা খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু আমার বাচ্চা ছেলেটা?

শিশির—তুমি যে টুনার মা'র ওপর এত রাগ করছো বিপিন, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, ঘরে টিকতে পারে না বলেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে?

—টিকতে পারবে না কেন বাবু? গরিবের পেটে এত লোভ থাকতে নাই।

—তোমার ঘরে চাল আছে?

—না।

—টাকা পয়সা আছে?

—না। বিপিন একটু হাসলো।

—এখন তুমি বল টুনার মা কি করে গাঁয়ে থাকবে? কি খাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিপিন জানে না। উত্তর দিতে সে চায় না। সে শুধু চায়, টুনার মা ঘরে থাকুক। ঘরই যদি ছাড়লো—তার সবই যে ছেড়ে গেল। স্বামী ছাড়তে হবে, ছেলে ছাড়তে হবে; বাপের ঘরেও ঠাঁই নাই। জাত কু-জাতের এঁটো খাবে, ভিক্ষে মাগ্‌বে, লুচ্চো গুণ্ডো গায়ে হাত দেবে—সব ধর্ম খুইয়ে পেটটা ভরবে শুধু। টুনার মা যদি তাই ভাল মনে করে থাকে, করুক্—কিন্তু ঘরে ফেরার পথ ওর বন্ধ।

বিপিনের এক জ্ঞাতি-ভাই কদিন থেকেই দেখা করতে আসে বিপিনের সঙ্গে বসে বসে গম্ভীরভাবে কত কি ফিস্‌ফিস্‌ করে আলোচনা হয়। ঘটনাটা শিশিরের চোখেও মাঝে মাঝে পড়েছে। তাতে শিশিরে কোন কৌতূহল জাগেনি। তখন সত্যিই তাঁর পক্ষে ছোটমানুষে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন ঔৎসুক্যের তাগিদ ছিল না।

কিন্তু বিপিন কেঁদে ফেলেছে। লাঠি বাগিয়ে ধরে আবোল-তাবো বক্‌লে কি হবে, ওর এই তর্জন গর্জনের পেছনে দাম্পত্যে ও বাৎসলে কোমল একটা গৃহী-মনের অভিমান আর্তস্বরে ডুকরে উঠছে। প্রশ্নটি তাই নিতান্ত ছোটমানুষের ঘরোয়া কথা নিয়ে নয়—মানুষের ঘরের প্রশ্ন।

শিশির বললো—টুনার মা'র সঙ্গে দেখা হলে তুমি কি করবে?

বিপিন—বলবো, যেমনটি এসেছিস, তেমনটি এখনই ঘরে ফিরে যা।

শিশির—বেশ তো, একমণ চাল দিয়ে ওকে ঘরে ফিরিয়ে দিও।

বিপিন—চাল দিতে যাব কেন? পাব কোথা থেকে? পেলে কি দিতাম না? তা কি সে জানে না?

শিশির—তাহলে তুমি চাইছ, টুনার মা ঘরে ফিরে যাক্‌ আর সেখানে চুপচাপ বসে বসে মরে যাক্‌।

বিপিনের মুখটা আতঙ্কে সিঁটকে উঠলো—মরবে কেন? মরতে বলবো কেন? এমন কিছু পাপ করে নাই যে উপোসে মরবে!

শিশির—স্পষ্ট করে বল, টুনার মা কি করবে? বাজে কথা ব মার খাবে আমার কাছে। টুনার মা খাবে না, তবু বেঁচে থাকবে—এটা কি করে হয়, তুমি আমাকে বোঝাও।

বিপিন ফাঁপরে পড়লো। বাবুর সমবেদনার প্রশ্রয়ে এতক্ষণ মনটা যেন চাকরগিরি ভুলে গিয়েছিল। একটা আবদারের জোরে খুশিমত রোখা রোখা উত্তর দিয়ে চলেছিল—শিশির যেন তার আর একটি জ্ঞাতি

ভাই। এর পর যে-উত্তরটা দিতে হবে, সেটা সাবধানে ভেবে চিন্তে বলাই উচিত, যাতে বাবুর মত ভদ্রলোক একেবারে খুসী হতে পারেন।

—ওকে আমি ত্যাগ-ই করলাম বাবু।

বিপিন হাতের লাঠিটা উঠানের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

শিশির—তুমি তো কবেই ত্যাগ করেছ। আর বাকি কি আছে? ঘর ছেড়ে পালিয়েছ সবার আগে। আমার এখানেই আজ ছ'মাস হয়ে গেল তোমার। তখন মনে ছিল না—টুনার মা আর টুনার কথা? তুমি ঘর ছেড়েছ, তোমার ধর্ম যায়নি?

বিপিন—আর দু'টি মাস সবুর সইল না ওর। আমনটা উঠবার আগেই আমি পৌছতাম বাবু।

বিপিন ছটফট করতে লাগলো। টুনার মা আর টুনা ছটি মাস কিভাবে কাটিয়েছে, তার কোন খবর রাখে না বিপিন। তারা শুধু বিপিনের কল্পনার মধ্যেই বেঁচে আছে, ঘরে আছে। ভাগ্যের কাছে আরও মাত্র দুটি মাসের মেয়াদ প্রার্থনা করে বিপিনের অন্তরাত্মা শুধু যেন দিন গুণছিল।

কিন্তু জ্ঞাতি-ভাই ত্রিভুবন হঠাৎ কোথা থেকে এসে তার অজ্ঞাতবাসের প্রশান্তি একটি সংবাদে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। গাঁয়ে কোথাও এক দানা চাল নেই—রসুলগঞ্জে নেই, পীরপুরহাটে নেই—ভাবনো ভিরমিতলা কুঁড়েরহাট সইমাণিক শিমূলে—কোন দোকানে খুদকুঁড়ো পর্যন্ত বিক্রি হয় না। পয়সা থাকলেই বা কি? কায়েতপাড়ার সুন্দর সুন্দর বৌগুলি পর্যন্ত সব শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে। মড়ক লেগে শিমুলের গরু মানুষ অর্ধেক সাবাড়। আর কেউ থাকবে না। হ্যাঁ, চাল পেতে পার, সেরকে যদি দুটী টাকা দাও। পীরপুর হাটে পাওয়া যায়। তা যদি পেয়েছ, তাতেই বা কি, ঘরে আনতে পথে ছিনিয়ে নিচ্ছে। টুনার মাকে

দেখেছি, ভাব্‌নোর তেলিবাড়িতে চালার টিনটা বেচতে এসেছিল; টুনা ভাল আছে—কাঁদছিল খুব। না, ভাত খাবে কোথা থেকে? শাপ্‌লা আর কলার থোড় সিদ্ধ খাচ্ছে সবাই। কেওটদের সঙ্গে আমাদিগের একটা মারামারি হয়ে গেল—ঐ শাপ্‌লা তুলতে গিয়ে আমিও দিইছি এক শালাকে জখম করে—চোখটা ফুটা করে দিইছি। তা, যাই বল বিপিনদাদা, গাঁয়ে থাকতে ভয় করে। তাই চলে এলাম। আমি এলাম রেলে। আমার আগেই টুনা মা পুনি কেওটানীর দলের সঙ্গে কেনিংয়ের পথে হেঁটে মেলা দিয়েছে! কলকাতাতেই আসবে। এটা বড় খারাপ হলো বিপিনদাদা; লফরের জাত তো নই। মালীর ঘরের বউ কেওটদের সঙ্গে ভিক্ষে মাগতে বেরোবে, ভাল হলো না বিপিনদাদা।

সেইদিন থেকে বিপিনের শান্তি নাই। শিশির লক্ষ্য করেছে, আজ ক'দিন থেকেই না বলে কয়ে হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে যায় বিপিন। বোধ হয় কাছে বা দূরে আগন্তুক নিরন্নদের আড্ডাগুলি এক একবার তল্লাশি করে আসে। এরকম উচাটন অবস্থায় কাজের ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

শিশির বললো—আমার কাপড়গুলো এনে রেখেছ বিপিন?

বিপিনের কানে প্রশ্নটা পৌঁছল না। সেইখানে বসে দু'হাঁটু বুকে জড়িয়ে রাস্তার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে ছিল বিপিন। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে আরও দূরে, কেনিংয়ের রেললাইন ধরে এই শরতের সকালবেলার রোদে এক যাযাবরের দলের পেছু পেছু একটি গাঁয়ের বৌ হেঁটে চলেছে; তারও পেছনে একটি উলঙ্গ শিশু আস্তে আস্তে হাঁটছে। এই ছবির মিছিল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। টুনার মায়ের নাকছাবিটা যেন স্পষ্ট দেখা যায়—অন্ধকারে কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতে গিয়ে নাকছাবিটা কেমন যেন চিক্ চিক্ করতো। হাসিটাও সেই ছ'বছর

আগেকার। সুধন্য বহুরূপীর গানটা মনে পড়ে—কে করেছে ফাঁদি নথের আমদানি, হায় গো হায়। সেই গান শোনার পরেই তো নাকছাবিটা গড়িয়ে দিয়েছিল বিপিন। হায় রে হায়!

শিশির ডাকলো—বিপিন!

—আজ্ঞে।

—মন খারাপ করো না! কাজ করে যাও। টুনার মা এলে আমাকে না বলে কোন গোলমাল করতে যেও না।

বিপিন গা-মোড়া দিয়ে হাড়গুলি একবার বাজিয়ে নিয়ে মনের বেদনাময় অবসাদটাকে ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সারাদিনের কাজের তালিকাটি মনে পড়লো—অনেক কাজ আছে। বাবুকে অনেকক্ষণ ত্যক্ত করা হয়েছে, আর নয়। কাজে মন দিল বিপিন।

আজ ছুটির দিন। পাড়ার সবাইকে চটিয়ে বসে আছে অবনীনাথ। সবাই শুনতে পেয়েছে, পরশুদিন অবনীনাথের বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। এর কারণ আর কিছু নয়, অবনীর গোয়ার্তুমি। অবনী প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, উপোস করবে তবুও চোরাবাজার থেকে আটচল্লিশ টাকা মন দরে চাল কিনে খাবে না।

ত্রৈলোক্যবাবু এসে বললেন—আপনার এই অভিমানের কোন মানে হয় না অবনীবাবু। চোরের ওপর রাগ করে মাটীতে ভাত খাওয়ার মত ব্যাপার করছেন আপনি।

অবনী—চোরের ওপর রাগ করার ব্যাপার নয়, চোরের কৃপায় ভাত খাওয়ার ব্যাপার।

সুলতার মাসীমা এলেন। অরুণা আর জোছুকে ইনি খুবই

ভালবাসেন। বললেন—অবনীকে কিছু জানাবার দরকার নেই অরুণা। আমি এক মণ চাল পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি পরে আমায় দামটা দিও।

অরুণা—ওঁকে না জিজ্ঞেস করে কিছু নিতে পারবো না মাসীমা।

মাসীমা—পরে না হয় চাল দিয়েই শোধ করে দিও। টাকা চাই না।

অরুণা—তা'ও একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।

মাসীমা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন।—তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছো অরুণা। কার ওপর যে রাগ করছো বুঝি না। পাড়াসুদ্ধ সবারই চাল ডাল যোগাড় হচ্ছে, আর তোমরা শুধু উনুন নিভিয়ে বসে থাকবে, এ কি রকম কাণ্ড! যে-করেই হোক্ কষ্টেসৃষ্টে দুটো মুখে গুঁজে বেঁচে থাকতে তো হবে। দেশে অধর্ম এসেছে, কি করবে বল?

পরশু দিনটা অরন্ধনে গেছে। তারপরের দুটো দিন অবশ্য উপোসী যায়নি। প্রায় পনের ষোলটা দোকান ঘুরে মাত্র একটি দোকানে সের দশেক চাল পেয়েছিল অবনী—সরকারী দরে, বাইশ টাকা মণ। এটা ঠিক চাল কিনা তাতেও সন্দেহ হয়। পচা গলা কতকগুলি শস্যকণা, চেহারাটা চালের মতনই দেখতে।

দোকানদার চাল দেবার সময় নিজেই লজ্জিত হলো।—এ চাল নেবেন না বাবু, খেতে পারবেন না। এসব তো আপনাদের মত খদ্দেরকে বেচবার জন্যে নয়; লাইসেন্সটা জিইয়ে রাখতে হবে তাই।

এই দশ সেরও ফুরোতে কত দিন? রান্নাঘরের নিভৃতে বসে অরুণা ও জোছুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। অরুণা বললো—তুমি বলগে জোছু, কালই যেন চাল যোগাড় করে রাখে।

জোছু—আমি বলতে পারবো না; মাপ কর বৌদি।

অরুণা।—তুমিই বললে কাজ হবে। আজ পর্যন্ত কখনো দেখেছো, ভদ্রলোক আমার একটি কথাকেও আমল দিয়েছে?

জোছু—তার চেয়ে চল, দুজনে মিলে একসঙ্গে বলি।

শোনা গেল অবনীনাথ ডাকছে—জোছু, শীগ্‌গির আয়।

অরুণা ও জোছু ব্যস্ত হয়ে অবনীর ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। অবনী বারান্দার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।—ঐ দেখ।

একটি ভিখিরী উবু হয়ে বসে আছে। খালি গা, ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের ওপর একটা নতুন গামছা জড়ানো। লোকটা খুবই জীর্ণ-শীর্ণ দেখতে, কিন্তু সেই অনুপাতে অশক্ত মনে হয় না। অরুণা ও জোছুকে দেখতে পেয়েই হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে দণ্ডবৎ জানালো। বেশ চট্‌পটে কেতাদুরস্ত স্বভাবের লোক মনে হলো।

অবনী বললো—উনি কে বল্‌তো জোছু?

জোছু ও অরুণা একসঙ্গে জবাব দিল।—দেখে তো ভিখিরি বলেই বুঝছি।

অবনী—কিছু বুঝছো না। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে নেই—এক জপরত ভক্ত মন্দির-দ্বার থেকে এক ভিখিরীকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল; পরমুহূর্তেই ভক্তপ্রবর অবাক হয়ে দেখলো—ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।

জোছু এইটুকু বুঝতে পারছিল, কোন নতুন একটা তথ্য এর মধ্যে আছে। অবনীনাথ শুধু হেঁয়ালি করে একটা মুখবন্ধ তৈরি করছে; আসল বক্তব্য আর একটু পরেই বোঝা যাবে।

কিন্তু অরুণা যেভাবে বিস্ময়াবিষ্টের মত দেখছিল, তাতে ধারণা হতে পারে, সেই রকমই একটা অলৌকিক আবির্ভাবের আভাস খুঁজছে সে।

অবনী বললো—ভিখারী ধরেছে মূর্তি ব্যবসায়ী বেশে। উনি চাল বেচতে এসেছেন। বল তো, উনি এখুনি সের দশেক চাল এনে দিতে পারেন, দাম বারো আনা সের।

অরুণা বিমূঢ়ের মত ভিখিরীটার দিকে তাকাতেই, ভিখিরীটা একটা আপ্যায়নের হাসি হেসে সবিনয়ে বললো।—হ্যাঁ মা। এর বেশি এখন আর নাই।

উত্তরে অবনী জানিয়ে দিল—আপনি যেতে পারেন, আপনার দয়া দেখে আমরা খুবই বাধিত, কিন্তু চাল চাই না।

বলা মাত্র ভিখিরীটা বারান্দা থেকে নেমে পড়লো।

অরুণা আর জোছুর বিমূঢ়তার ঘোর তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। অবনী বললো—তোমরা এইখানে চুপটি করে বসো কিছুক্ষণ, এইবার এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যটি দেখ। দেখতে পাচ্ছ? যুগলবাবুর বাড়ির পাশে মাঠের ওপর?

শতখানেক মানুষের কঙ্কাল যেন সার বেঁধে বসে আছে মাঠের ওপর। তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। প্রায় প্রত্যেকেরই কোলে একটি করে শিশু। শিশুগুলির চেহারা ডানাকাটা চামচিকের মত, আকারে তার চেয়ে একটু বড়। পাড়ার কয়েকটি সেবাব্রতী ছেলে আর যুগলবাবুর বাড়ির মেয়েরা খিচুড়ি পরিবেশন করছে। মাটির হাঁড়ি, টিনের কৌট, সান্‌কি, সরা, এনামেলের থালা সামনে রেখে ক্ষুধার্তেরা বসে আছে। যুগলবাবুর স্ত্রী একটি টুল নিয়ে একটু দূরে বসে দরিদ্রনারায়ণের সেবা তদারক করছেন। মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে বলছেন,—আরো দাও, যে যা চাইছে দাও। কিপ্‌টেমি করো না তোমরা, ওরা দুটো বেশী খেলে ভূমিকম্প হবে না।

একটু দূরে একটি বাড়ির জানালা থেকে একটি বৌ উঁকি দিয়ে দেখছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে যুগলবাবুর স্ত্রী গলার স্বর বেশ উচ্চগ্রামে ঠেলে নিয়ে গিয়ে বললেন।—দুটো খেতে পেলেই এরা ধন্য। শত হোক্ মানুষ তো। পোকা মাকড়ের মত চোখের সামনে মরবে, মানুষ হয়ে সহ্য করতে পারি না বৌমা।

অবনী বললো।—শুনছিস্ জোছু, ওঁকে চিনিস্ তো ?

অরুণা—পয়সা থাকলে ওরকম পুণ্যি আমিও করতে পারি।

অবনী—কিন্তু ঠিক যুগলবাবুর মত পয়সাওয়ালা হলে পারবে না। তারকের ভাই পচাকে মনে পড়ে ? সেই পচা যুগলবাবুর প্রেসে আড়াই বছর বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস্ খেটেছিল ; পরে পচা অবশ্য নিজেই সরে পড়লো থাইসিস নিয়ে।

অরুণা—সেটা চাকরির ব্যাপার। সেখানে যুগলবাবু হয়তো অন্যায় করেছেন। তার জন্য উনি যে আজ গরিবদের খাওয়াচ্ছেন, সেটা কিছু পাপকাজ নয়।

অবনী—পচার মত কাজের মানুষকে না খাইয়ে মেরেছেন, তাই ভাল মত মুনাফাও মেরেছেন। আজ আবার প্রেততুষ্টির জন্য শ'খানেকে অকাজের মানুষকে ধরে খিচুড়ি খাইয়ে দগ্ধ আত্মা জুড়িয়ে নিচ্ছেন। পাপ কাজ কে বললে ?

জোছু বললো—তোমাদের তর্ক শুনে আমার মাথা ধরে গেল দাদা। কি দেখাতে চাইছ, তাড়াতাড়ি বল। নইলে আমি চললাম।

অবনী—তিষ্ঠ ক্ষণকাল। ঐ দেখ, দরিদ্র ভগবানেরা ভোজন সমাপ্ত করেছেন। টিউব ওয়েলে জলপান করেছেন। এইবার এই পথেই যাবেন।

এক দুই তিন চার পাঁচ—একে একে দশ বারটি সসন্তান নারী, বুড়ো মানুষ, অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে আর রোগে ক্ষীণতনু কয়েকটি যুবক—সেই নিরন্ন জনতার একটি ভগ্নাংশ অবনীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ছোট ছোট বেলুনের মত এক একটি পেট সাঁড়াশির মতো দু'থাক পাঁজরের মাঝখানে ফেঁপে রয়েছে। পেটের ভেতর খিচুড়ির তাপ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। উলঙ্গ ছোট ছেলেগুলির ভেজা গায়ের জল তখনো শুকোয়নি—থেকে থেকে আচম্‌কা ঢেঁকুর ছাড়ছে।

পরমুহূর্তে এক বীভৎস বিলাপের কোরাস আরম্ভ হলো।—দুটো এঁটো কাঁটা দাও মা। একটু ফেন দাও বাবা। ক্ষিদেয় মরে গেলাম বাবা। দুটি পয়সা দাও মা। একটা টেস্টের কুপন দিয়ে দাও বাবা।

অরুণা আর জোছু শঙ্কিত হয়ে বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। দরজার সামনে সেই বীভৎস প্রার্থনার বিরাম ছিল না। কতকগুলি গৃধিনীর যকৃৎ মানুষের রূপ ধরে খাই খাই চীৎকার ছাড়ছে। জঙ্গলের পশুও একবার ক্ষুধা শান্তির পর ঘুমিয়ে পড়ে—বিশ্রাম করে। কিন্তু মানুষ হয়েও ভিখিরীদের এ কিরকম ব্যবহার!

ওদের দুজনারই মনে এই আতঙ্ক ও প্রশ্ন একসঙ্গে মিলে এক চিন্তার দুশ্চেদ্য জটিলতা সৃষ্টি করছিল। অরুণা বললো।— রক্ষে কর বাবা, এমন দরিদ্রনারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকুন। ঘরের দোরে এসে যেন ভিড় না করেন।

জোছু শুয়ে পড়লো। মাথার যন্ত্রণা এইবার বেশ জোরে চেপে ধরছে। অবনীও বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। ভিখিরীদের চীৎকারে স্বস্তির সঙ্গে কোন কথা বলার উপায় ছিল না। কখনো নাকী সুরে, কখনো কান্নার ঢঙে, কখনো কর্কশ হুংকারের মত—ভাঙ্গা গলায়, দম বন্ধ করে, কাঁপিয়ে কাতরিয়ে এক দেহি দেহি হিংস্র উল্লাস যেন বাতাস আচ্ছন্ন করছিল।

অবনী বললো—আজ যদি একটা খুনী গুণ্ডা ছুরি নিয়ে ঘরে চড়াও হয়ে আক্রমণ করতো বা একটা বিষাক্ত সাপ ঘরে ঢুকতো, তবে পাড়ার দশজন হয়তো ছুটে আসতো বাঁচাবার জন্য। কিন্তু তার চেয়ে শতগুণে কদর্য ও মারাত্মক এদের আক্রমণ। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই, কেউ বাঁচাবার জন্য ছুটে আসবে না। এরা সবাই নারায়ণত্ব লাভ করেছে। একটা গলাধাক্কা দেবার উপায় নেই। তখনি যুগলবাবুর দল তেড়ে আসবেন—ছি, ছি, ঠাকুরের গায়ে হাত দিতে আছে!

অরুণা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে গিয়ে জানালা দুটো আর কপাটটা বন্ধ করে দিল—নাঃ এ শব্দ আর সইতে পারি না।

অবনী—আজ তোমার ঘরে আগুন লাগুক, এরা খুশী হয়ে আলুপোড়া খোঁজবার জন্য এইখানে এসে ভিড় করবে। লক্ষ্য করে দেখতে পার, রাস্তায় যখন কেউ মোটর চাপা পড়ে. চার দিক থেকে হায় হায় রব ওঠে। কিন্তু ভিখিরীরা নিঃশব্দে নির্বিকারভাবে সেদৃশ্য দেখে। ওদের মনের মধ্যে কোন সামাজিক বোধ বা কোন অনুভবের বালাই নেই। ওরা কতগুলি জীবন্ত শব মাত্র। অথচ ওদের জন্যই আমাদের সবচেয়ে মহত্বটা রিজার্ভ করে রাখতে হবে—দয়া ত্যাগ আর সেবা।

ভিখিরীর উপদ্রব শান্ত হয়ে গেছে। বাইরে থেকে আর কোন হল্লা শোনা যায় না। শুধু জানালাটা কে যেন একবার ধাক্কা দিল—বাবা একটা বিড়ি ফেলে দাও না বাবা।

শেষ চেষ্টার ফলাফলের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ ভিখিরীটাও চলে গেল। জোছুর মাথার জ্বালা একটু কমেছে। বিছানার ওপর উঠে বসে বললো।—তুমি এত ঘটা করে কি বোঝাতে চাইছ দাদা? ওরা মরে যাক্; এইটেই কি তুমি চাও?

অবনী—আমি ওদের খেতে দিতে পারবো না। তার ফলে যদি ওরা মরে, মরে যাক্।

জোছু—এর পর আর কথা চলে না; নিষ্ঠুরতাই যখন তোমার কাছে একটা বড় গুণ।

অবনী—তোর মত গব্য দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এটা নিষ্ঠুরতা বৈকি। দীনবন্ধু সমিতির ছোক্‌রারা একটা লঙরখানা খুলেছে; চাঁদা চাইতে এসেছিল—দিইনি। ওরাও মুখের ওপর আমাকে কসাই বলে গাল দিয়ে গেছে।

অরুণা—মিছামিছি ওদের সঙ্গে লাগতে যাও কেন ?

অবনী অরুণার মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে সামনে আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিল। হাবভাবে মনে হয় একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে নিচ্ছে।

কপাটে একটা টোকা দিয়ে কে ডাকলো—বাবু !

শোনামাত্র অরুণা ও জোছুর মুখের ওপর একটা আতঙ্কের শক্ লাগলো। দুজনে একসঙ্গে আঁৎকে উঠে বললো—কী আশ্চর্য, এখনো বসে আছে।

অবনী—যাবে কেন ? জোছুর মত একটি মূর্তিমতী দয়া যে এখানে আছে, সেটা ওরা অন্তশ্চক্ষে দেখতে পায়। শিকারী হিসাবে ভিখিরীদের লক্ষ্য কদাচিৎ ভুল হয়। কোন কাবুলীর কাছে কোন ভিক্ষুককে হাত পাততে দেখছো ?

জোছুর দিকে তাকিয়ে অবনী বক্তৃতা স্বরু করে দিল।—তোর তাকানোর ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, তুই এই কথাটাই বলতে চাইছিস্ যে, বিষের জ্বালা সে কি বুঝবে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? কল্পনা করতে কত দুঃখই তোদের হৃদয়ে উথলে ওঠে—আহা ! বেচারীরা এই জলঝড়ে ফুটপাতে শুয়ে আছে, এঁটো ভাত খাচ্ছে, গায়ে জামা নেই। এটাই তোদের গব্য মায়াবাদ, এর মধ্যে বস্তু নেই। ভিখিরীদের জীবন কষ্টের জীবন, এটা তোদের মস্ত একটা ভুল ধারণা। ভিখিরীদের আড্ডার কাছে একটু দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করিস্—ওদের হাসি মস্করা ফূর্তি গল্পের নমুনা দেখে ঘাবড়ে যাবি। পৃথিবীর কাছে ওদের কোন কর্তব্য নেই—এক অবাধ দায়িত্বহীন জীবন। দুটী রিপুর চর্চা ছাড়া ওরা আর কিছু বোঝে না। গেঁজেলের কাছে গাঁজার সুখ এর তুলনায় কিছু নয়। ভিখিরী মায়ের কোলের ছেলে মরে গেলে ওদেরও একটা দুঃখ হয়।

কিন্তু তোমার আমার যে দুঃখ হবে, ওটা মোটেই সে ধরণের নয়; মানুষের দুঃখের তাপ তার মধ্যে নেই। ভাতের হাঁড়িটা ভেঙে গেলে ওরা আরও বেশী করুণভাবে কাঁদে।

দরজায় টোকা পড়লো আবার। —বাবু!

অবনী—ডাকুক, উত্তর দিও না। এ-আর-পি ইঞ্জিনিয়ার শুভেন্দুবাবু হতভম্ব হয়ে গেছেন; ট্রেঞ্চ পরিষ্কার করার জন্য গোটা বিশেক শক্ত-সমর্থ ভিখিরীকে দিন বারো আনা মজুরি দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। ফিরে এসেই দেখেন শুধু কোদালিগুলি পড়ে আছে, সব পালিয়েছে।

জোছু—পালালো কেন?

অবনী—ভগবানেরা খাটবে কেন? কি দায় পড়েছে? চোর ডাকাতের চরিত্রের মধ্যেও একটা সামাজিক মানুষ আছে। চোরেরা জানে কোন্ কাজটা গর্হিত ও সমাজবিরুদ্ধ। তাই বেশ সাবধানে গোপনে অপকর্ম করে। সমাজের নিয়মকে চোরেরা ভয় করে। জীবনের অন্য সব ব্যাপারে ওরা তোমার আমার মত মানুষ। ছেলেপিলেকে ভালবাসে, বাপ-মার সেবা করে, গান শোনে, ছবি দেখে। কিন্তু ভিখিরীরা সমাজের কোন তোয়াক্কা করে না। সব অপকর্ম প্রকাশ্যভাবে করে। কখনো দেখেছো, কোন যাত্রা-গানের আসরের কাছে দশটা ভিখিরী ধৈর্য ধরে গান শুনছে? ভিখিরী মানেই হলো মৃত মনুষ্যত্ব।

দরজার ওপর জোরে দু'তিনবার টোকা পড়লো। —বাবু! বাবু! রুগ্ন তৃষ্ণার্ত মানুষের গলার স্বরের মত।

অরুণা বিরক্ত হয়ে বললো—না, এখানে আর টিকতে দিল না। চল ভেতরের ঘরে যাই।

অবনী—চোরকে আমরা শাস্তি দিই, পাগলকে বেঁধে রাখি, কুষ্ঠ রোগীকে ট্রেনে উঠতে দিই না। জোছুর মতে এসব নিষ্ঠুরতা নয়। আর

একেবারেই মনুষ্যত্ব নেই যাদের, এই ভিক্ষেবাজ জীবগুলিকে প্রেমানন্দে কোল দিতে হবে। নইলে নিষ্ঠুরতা হবে।

জোছু—আমাদের সবারই অন্যায়ের জন্যই তো মানুষ ভিখিরী হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈ কি?

অবনী—আমাদের সবারই অবিচার অন্যায়ের জন্য তো লোকে চোর ডাকাতও হয়ে যায়। তাদের ধরে কচুকাটা করিস্ কেন? (ভিখিরীকে হাঁড়ি ভরে খিচুড়ি খাইয়ে সারা জীবন ভিখিরী করে রাখা যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হয়, তবে চোরকে সিঁদকাটি সাপ্লাই করে আর গেরস্থের ঘটিবাটির খবর দিয়ে সারাজীবন চোর করে রাখাও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম।) কি বলিস্ জোছু?

জোছু—বুঝলাম্, তোমার মতে গরিবের বাঁচবার অধিকার নেই। তারা সব শেষ হয়ে গেলেই তোমরা সুখে থাকবে।

অবনী—পথে এস খুকুমণি। আমি গরিবদের বিষয়ে একটা কথাও এতক্ষণ বলিনি। ভিখিরীদের কথাই হচ্ছে। গরিবেরা মানুষ, ভিখিরীরা মানুষ নয়। গরিব অর্থ একটা অবস্থার ব্যারাম, তাতে মানুষে কষ্ট পায়। দিন আধপেটা খেয়ে গরিবেরা মানুষের মত থাকে। দিনে আটবার খেয়ে ভিখিরীরা ভিখিরীই থাকে। ভিখিরীকে খাওয়ালে তার পেটের নাদাটি শুধু বৃহত্তর হয়, এক কণাও মনুষ্যত্বের সাড়া জাগে না! গরিব যাতে ভিখিরী না হয়ে যায়, সেই দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। ভিখিরীকে খেতে দেবনা—প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষীর মনে এই প্রথম প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। ভিক্ষের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাক্। তখন এই অভাবের দেশে ঠিক এই রকমই আর একটা দেহি দেহি রব উঠবে—কাজ দাও, কাজ দাও।

অরুণা—তখন সবাই কাজ পাবে তো?

অবনী—তখন সমস্যাটাকে আমরা কাছে পাব—কাজ দেবার সমস্যা। ভিক্ষে দেবার প্রশ্ন থাকবে না।

জোছু—তারপর কি হবে ?

অবনী—কাজের দাবি নিয়ে লড়াই চলবে, যতক্ষণ না প্রত্যেকের াছে খেটে খাওয়ার পথ খুলে যায়।

অরুণা—কাজ পেলেই দুঃখ ঘুচবে ? তবে দেশের এত হাজার াজার কেজো লোকের সংসারে এত দুঃখ অভাব কেন ?

অবনী—কাজ পেলেই দুঃখ ঘুচবে না। আর একটা দাবির লড়াই ঠবে—মজুরির দাবি। পেটভরে খাওয়ার মত মজুরি চাই।

জোছু—চাইলেই দিতে বসেছে !

অবনী—তখন আর একটা দাবির লড়াই লাগবে—ক্ষমতার দাবি। ক্ষমতা চাই।

জোছু—ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বসেছে !

অবনী—ক্ষমতা ছাড়িয়ে আনতে হবে—তারই নাম লড়াই।

জোছু ও অরুণার মুখে একটা স্মিত-হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের তিক্ততা যেন হঠাৎ এক স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেল। বিতণ্ডার কুটিল স্রোতটা নানা খাত, নানা আবর্ত প্রপাত পার হয়ে এক মুক্ত সমতলের কাছে পৌঁছে গিয়ে তার সব গতি শেষ করে দিল।

জোছু—শেষ দিকটা যেন কয়েকটা মন্ত্র পড়ে শেষ করে দিলে দাদা।

অবনীর মুখের ভাব আবার পরক্ষণেই যেন একটা দুর্বোধ্য ধূর্ত্ততায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।—কিন্তু তবুও আমি দীনবন্ধুর সমিতির লঙরখানায় কাজ করবো। তোদেরও বসে থাকলে চলবে না। যুগলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে হবে তোদের।

জোছু বোকার মত তাকিয়ে রইল। অরুণা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল। —আমি আগেই জানতাম, তোমার যা-কিছু সবই একটা হেঁয়ালি। জীবনে কখনো স্পষ্ট হলে না তুমি।

অবনী—লঙ্গরখানার ঢুকে মানুষ বেছে নিতে হবে আমাকে।

জোছু—কিসের মানুষ ?

অবনী—যারা লড়তে পারে তাঁরা।

অরুণা—এই ভিখিরীগুলো লড়বে ?

অবনী—এদের মধ্যে যারা আমার কথায় সাড়া দেবে, যারা চালের জন্য লড়তে রাজি হবে, তাদের আমি ভিখিরী বলবো না। তাদেরই উদ্ধার করে আনতে হবে আমাদের সত্যাগ্রহের আয়োজনে।

অবনীর মুখটা কুঁচকে গিয়ে হিংস্রুকের মত হয়ে উঠলো—ওদের কানে কানে শুনিয়ে দেব—বড়লোকেরা তোমাদের মেরে ফেলতে চায়; গবর্ণমেণ্ট হল বড়লোকের বন্ধু। আমরা দেশের গরিব লোকেরাই তোমাদের খাওয়াচ্ছি।

জোছু আর অরুণা শান্তভাবে বসে অবনীর কথাগুলির মর্ম লক্ষ্য করছিল। অবনী বললো—পুণ্যবান দাতা আর সরকারী ভাঁওতার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে। আমরা ওদের কানে কানে শুধু কেড়ে খাবার মন্ত্র পড়ে দেব।

একটু চুপ করে থেকে অবনী বললো—যারা সাড়া দেবে তাদেরই আমরা সংঘবদ্ধ করবো। তারা মানুষ। তাদের ভিখিরী হতে দেব না। যারা সাড়া দেবে না, তারাই ভিখিরী, তাদের নিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। তারা যাতে না খেতে পায়, আমরা বরং সেই দিকে লক্ষ্য রাখবো। সেই অপদার্থ শবগুলি পচে যাক, আমরা তার জন্য দুঃখিত নই। পতিতপাবন সমাজ সংস্কারকেরা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাক্।

দরজার ওপর আস্তে দু'বার ধাক্কা দিয়ে সেই ক্ষীণস্বরটা যেন বিব্রত হয়ে ডাকলো—বাবু।

জোছু উঠে দাঁড়ালো—না আর এ ঘরে নয়। ঐ রব শুনলে আমি

পাগল হয়ে যাব। প্রত্যেক মুহূর্তেকে যেন ওরা পাহারা দিচ্ছে, একটু নিশ্চিন্তে একটু স্বস্তিবোধ করেছ কি; ঐ শব্দের বিষ ছুঁড়ে মারবে! আশ্চর্য! ওঠ বৌদি।

—কে ডাকে? কথাটা বলেই অবনী যেন সম্মোহাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা হাত তুলে ইসারায় জানিয়ে দিল—চুপ, শুনতে দাও। চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ অথচ আকস্মিক বিস্ময়ের স্পর্শে একটু অস্থির।

জোছু ভয়ে শিউরে উঠলো। অরুণা দম বন্ধ করে অনড় কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল—একটা না-জানা শঙ্কায় চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে লাগলো। অবনীর এরকম আচরণ তারা কখনো দেখেনি। অবনী তখনো সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত অন্তর যেন কান পেতে আছে সেই ডাক শোনার জন্য। নাটকের শেষ অঙ্কে উপসংহারের আগে একটা রহস্যভরা স্তব্ধতার মধ্যে তিনজনে অভিনেতার মত দাঁড়িয়ে আছে।

শুনতে পাওয়া গেল। দরজার কড়া নেড়ে সেই ক্ষীণস্বর ডাকছে—অবু।

অবনী দরজার খিলটা সশব্দে খুলে একটা লাফ দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। পেছনে পেছনে প্রায় দৌড়ে এল জোছু আর অরুণা।

অবনী চেঁচিয়ে উঠলো।—পিসিমা আপনি?

পরিধানে আধময়লা একটা থানের শাড়ি, একটা নামাবলী গায়ে জড়ানো, ছোট্টখাট্ট দেখতে এক বৃদ্ধা বিধবা দাঁড়িয়ে আছেন। অবনীকে দেখতে পেয়েই আস্তে একবার হাসলেন। মুখখানা খুবই শুক্‌নো বলে হাসিটাও একটু শুক্‌নো মনে হলো।

তিনজনে প্রণাম করলো। পিসিমা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে জোছুর

মাথায় হাত দিয়ে বললেন।—জ্যোৎস্না নাকি? কত বড়টি হয়ে গেছ! দশ বছর পরে জোছুকে তিনি দেখলেন।

অরুণার চিবুকে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এই প্রথম দেখছেন অরুণাকে।

জোছু পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। অরুণা একটা আসন এনে পাতলো। হাতমুখ ধুয়ে পিসিমা বসলেন। অবনী জিজ্ঞেসা করলো।—এখন কোত্থেকে আসছেন পিসিমা?

—দেশ থেকে।

—হঠাৎ দেশ থেকে চলে এলেন?

অবনীর প্রশ্নের উত্তরে পিসিমা শুধু নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। অরুণা একটা পাখা হাতে কাছে বসেই পিসিমাকে বাতাস করছিল। একটা ক্লান্তিমুক্ত আরামের আস্বাদে পিসিমার চোখ মাঝে মাঝে বুঁজে আসছিল; মাথাটা থেকে থেকে কাঁপছিল, সদ্য রোগমুক্ত মানুষের দুর্বলতার মত।

অবনী দেখছিল পিসিমার মুখখানা। পুরাতন পুঁথির পাতার মত যেন ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ হয়ে উঠেছে। সবারই জীবনে শেষযাত্রার ঘাটের সিঁড়িগুলি এই রকমই ভাঙা ভাঙা। কিন্তু পিসিমা হাসছিলেন, ঈষৎ বিষণ্ণ আবছায়ার মধ্যে ক্ষীণ জোনাকীর জ্বালার মত প্রচ্ছন্ন একটা উত্তর সে-হাসিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

অবনী—দেশে আর থাকা যায় না, নয় পিসিমা?

পিসিমা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন।—না, আর থাকা যায় না।

অরুণা ও জোছুর চোখে তখনো একটা কৌতূহল ফুটে রয়েছে। পিসিমার মত লোক বলছেন—দেশে আর থাকা যায় না। এর অর্থ কি? পিসিমার মত একটি জেদী রাশভারী ও অহংকারী মানুষ

শ্বশুরের সংসারে কর্ত্রীপণার গর্ব ও গৌরব পিসিমা কখনো ভুলতে পারতেন না। জোছু ও অরুণা সেসব পারিবারিক ইতিহাসের ঘটনাগুলি কিছু কিছু শুনেছে। পিসেমশায় মারা যাবার পর কতবার পিসিমাকে আনতে লোক পাঠানো হলো, কত চিঠির অনুরোধ গেল—কিন্তু তিনি এলেন না। তিনি নিজে নিঃসন্তান, তবু বলতেন, আমার সংসার ফেলে কোথায় যাব? দাদু তখনো বেঁচে আছেন, কত দুঃখ করতেন। পিসিমার দেওরদের বিরাট সংসার—মাসে একটা করে অন্নপ্রাশন বছরে একটা করে বিয়ে আর জগদ্ধাত্রী পূজো। পিসিমার আধিপত্য সেখানে সর্বময়। পিসিমাকে না হ'লে ছেলেগুলি পড়তে বসবে না, গরু-গুলির যত্ন হবে না—সে-সংসারের তরণী যেন বানচাল হয়ে পড়বে।

কিন্তু আজ এমন কি অঘটন ঘটেছে যে, সেই পিসিমা শুধু একটি নামাবলী গায়ে, খবর না দিয়ে, দূর পথের ক্লেশ সহ্য করে হঠাৎ একা একা কলকাতায় চলে এলেন? কিবা সেই অঘটন, যার জন্যে তাঁর আতুরে সংসারের হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে পিসিমা সরে আসতে পারলেন? সেই সংসারই বা তাঁকে ছেড়ে দিল কেন?

অবনী পাশের ঘরে উঠে গিয়ে ডাকলো।—শোন

অরুণা আর জোছু আসতেই অবনী একটু চাপাস্বরে বললো।—পিসিমাকে স্নানের জল দাও। আমি কিছু ফল কিনে আনছি। ফিরে এসে আবার আটার যোগাড়ে বের হতে হবে। পিসিমাকে বিছানা করে শুইয়ে দিও। বুড়ো মানুষ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কথাগুলি শেষ করেই অবনী চটে গেল।—হাঁ করে শুধু তাকাচ্ছো কেন তোমরা? পিসিমা মরে যেতেন, খেতে না পেয়ে—তাই চলে এসেছেন। এখন তাঁকে বাঁচতে দাও। এই সোজা কথাটা বুঝতে হাঁ করার দরকার হয় না।

অরুণা সত্যিই তার চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে আনতে পারছিল না; একটা প্রকাণ্ড বিমূঢ়তার ফাঁদের মধ্যে তার বুদ্ধিটা যেন হাঁসফাঁস করছিল। জোছু ভয় পেয়ে যেন আরও বোকা হয়ে গেল। হঠাৎ চোখে পড়লো, পিসিমা মেজের ওপরেই শুয়ে পড়েছেন। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে জোছু পিসিমাকে জড়িয়ে তুলে ধরলো।—বিছানা করে দিচ্ছি পিসিমা, তারপর শোবেন। আগে স্নান করে নিন।

জোছুর চোখ দুটো লাল্‌চে হয়ে উঠলো, যেন ধোঁয়ার জ্বালা লেগেছে। জীর্ণ খড়ের পুতুলের মত পিসিমার ছোট্ট শরীরটা দু'হাতে জড়িয়ে জোছু বসে রইল। পিসিমা নিঃশব্দে অপ্রস্তুতের মত একটু সলজ্জ ও শুক্‌নো হাসি হাসতে লাগলেন।

অবনী বললো।—আমি বাজারে চললাম।

একটা গামছা হাতে নিয়ে গড়িয়াহাটা বাজারের দিকে এগিয়ে চললো অবনী। মাত্র তিনটে বেজেছে, বিকেলের রোদে ঝলসে রয়েছে চারদিক। ইঁট-পাথরের কলকাতার কঠিন শহুরে ভব্যতার পরিচ্ছদটুকু কোথাও একটু টোল খায়নি। সেই রম্য রাজপথ আর অট্টালী, দু'পাশে বিপণির বিথার, ট্রাম-বাসের রেস্, ছোট ছোট লনের কাণায় কাণায় সুশ্যামল পরিপূর্ণতা, পার্কের তরুলতায় ছায়াময় প্রসন্নতা আর ছোট পাখির ডাক—কোথাও কোন ছন্দোভঙ্গ নেই। শুধু বিধ্বস্ত হয়ে গেছে জীবনের ধর্ম। ঘোলা জলের ফেনার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের প্রাণ পথের ওপর ঘুরছে ভাসছে—থম্‌কে রয়েছে। কলকাতা শহর যেন কোন বড়লোকের রঙিন বজরার মত এক মড়া-ভাসা শ্মশাননদীর ওপর ভাসছে।

তিনটে কণ্ট্রোলে লাইন মার্কেটের তিনটে ফটক পার হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে—একটা চালের লাইন, একটা আটার লাইন আর একটা চিনির। ফুটপাথের ওপরে মুখোমুখি দুটো সমান্তরাল পংক্তি—শিশি বোতল নিয়ে ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী, ভদ্র ও ভদ্রেতর প্রায় দু'শো মানুষ সুবাধ্য পড়ুয়াদের মত বসে আছে। এটা কেরোসিনের লাইন। চালের লাইনের চেহারটা সব চেয়ে ভয়ানক—কলিশনে বিকৃত ট্রেণের মত এঁকে বেঁকে, কখনো কাৎ হয়ে, কোথাও কুঁকড়ে গিয়ে, গড়িয়াহাটা রোডের ওপর দিয়ে লেকের দিকে চলে গেছে।

প্রত্যেক ট্রাম-বাসের স্টপগুলির কাছে অর্ধোলঙ্গ অস্থিসার মানুষের এক একটা ব্যূহ। ক্ষণিকের জন্য একটু অসতর্ক বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কোন পথচারীর আর রক্ষা নেই। ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে মুহূর্তে একটা নরকঙ্কালের প্রাচীর যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠে—এক মৃত্যুকুণ্ডের মধ্যে টেনে নেবার জন্য পঙ্কিল দাঁতগুলি দাও দাও শব্দ করতে থাকে।

রোডের দুপাশের ফুটপাত আর মাঝের আইল্যাণ্ড ট্র্যাকের ওপর নিরন্ন গ্রাম-ছাড়া মানুষের ছাউনি পড়ে গেছে। শত শত উনুন জ্বলছে। হাড়িতে সেদ্ধ হচ্ছে কচুর শাক, চিংড়ির খোসা, ভাত। ধোঁয়ার উৎপাতে কাকের দল এগুতে পারে না, শুধু আশেপাশে লাফালাফি করে বেড়ায়।

একদল লোক হাঁড়ি-সরা নিয়ে অবনীর গায়ের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে হিন্দুস্থান পার্কের দিকে দৌড়লো। হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি আর মাথায় পাগড়ি, দারোয়ান গোছের একটা লোক দূরে স্লিট ট্রেঞ্চের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছিলো—আয়! আয়! দেখা যায়, কোমরে গামছা বেঁধে জন দশেক ছেলে দুটো বড় বড় টবের ভেতর লম্বা লম্বা কাঠের হাতা ডুবিয়ে একটা সুপক্ক খাদ্যবস্তু ঘাঁটছে—ভুর ভুর করে বাষ্পের স্তবক চূর্ণ হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ লোকগুলির দৌড়ের উৎসাহ মন্থর হয়ে গেল। সামান্য কয়েক-জন মাত্র ভাণ্ড হাতে একটা অনিচ্ছার ভাঁটি ঠেলে টেনেটুনে কোনমতে এগিয়ে চললো। অবনী শুনলো, তারই সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিরাশ্রয়ের দল সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আলোচনা করছে। —ওখানে কেউ যেও না গো। জাউ খাইয়ে দেবে, থুঃ।

এটাই কি ডক্টর সর্বরঞ্জন সেনগুপ্তের বৈজ্ঞানিক লঙ্গরখানা? অবনীর মনে পড়লো, প্রতিদিন খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি নিরন্নদের বৈজ্ঞানিক খাদ্য বিতরণের জন্য সাগ্রহে আহ্বান করে। ছোট একটা ছেলে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল, তার হাতে টিনের একটা কৌটাতে সেই বৈজ্ঞানিক খাদ্য টলটল করছে। অবনী ছেলেটাকে ডেকে একবার স্বচক্ষে সেই বিচিত্র বস্তুটির রূপ দেখে নিল। সবুজ রঙের কাইয়ের মত দেখতে—নানারকম শাক গাছড়া ভূষি আর চীনে ঘাসের দানা দিয়ে তৈরী একটা লপ সি।

যেদিকে তাকানো যায়, শুধু নিরন্ন রুগ্ন ও মুমূর্ষু মানুষের জটলা। হুল্লোড়, চীৎকার, কান্না, কলহ ও বিলাপের শব্দতাণ্ডব। সেই দগ্ধ জনারণ্যে পৃথিবীর সব সুস্বর চাপা পড়ে গেছে। প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায়, গুঁড়ির ওপরে, ডালের গায়ে যত সব উচ্ছন্ন সংসারের সামগ্রী জড়ো করা, তুলে রাখা, টাঙানো। হাঁড়ি কলসী, কাঁথার পুঁটলি, ঝুড়ি, ডালা, তেলাই। মানুষ যেন গর্ত খুঁড়ে, চাক বেঁধে, ঢিবি তুলে যেখানে যেমন খুশি বাসা করে ফেলেছে।

লেকের দিক থেকে গর্জন করে ধূলো উড়িয়ে একটা আঁধি ছুটে আসছে মনে হলো। একটা মিলিটারি লরির ক্যারাভ্যান। আকারে অতিকায় ঐরাবতের মত, রঙ ঘেসো ফড়িংয়ের মত, ক্রুদ্ধ গণ্ডারের চেয়ে প্রমত্ত বেগ—লরিগুলি সগর্জনে গড়িয়াহাটার মাটি থরথরিয়ে বিদ্যুৎ-

তাড়িত ছবির মত ট্রাম-লাইন ডিঙিয়ে উধাও হয়ে চলেছে। তবু শেষ হতে আর চায় না। টিকোলো নাকে চশমা পরা, হাসিখুশী ইয়ারবাজ চেহারা, এক একটি যুবক-আমেরিকা আলগোছে স্টিয়ারিং ধরেছে, পাশে মেয়েমানুষ নিয়ে, শরীর হেলিয়ে বসে আছে—এক সুতীব্র ইয়াকির উল্লাসে যেন উড়ে যাচ্ছে। তারপর আর এক শ্রেণীর রথী, সখ করেই গা আদুড় করে নিয়েছে। গায়ের রঙ ঘেয়ো ঘেয়ো, মুখটা তামাটে —চুরুট চুষে চুষে ঠোঁটগুলি ভোঁতা হয়ে গেছে। এরা বোধহয় খাস ব্রিটেনের চাষাভুষো জাতের ড্রাইভার—স্টিয়ারিংয়ের ওপর বুক সাঁটিয়ে দিয়ে বেপরোয়া বেগে ছুটে চলেছে। হঠাৎ এক একটা ভারতীয় মুখ দেখতে পাওয়া যায়—খাকি পাগড়ির নীচে এক জোড়া কড়াপাকের জাঠ গোঁপ। এদের হাতে পড়ে গাড়িগুলি যেন একটু সাত্ত্বিক হয়ে পড়েছে— মোটেই উদ্দামতা নেই, একটা সংযতালস ভাব, মন্দস্রোতের ভেলার মত আস্তে আস্তে চলেছে। আবার আসে গোটা পঞ্চাশ ছোট ছোট মোটর —শ্যাসির ওপর শুধু একটুকরা ক্যানভ্যাসের ছই। খাকি উর্দির সাজের মধ্যে নিগ্রো সৈনিক ড্রাইভারের কুচকুচে কালো মুখগুলি বহুদূর থেকেই চিনতে পারা যায়। পুরু ঠোঁটে বেশ একটা গম্ভীর ভাস্কর্যের বনেদিয়ানা আছে। চোখের দৃষ্টিতে রসালুতা আছে। মেয়েদের ভিড় দেখলেই একটু জোরে হর্ণ বাজানো অভ্যাস। বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

শেষ হলো এতক্ষণে! বিশ্বজোড়া যুদ্ধের নিদারুণ ঝিল্লীস্বর যেন কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র গড়িয়াহাটার এক ভিক্ষুক-নিকেতনের বিলাপ ডুবিয়ে দিয়েছিল।

মিত্রশক্তি না শক্তির মিত্রত্ব? চাল কিনতে বার হয়ে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধতত্ত্বের রহস্যটা অবনীর মত বাঙালী কেরানীর চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে খোঁচা

দিয়ে হিসাব ভুল করে দেবে, তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। লড়াইটা চিরকালই পুণ্যে ও পাপে। এটা সবারই জানা কথা, এর মধ্যে কোন উঁহুর অবকাশ নেই। এই লড়াই অর্থই নাকি ইষ্ট বনাম অনিষ্টের লড়াই। এবং, ইংরাজ যেপক্ষে থাকবে সেটাই ইষ্টপক্ষ। এটা বিশ্বাস না করা বে-আইনী।

কিন্তু অবনী যদি আজ বলে—'তুমি ভেবে দেখ ইন্দ্র, পাপে-পাপেও লড়াই হতে পারে। সেই লড়াইয়ের মত ভণ্ড মূঢ় ও নিষ্ফল সংগ্রাম আর কিছু হতে পারে না। তার মধ্যে কোন ইষ্টের প্রশ্ন নেই—তার পরিণাম অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইন্দ্র তাহ'লে শুধু অবনীকে মারতে বাকি রাখবে, বলতে অবশ্য কিছুই বাকি রাখবে না। আড়াই ডজন বুলি আউড়ে তখুনি প্রমাণ করে দেবে—এটা হলো জনযুদ্ধ।

—দেখছো বাবু, এই থাল-ভরা মেউড়োগুলো আমাকে জ্বালালে।

মেয়ে মানুষের গলার স্বর শোনা গেল। অবনী পেছনে তাকিয়ে দেখলো, একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা খোলা হাইড্রেণ্ট থেকে জলের ফোয়ারা উঠছে। দুটো পশ্চিমা গাড়োয়ান চার পাঁচটে কাদামাখা মোষ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই ফুটপাতের ওপরে মাটির শয্যার ওপর একটি জলে ভেজা শিশু বসে আছে, বোধহয় স্নান করানো হয়েছে। ঠিক শিশু তো নয়—শিশুর ভগ্নাবশেষ। ক্ষুদ্র একটি চর্মপেটিকা, মাথাটাও চুপসে গেছে। শিশুর মাতা হাইড্রেণ্টের মুখের কাছে গুটি সুটি হয়ে বসে একটা কাপড়ের টুকরো থুবে থুবে কাচছে। সেই বলেছে কথাটা।

অবনী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো—শুষ্ক শীর্ণ একটা উলঙ্গ মূর্তি। সেই কাচা কাপড়ের টুকরোটা কোমরে এক পাক জড়িয়ে, এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিল মেয়েটি।

মার্কেটের দিকে আরও কিছু দূরে এগিয়ে দাঁড়ালে কোলাহলের

মাত্রা বৈচিত্র্যে ও বীভৎসতায় চরম হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম নোংরা করে দেয়। মানুষের বোধশক্তির ওপর একটা পঙ্কিল বর্ষা নেমে আসে। জায়গাটা যেন একটা বিরাট পুরীষক্ষেত্র—দুর্গন্ধে বাতাসের পরমাণুগুলি বোধহয় বিষিয়ে গেছে। লাইন-বাঁধা জনতা নিজেদের মারামারি গালাগালি ও ধাক্কাধাক্কিতেই বিপর্যস্ত। মার্কেটের ফটক যেন হাঁ করে একটা নরমুণ্ডের মালা চিবোচ্ছে।

আর একটু অন্যমনস্ক হলেই মাড়িয়ে ফেলতো অবনী। পথের ওপরেই একটা শুকনো নারকেলের ডেগোর ওপর ছোট্ট একটা ছেলে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার চোখের কোটর দুটো মাছিতে ভর্তি—বিকট পক্ষ্মহীন প্রেতচক্ষুর মত দেখাচ্ছে। মরেনি এখনো, পেট আর পাঁজরা-গুলির মধ্যে নিশ্বাসের স্পন্দন এখনো লুকোচুরি খেলছে।

উনিশশো তেতাল্লিশের কলকাতার একটি অপরাহ্নের এই এক রূপ। বিরাট একটা কটাহে যেন মনুষ্যত্ব ভাজা হচ্ছে। হৃত-অন্ন যুদ্ধদাস বাংলার প্রতি গ্রামে-জনপদে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নাড়ীর লালা বেনো জলের মত সব ঠাঁই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! মেঠো ইঁদুরের মত নিরাশ্রয় মানুষেরা দলে দলে কলকাতার চড়ায় এসে ঠেকেছে। সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি—এরা আসছেই। ট্রেনে চড়ে, পথে হেঁটে, বনবাদাড় ঝোঁপঝাঁপ ঠেলে তারা আসছে। ক্ষান্তি নেই। এক অফুরান অন্ত্যেষ্টির মিছিল।

সব পথের শেষ কলকাতায়। বাংলার রাজধানী, মহাযুদ্ধের স্কন্ধাবার, পণ্যের ভাণ্ডার, শস্যের গোলা কলকাতা। বাংলার সামাজিক অর্থনীতিক ও রণনীতিক জীবনের হেড অফিস কলকাতা। লাটের মসনদ, উজিরের দপ্তর—সাহিত্য বানিজ্য ধর্ম শিল্প ও বেশ্যার ডিপো কলকাতা। সারা বংলার স্নায়ু শিরা আর নাড়ী এখানে এসে এক হয়ে মিশে গেছে—একটি ভয়ানক মস্তিষ্ক, একটি বিরাট হৃৎপিণ্ড ও একটি

প্রকাণ্ড উদর সৃষ্টি করেছে। এই হলো কলকাতা। এ কলকাতার সর্দি লাগলে সারা বাংলা হেঁচে মরে।

চাল কিনতে হবে, না পেলে আটা। খেতে হবে—আপাততঃ ব্যক্তিস্বার্থের এই ক্ষুদ্রতম প্রশ্নটাকে একটু প্রশ্রয় না দিলে বড় কথার চিন্তায় শুধু খাবি খেতে হবে। চাল চাই, ফুটপাথ ধরে এক একটি দোকানে ঢুঁ মেরে ঘুরতে লাগলো অবনী। কিন্তু কোন দীনশরণ আগরওয়ালা বা কৃপাসিন্ধু সাহার দোকান পাওয়া গেল না।

অগত্যা কি করতে হবে এবং কি করা উচিত সেবিষয়ে অবনীর ধারণাটাও স্পষ্ট ছিল। তার জন্য সে তৈরী হয়েও আছে। এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে সমস্ত দৃশ্যটা বেশ একটা নাটকীয় মোহ নিয়ে অবনীকে যেন ধীরে ধীরে শান্ত করে দিচ্ছিল। না, পালিয়ে লাভ নেই। ভবিষ্যতের কলকাতা হয়তো ধনধান্যে লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে যাবে, সহাস্যে মুঠি মুঠি সমৃদ্ধির সোনা ছড়াবে। এই মূর্তি তখন আর থাকবে না। কিন্তু এই চৌরতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী কলকাতাকে চিনে রাখতে হবে। অভ্যস্ত হয়ে থাকাই ভাল। ঐ যে উপেনবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছেন—ইসারা করলেই এখনি এক মণ চাল পৌঁছে দেবেন—পঁয়তাল্লিশ টাকায়। আপাততঃ উপেন-বাবুরা একটু দূরে থাকুক। উপেনবাবুদের অনুকম্পা কোন মনুর সংহিতা গ্রাহ্য করে চলে না; মুনাফার জন্যই মুনাফা—এর মধ্যে একটা নিষ্কাম নিষ্ঠা আছে; তাই এর রূপ এত ভয়ানক। আজ এই মুনাফার বাঘ পঁয়তাল্লিশ টাকা দরেই তৃপ্ত হয়ে আছে। আবার বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? কালই হয়তো হাঁ করে একশো টাকা দরের স্বাদ খুঁজবে। এতখানি রক্ত দেবার মত রোজগার কেরানী অবনীনাথের নেই। তখন এই পথেই নেমে আসতে হবে। তার চেয়ে এখনই ভাল। মার্কেটের ফটকের দিকে এগিয়ে গেল অবনী।

একটা ফলওয়ালার চাকার পাঁচ ঝুড়ি পচা বেদানা পথের ওপর উপুড় করে ফেলে দিয়ে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে শকুনের ঝাঁকের মত একদল স্ত্রীলোক পচা ফলের ওপর লাফিয়ে পড়ে হানাহানি করে যেন নিজেদের ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগলো। একটা মোটর গাড়ি তীব্র বেগে দৌড়ে এসে আচমকা ব্রেক কষে থামলো। রেড ক্রস সোসাইটির একটা ভ্যান—লাউড স্পীকারের চোঙ থেকে একটা নাচের বাজনা ভীমমন্দ্রে স্বরের গদা ভাঁজতে লাগলো।

এই শ্মশানে আবার নেড়ার নাচ কেন? গাড়ি থেকে কতকগুলি লোক নেমে বড় বড় কয়েকটা পোস্টার চারদিকে সাজিয়ে রাখলো। বাংলা দেশের কাছে চল্লিশ লক্ষ টাকা চাই—তার জন্য আবেদন। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে—ঠিক উপযুক্ত জায়গা বেছে এসেছে রেড ক্রসের ভ্যান। রসিকতা জিনিসটা শ্লেষোক্তি অলংকারেই বেশ ভাল করে জমে।

একটার ধাক্কা মিটতে না মিটতে আর একটা। দু'পা এগিয়ে যেতে না যেতেই একটা লোক এসে অবনীর হাতে হ্যাণ্ডবিল গুঁজে দিয়ে গেল। —রক্ত দাও। এই আবেদনটা সত্যিই রক্ত খুঁজছে—তরল উষ্ণ লোহিত বর্ণের যেবস্তু মানুষের দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। ব্লাড ব্যাঙ্কের আবেদনটা একবার পড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো অবনী। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আটার লাইনটা এরই মধ্যে ক্ষয়ে অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। অবনী এই নরশৃঙ্খলের শেষ কড়াটির মত একেবারে শেষে গিয়ে গামছা হাতে দাঁড়ালো।

সিতা বসুর জন্মদিন। প্রতি বছর এই দিনটিতে সিতার বাড়িতে একটা উৎসবের সমারোহ জাগে। সিতার বাবা গুরুদয়ালবাবু, ওরফে

মিস্টার বসু, তাঁর কারবার ডিভিডেণ্ড শেয়ার আর ডিবেঞ্চারের সারা বছরের তুফান পাড়ির মধ্যে এই একটি দিনের জন্য নোঙর ফেলে সুস্থির হন। বছরের এই একটি দিন তাঁর কাছে পার্বণের মত। ফুলবাগানে শামিয়ানা টানিয়ে দুটি সুদীর্ঘ সারি দিয়ে টেবিল চেয়ার সাজানো হয়। নিমন্ত্রিতেরা আসেন।

বছরের মধ্যে এই একটি দিনে তাঁর বাড়িতে একটা সজ্জনতার মেলা আহ্বান করেন গুরুদয়াল বাবু। সারা বছরের অর্জন ও সঞ্চয়ের গর্বকে যথাসৌজন্যে অভ্যাগতদের কাছে ব্যক্ত করার এই সুযোগটি তিনি কখনো বৃথা হতে দেন না। গল্পে ও কথাচ্ছলে, ঘোষণায় ও সমবেদনায়, হাসিতে ও বিদ্রূপে, প্রতিবাদে ও রসিকতায়—প্রত্যেকটি আচরণে তাঁর কাঞ্চনকৌলীন্যের এক একটি কীর্তিকে তিনি পরিবেষণ করেন। তাঁর কাছে শুনতে হবে—সম্প্রতি দুটো উগাণ্ডা জেসমিনের চারা আনিয়েছেন, খরচ পড়েছে নাইন হান্ড্রেড এণ্ড সিক্সটি ফাইভ। তাতে কিছু আসে যায় না, জেসমিন দুটো বাঁচলে হয়। তাঁর ক্রাইস্লারের ইঞ্জিনটা ভাল ওয়ার্ক করছে না, কাশ্মীর যেতে পথে দু'বার দাগা দিয়েছে, তাই নতুন একটা পন্টিয়াক কিনেছেন। ঐ যে দেখছেন বড় চায়না ভাজটার মধ্যে ছোট একটা গাছ, লুক্‌, বলতে পারেন ওটা কি ?

অভ্যাগতেরা কৌতূহলী হয়ে গলা লম্বা করে দেখতে থাকে। গুরুদয়াল বাবু বলেন।—ওটা একটা ওক। বয়স তেত্রিশ বছর। যখন কিনেছিলাম তখন ওটার বয়স ছিল এগার বছর। আমার কাছে আসবার পরেও প্রায় তেরশো টাকা খরচ পড়েছে বোনসাই করাতে—আর আধ ইঞ্চিও বাড়তে দিইনি।

গুরুদয়ালবাবু উঠে গিয়ে বেঁটে ওকটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে এক পশলা প্রশংসার আশায় সকলের দিকে তাকাতে থাকেন।

দেখাবার পক্ষে তাঁর কাছে সব চেয়ে গর্বের বস্তুটি হলো তাঁর দুহিতা সিতা বসু। রূপের ও গুণের এমন সমাবেশ বিরল, এই সত্যে কেউ সংশয় করতে পারে না। সিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ সবারই মনে প্রথম যে-প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটা হলো—গুরুদয়ালবাবুর জামাতৃপদ এখনো খালি পড়ে আছে কেন? কে সেই ভাবী ভাগ্যবান? মিস্টার বসু কি কাউকে বেছে রেখেছেন? অথবা সিতা বসু নিজেই তার জীবনের দোসর ঠিক করে রেখেছে? জয়ন্ত মজুমদার ঘুর ঘুর করছে, বড় বাধ্য ও বিনয়াবনত ভাব, যেন বাড়ির ছেলেটি। তবে কি জয়ন্তই সেই উপপদ তৎপুরুষ? কিন্তু জয়ন্তের কোন গুণের খবর তো কেউ আজও শোনেনি। বাপের টাকা আছে, ঐ পর্যন্ত।

আজকের জন্মদিনের উৎসবটার রূপ ঠিক হুবহু অন্য বছরের মত নয়। একটু ব্যতিক্রম আছে। প্রথমেই চোখে খট্‌কা লাগে, এই অভিজাত সমাবেশের মধ্যে দু'তিনটা আটপৌরে মূর্তি—প্রকাশবাবু ইন্দ্রনাথ আর উর্মিলা কাঞ্জিলাল।

গুরুদয়ালবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।—এঁরা হলেন সিতার সংঘবন্ধু। এরা মস্ত একটা কালচারাল কাজে হাত দিয়েছেন। সিতা এদের খুব সাহায্য করছে।

অভ্যাগতেরা উৎসুক হয়ে তাকালেন। তারা জানতে চান—কি সেই কাজ? কিসের সংঘ?

প্রকাশবাবুই কথা বলে কৌতুহল ভঞ্জন করলেন—জাগৃতি সংঘ।

গুরুদয়ালবাবু হেসে হেসে বললেন—জয়ন্তও সংঘের একজন বড় কর্মী। কিন্তু দেখুন, কেমন চুপটি করে বসে আছে। সায়লেণ্ট ওয়ার্কার!

সাহেবী পোষাকে সজ্জিত, সম্ভবতঃ ব্যারিস্টার এক বৃদ্ধ বললেন।—

জাগৃতি সংঘের ব্যাপারটা শুনতে আমাদের খুবই আগ্রহ হচ্ছে। কেউ যদি অনুগ্রহ করে বলেন।

প্রকাশবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন।—আজকের এই আসরে জাগৃতি সংঘের আলোচনাটা অবশ্য একটু অবান্তর মনে হবে, তবে যদি নিতান্তই আপনারা ইচ্ছুক থাকেন ····।

বৃদ্ধ—যদি আইনের কোন বাধা না থাকে···।

প্রকাশ—না, না, আইনের বাধার কোন কথা এর মধ্যে নেই বরং আইন আমাদের তরফেই আছে।

উর্মিলা কাঞ্জিলালের মন্তব্য শোনা গেল।—আমাদের কাজই হলো সকলের কাছে এই নতুন আদর্শ প্রচার করা। এইভাবে বলতে বলতে যদি সাধারণের মধ্যে একটা চেতনা আসে!

বৃদ্ধ—ঠিক বলেছেন। ঐ চেতনা জিনিষটার বড়ই অভাব আমাদের মধ্যে। প্রকাশবাবুর মুখে দুটো নতুন কথা শুনতে পেলে আমাদের বড় উপকার হবে।

প্রকাশবাবু আরম্ভ করলেন।—প্রথমে মনে করুন, এই ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে···।

বৃদ্ধ—Hypothesis; এটা প্রমাণিত হলে খুশী হব।

প্রকাশ—জার্মানী, ইটালি ও জাপান, এরা ফাসিস্ত-ধর্মী।

বৃদ্ধ—একটু পরিষ্কার করে বুঝতে চাই।

প্রকাশ—এরা পররাজ্য গ্রাস করতে এবং শোষণ করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে নতুন রকমের একটা সামরিক ও অর্থনীতিক পদ্ধতি এরা আয়ত্ত করেছে, সেটা যেমন ভয়ানক, তেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি কঠোর।

বৃদ্ধ—ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের কথাটা ভুলে যেতে বলছেন? সেটা আছে কি নেই? তার পদ্ধতিটা কি রকম? অভয়ানক, সদয় ও কোমল?

প্রকাশ—আছে, তবে ফাসিস্তির চেয়ে ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের মেশিনারি একটু সেকেলে ও জীর্ণ।

বৃদ্ধ—সেই কারণে ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ বাঞ্ছনীয় ?

প্রকাশবাবু বিরক্তিভরেই উত্তর দিলেন।—না।

বৃদ্ধ—তাহলে আপনি আমাকে এই রকম একটা কুস্তির ছবি দেখাচ্ছেন, যার মধ্যে দেখছি—একটি বুড়ো পালোয়ান ও একটি ছোকরা পালোয়ানে ধস্তাধস্তি বেধেছে। বুড়োর চেহারা বিরাট, গায়ের জোরও আছে। কিন্তু ছোক্‌রা প্যাঁচ জানে ভাল।

প্রকাশ—তাই যদি বলি, তবে আপনি তার থেকে কি সিদ্ধান্ত করবেন ?

বৃদ্ধ—সিদ্ধান্ত এই যে, বুড়ো পালোয়ান ভাবছে, এ যাত্রা পার পাই তো এমন সব প্যাঁচ শিখে রাখবো যে ভবিষ্যতে কোন ছোক্‌রা আমার ওস্তাদী চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করবে না।

প্রকাশ—তাহ'লে আপনি বলতে চান···।

বৃদ্ধ—বলতে চাই, এই লড়াইটা ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ বনাম অতি-ইম্পিরিয়ালিজ্‌মে। অন্যভাবে বলা যায়, ফাসিস্তি বনাম অপ-ফাসিস্তির লড়াই। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ তার নিজের ভালর জন্যই দ্রুত তার ঠাট বদলে ফেলেছে, ভোল ফেরাচ্ছে। এটা ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

প্রকাশ—মস্ত ভুল করলেন। ভোল ফেরাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে। ইম্পিরিয়ালজ্‌ম্‌ নিজেই ভেঙে পড়ছে।

বৃদ্ধ—প্রমাণ করুন।

প্রকাশ—দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ—কি দেখতে পাচ্ছেন ?

প্রকাশ—ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ ভেঙে পড়ছে।

বৃদ্ধ—Circulus in probando—আচ্ছা তারপর ?

প্রকাশ—এদিকে পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী দেশ রুশিয়াকে ফাসিস্তরা আক্রমণ করেছে।

বৃদ্ধ—জাপান আক্রমণ করেনি।

প্রকাশ—নিজের সুবিধে বা অসুবিধের জন্যেই করেনি। ভবিষ্যতে করতেও পারে।

বৃদ্ধ—Argumentum ab inconvenienti—আপনার বলা উচিত, ফাসিস্তদলের কোন কোন সদস্য রুশিয়ার ওপর হাম্‌লা করেছে

প্রকাশ—তাই যদি বলি, তবে আপনার কোন সুবিধা হলো কি ?

বৃদ্ধ—মস্ত সুবিধা হলো। আমি এখন বলতে পারবো, কোন আদর্শগত সংকল্প নিয়ে এ যুদ্ধ হচ্ছে না। দেশগত স্বার্থ নিয়েই এ যুদ্ধ।

প্রকাশ—কিন্তু রুশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণটাই যে এই যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও পরিণাম বদলে দিল।

বৃদ্ধ—আবার এ বুড়োকে বিপদে ফেলছেন প্রকাশবাবু। প্রমাণ না দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত থেকেই যদি বক্তব্য আরম্ভ করেন, তাহলে আমি কিছু বুঝতে নাচার।

প্রকাশ—যেদিন সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর জার্মানী আক্রমণ করেছে, সেই ১৯৪১ সালের ২২শে জুন থেকে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ—প্রমাণ করুন। আমি বলবো, সেইদিন থেকে ফাসিস্তরা সত্যি করে ইম্পিরিয়ালিস্ট হবার পথে যাত্রা সুরু করেছে।

প্রকাশ—বিশ্বের জনসাধারণের মঙ্গল সোভিয়েট রুশের জয়ের ওপর নির্ভর করছে।

বৃদ্ধ—প্রমাণ করুন। অবশ্য রুশ জনসাধারণের শুভাশুভ রুশিয়ার জয়-পরাজয়ে নির্ভর করবে, এটা সাদা কথা।

প্রকাশ—তার চেয়ে বেশী। রুশিয়ার জয়ে পৃথিবীর জনসাধারণের জয়।

বৃদ্ধ—বড় দুঃখু দিচ্ছেন মশাই। একটু আধটু প্রমাণ পেলেই আমরা খুশী হয়ে বিশ্বাস করি। কিন্তু আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতে আর ভরসা পাই না।

প্রকাশ—সোভিয়েট রুশিয়া যে পৃথিবীর সর্বদেশের প্রলেটারিয়েটের পিতৃভূমি, এ তথ্য জানা থাকলে আপনাকে ঐ ল্যাটিন ফ্রেজের ধাঁধার মধ্যে বৃথা ঘুরতে হতো না।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল সিতার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন। সিতাও হেসে ফেলবে, এইটেই বোধ হয় তিনি আশা করছিলেন!

বৃদ্ধ—আমার মত জিজ্ঞাসুর বিদ্যেবুদ্ধির মাথায় জোরে একটা তাচ্ছিল্যের চাঁটি বসিয়ে দিলে আপনার মত প্রচারকের বিজ্ঞতা বড় হয়ে ওঠে না। প্রশ্ন করা যদি অন্যায় হয়, তবে বুঝবো আপনি আপনার কতগুলি বিশ্বাসের কথা বলছেন; এবং আমিও আপনার বিশ্বাস ভাঙতে ইচ্ছে করি না।

প্রকাশবাবু স্বর নরম করে বললেন—সোভিয়েট রুশিয়ার শাসন ক্ষমতা প্রলেটারিয়েটের হাতে।

বৃদ্ধ—বেশ তো, আমাদের কাছে সেটা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ।

প্রকাশ—সেইজন্য রুশের জয়লাভ সর্বদেশের প্রলেটারিয়েটের পরিণাম বদলে দেবে।

বৃদ্ধ—যুদ্ধের আগে যখন জয়পরাজয়ের প্রশ্ন ওঠেনি, তখন অন্য দেশের প্রলেটারিয়েট শাসকশ্রেণীর চাকর হয়ে ছিল। সোভিয়েট রুশের প্রভাব

তখন কোথায় ছিল ? আমরা তো মনে করবো, সেই পূর্বাবস্থাই ফিরে আসবে।

প্রকাশ।—যুদ্ধের আগে ফাঁসিস্তির অভ্যুদয়ের একটা সময় গেছে। সে সময়টা শ্রমিকের দুর্ভাগ্যের ভরা শুধু পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু রুশিয়ার জয় হ'লে ফাসিস্তির পতনের ভেতর দিয়েই সেটা হবে। সেই সঙ্গে সর্বদেশের শ্রমিকের মুক্তির পথ খুলে যাবে।

বৃদ্ধ।—অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, রুশিয়ায় সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অন্য দেশে তার প্রভাব পড়েনি, উল্টো ফাসিস্তির অভ্যুত্থানটাই সহজভাবে হয়েছিল।

প্রকাশ।—কিন্তু কতগুলি দেশের শ্রমিক সাধারণের মধ্যে সাম্যবাদের সাড়া জেগেছে ; চীনে ভারতবর্ষে ফ্রান্সে, এমন কি ইংলণ্ডেও।

বৃদ্ধ।—একই সূর্যের কিরণে এক জায়গায় আলো হলো, আর এক জায়গায় অন্ধকার। আমাকে এই কথাটা বিশ্বাস করতে বলছেন ?

প্রকাশ।—করুন না, ক্ষতি কি ?

বৃদ্ধ।—না মশাই, এটা আপনার জুপিটারের আলো। সূর্য্যের আলো এরকম হতে পারে না।

প্রকাশ।—তাই বিশ্বাস করুন।

বৃদ্ধ।—কিন্তু জাগৃতি সংঘের প্রচারক হিসাবে আপনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন। আপনার বিশ্বাসটা আমি পেলাম না।

প্রকাশ।—আমার বক্তব্য শেষ না করতে পারলে, আমি আপনার কাছে ব্যর্থ বৈকি।

বৃদ্ধ।—কিছু মনে করবেন না, আপনি বলুন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম—দেশে দেশে অবস্থার প্রভাবে কোথাও শ্রমিকেরা জাগছে, কোথাও আবার খপ্পরে পড়ে ঝিমিয়ে পড়ছে। ঐতিহাসিক নিয়মের

প্রভাবেই এটা হচ্ছে। ঐ একই ঐতিহাসিক নিয়মে রুশিয়ায় শ্রমিকের অভ্যুত্থান ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সকাল বেলা সূর্য ওঠে, সেটা রুশীয় প্রভাবের জন্য নয়—প্রাকৃতিক নিয়মের জন্য। আমার আশ্চর্য লাগে, পলিটিক্সেও কেন আপনারা এত মূর্তিপূজা পর-লোকবাদ আর জপতত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন? শুধু রুশিয়া রুশিয়া রুশিয়া! আমার মনে হয়, এসব আপনাদের কতগুলি মুখের কথা মাত্র। আপনারাও সেটা ভালরকম জানেন। কাজের কথা চাপা দিতে গেলে আবোল-তাবোল যা বলতে হয়, তাই আপনার বলেন।

প্রকাশবাবু রুষ্ট হয়ে বললেন।—আমরা এ যুদ্ধে সেই পক্ষের জয় কামনা করি, যেপক্ষে সোভিয়েট রুশ আছে।

বৃদ্ধ।—এতক্ষণ এই ভয় করছিলাম প্রকাশবাবু। শুধু ঐ পক্ষটারই জয়লাভ করাবার জন্যই কি আগে থেকে রুশীয় জয়ের থিওরিটা তৈরী করে রেখেছিলেন?

প্রকাশ।—আপনার তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বৃদ্ধ।—রুশের জয় অর্থ বুঝি কিন্তু রুশপক্ষের জয় মানে কি মশাই? ব্রিটেন আমেরিকা ও···

প্রকাশ।—আমাদের জয়।

বৃদ্ধ।—আপনি সত্যিই জয়লাভ করছেন। আমি আর দম পাচ্ছি না। এই জয়যাত্রায় আমাদের বেচারা ভারতবর্ষ কি করবে?

প্রকাশ।—যুদ্ধে সাহায্য করবে, যেন ফাসিস্তির আশু পতন হয়।

বৃদ্ধ।—কিভাবে?

প্রকাশ।—সৈন্য দিয়ে পণ্য দিয়ে। যুদ্ধের সময় দেশের কোন শৃঙ্খলা যাতে নষ্ট না হয়, সেইদিকে পাহারা রাখতে হবে।

বৃদ্ধ।—বিনিময়ে যদি দেশের পক্ষে ব্রিটিশের কাছে বা

মিত্রশক্তির কাছে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে অথবা দাবি জানিয়ে······।

প্রকাশ।—না, কোন কণ্ডিশনের মানে হয় না। এযুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। যদি একবার ফাসিস্তির হাতে আমরা চলে যাই তাহলে উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত।

বৃদ্ধ।—আপনি বিশ্বাস করেন নিশ্চয়, জাপানী ফাসিস্তের হাত থেকে বর্মাকে মুক্ত করার পর ব্রিটিশ তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নেবে?

প্রকাশবাবু চারদিকে তাকালেন। ধৈর্যহীন দৃষ্টিগুলি চারদিক থেকে উত্তর শোনার জন্য যেন হাঁ করে আছে। ইন্দ্রনাথ যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। এত বড় একটা ঝড় চলেছে চারদিকে, সেদিকে তার কোন লক্ষ্য নেই। শুধু ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল একটু ছটফট করছিলেন—বোধ হয় কোন একটা মোক্ষম উত্তর তাঁর মুখে এসেছে। তবু প্রকাশবাবুই শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন।—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

বৃদ্ধ।—আপনার কতগুলি বিশ্বাস ও ইচ্ছের কথা শুনলাম। কাজেই প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজন নেই। এখনো কিন্তু জাগৃতি সংঘের বিষয় কিছু শুনলাম না।

প্রকাশ।—দেশের জনসাধারণের মনের অবস্থা ও মোরাল আপনার মতই—কিছু ঠাউরে উঠতে না পেরে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। নিষ্ক্রিয়রা ঝিমিয়ে পড়ছে। এটা মারাত্মক রোগের লক্ষণ। ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে তাই আমাদের একটা সচেতন প্রয়াস নিয়ে লেগে থাকতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে যে-তিমিরে সে-তিমিরেই পড়ে থাকতে না হয়।

বৃদ্ধ।—তাহলে সে ভয় আছে, বিজয়ী সোভিয়েট রুশিয়া থাকতেও তিমিরে পড়তে পারেন?

প্রকাশ।—সোভিয়েট রুশিয়া আমাদের হাতে মুক্তির লাড্ডু তুলে িতে আসবে না।

বৃদ্ধ।—বিশ্বাস করেন সেটা?

প্রকাশ।—একটা বুর্জোয়া ইমোশন, একটা অ্যান্টি-ব্রিটিশ অভিমান, কটা জাতিবাদী দৃষ্টি দিয়ে যদি সবকিছু বিচার করেন……।

বৃদ্ধ।—এক কথায় আমি হলাম—advocatus diaboli.

গুরুদয়ালবাবু সতর্ক হয়ে উঠলেন। এই প্রসঙ্গের পাগলা ঘোড়া ইবার লাগাম ছিঁড়েছে। গুরুদয়ালবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডমাস্টারের ঙ্গীতে হাত তুলে ব্যস্তভাবে বললেন।—আমি বলছিলাম……।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল বললেন।—ব্যারিস্টারী মর্জিতে সওয়াল জবাব রে কোন আদর্শের বিচার হয় না।

বৃদ্ধ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করলেন।—ব্যারিস্টার! কে ব্যারিস্টার?

গুরুদয়ালবাবু সংশয় খণ্ডন করলেন।—আমি বলছিলাম, উনি ্যারিস্টার নন, উনি ডাক্তার মুখার্জি—বি এম মুখার্জি—বনমালী খার্জি।

ডাক্তার মুখার্জি।—আমি এইখানে থামলাম। আমার আর কোন শ্ন নেই। জাগৃতি সংঘের কাজের সম্বন্ধে যদি কারও কিছু জানতে চ্ছে থাকে, তিনি প্রশ্ন করুন।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল।—মানবতার শত্রু ফাসিস্ত দস্যুদের বিরুদ্ধে শিল্পে াহিত্যে সংগীতে একটা প্রচণ্ড জনমনোভাব সৃষ্টি করতে হবে, সোজা থায় এটাই হলো জাগৃতি সংঘের উদ্দেশ্য।

গুরুদয়ালবাবু পূর্ণচ্ছেদ টানলেন।—এই তো! আমি আপনাদের জনকেই বুঝতে পেরেছি। প্রকাশবাবু রাইট এবং ডাক্তার মুখার্জিও াইট।

দুষ্পাচ্য যুদ্ধতত্ব আর পলিটিক্স গুরুদয়ালবাবুর ভাল লাগছিল না মোটেই। বছরের মধ্যে মাত্র এই একটা শুভদিনে এতগুলি অভিজাত সজ্জনকে একসঙ্গে পেয়েছেন। তিনি একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চান না। আজকের আসরটা শুধু দু'কান খাড়া করে তাঁর বৈভবের ইতিবৃত্ত শুনুক, এটাই তিনি চান। যদি সে বিষয়টাই না-বলা ও না-শোনা থেকে যায়, তাহ'লে তাঁর সারা বছরের মৃগয়ালব্ধ বিত্তের ফেস্ ভ্যালু যেন কমে যাবে।

গুরুদয়ালবাবু বললেন।—এই যুদ্ধের চোট সবচেয়ে বেশী পড়েছে আমাদের ওপর। দু'হাতে লুটছেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের দল। তাঁরাই বা কজন? হাতের আঙুলে গুণে বলে দিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা যারা বুদ্ধি আর পরিশ্রম খরচ করে দুটো উপায় করি, তাতেই সবারই চোখ কট্‌কট্ করে। হন্যে কুকুরের মত বাজারে বাজারে দৌড়তে হয় মশাই। রেট বেচা কাজ—যিনি না ভুগেছেন তিনি কিছুই বুঝবেন না। অথচ যত আইন শুধু আমাদেরই বেলায়। দশ শিশি বার্লি কিনে একটু রেট রিস্ক করেছি কি সবাই হেঁ হেঁ করে তেড়ে আসছে—মজুতদার মজুতদার। ওরে বাবা আমাদের ছেড়ে দিয়ে তাদের বল না, যারা আসল মালিয়াৎ—দশ হাজার শিশি বার্লি বাজারে ছাড়ুন না তাঁরা। ছুঁতেও যাবনা আমরা। আমরা ব্রোকার মানুষ, তোমরা মাল যোগান দিলে, আমরা আর কত রেট খেলাতে পারি। মাল নেই, তাই রেট তেড়ে উঠছে। যুদ্ধের পর এই মুদ্দফরাশী ছেড়ে দেব। একটা কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং না ধরলে আমাদের আর শান্তি নেই।

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ নির্বিকারভাবে বসেছিল। বর্তমান দৃশ্যটার সঙ্গে যেন তার কোন দেখাশোনার সূত্র নেই। কিন্তু গুরুদয়ালবাবুর বাণিজ্য-তত্ত্বের রহস্যটা তার কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিল। ইনিয়ে বিনিয়ে সবিনয়ে

ব্যাখান করে গুরুদয়ালবাবু যা বলতে চান, তার সার কথা হলো—এই যুদ্ধের বাজারে তিনি বেশ কিছু পিটেছেন, পিটছেন এবং পিটবেনও। তবু প্রসঙ্গারম্ভে যুদ্ধটাকে একবার নিন্দা করে নিলেন—যেন যুদ্ধটার গায়ে একটা আহ্লাদের চড় মেরে মনের কৃতজ্ঞতাটা ঝালিয়ে নিলেন।

ইন্দ্রনাথ—এই যুদ্ধের বাজারে তাহ'লে আপনাকে একেবারে লোকসান করিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বলুন !

গুরুদয়ালবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।—লোকসান ? এতক্ষণে তাই বুঝলেন ? লোকসান দেবে গুরুদয়াল বসু ?

ইন্দ্রনাথ একটু খোঁচা দেবার উদ্দেশ্যেই বললো।—তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, যুদ্ধটা আপনাদের পক্ষে একটা শুভলগ্ন। তারপর, একাদশে বৃহস্পতি—ইনফ্লেশন। যুদ্ধটা যদি আরও পাঁচ বছর চলে, তাহ'লে……।

গুরুদয়ালবাবু আপত্তি করলেন।—ভয়ানক ভুল করছেন মশাই। আপনারা মনে করছেন সস্তায় কাঁচা টাকা কুড়োচ্ছি আমরা ? ভুল আপনাদের। কোন ইনফ্লেশন হয়নি; নেহাৎ বুদ্ধি আছে তাই টিকে আছি, নইলে কবে ভেসে যেতাম। গোড়ার গলদ হলো, পণ্যদ্রব্যের অভাব। পণ্য অল্প, অথচ খদ্দের প্রচুর। এর ফলে দর বেড়ে যাবেই —এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এখানে আমার ও আপনার ইচ্ছে চলবে না। কালীকিংকরবাবু চুপ করে কেন ? বলুন না—সত্যি কি মিথ্যে বলছি। আপনি তো অথরিটি মশাই। তিন তিনটে ব্যাঙ্ক চালাচ্ছেন। বলুন আপনি, ইন্দ্রনাথবাবুর সন্দেহটা একটু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে……।

ইন্দ্রনাথ কালীকিংকরবাবুর দিকে তাকিয়ে অনুরোধ জানালো।—হ্যাঁ, বলুন আপনি। উনি এতক্ষণ যেভাবে জ্ঞানের গাঁট্টা মারছিলেন তাতে আমার বুদ্ধি থেঁতলে গিয়ে…

জয়ন্ত সিতার কাছাকাছি চেয়ারে বসেছিল। ইন্দ্রনাথের কথা শুনে হঠাৎ ঠোঁটের ওপর এক পাটি দাঁত চেপে বসলো—যেন একটা উদ্যত বিদ্বেষকে আড়ালে ঢাকা দিল জয়ন্ত। পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিতার অন্যমনস্ক দৃষ্টিটাকে যেন একবার সংকেতে ডাকবার চেষ্টা করলো। সিতা একবার তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। কালীকিংকরবাবু তখন বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন :

—আমার কাছে দু'রকমের উত্তর তৈরী হয়ে আছে। কোন্‌টা শুনতে চান? একটা ব্যাঙ্কওয়ালার উত্তর, আর একটা সোজা সাধারণ উত্তর—পথের লোকের মনের কথা।

ইন্দ্রনাথ।—ব্যাঙ্কওয়ালার উত্তরটা কি রকম?

কালীকিংকরবাবু—এই যুদ্ধের চোট সবচেয়ে বেশী পড়েছে ব্যাঙ্কগুলির ওপর……।

একটা হাসির সোর পড়ে গেল। গুরুদয়ালবাবু হাসলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যেন একটু মুখ ভার করে বললেন।—না না। আমাকে অপদস্থ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল না।

কালীকিংকরবাবু—গুরুদয়ালবাবু, ভুল করবেন না। আমিও যে কত বড় পদস্থ ব্যাঙ্কওয়ালা, তা আজ বাসে উঠেই টের পেলাম। শেয়ালদা আসবার ইচ্ছে ছিল, কণ্ডাক্টরকে একটা এক টাকার নোট দিতেই দরজা দেখিয়ে দিল—উতার যাও, রেজ্‌কি পয়সা করেগা হাম? যাক্ গুরুদয়ালবাবু বলছেন—পণ্যদ্রব্য কম আর খদ্দের বেশী। অতএব কি দাঁড়ালো?

ইন্দ্রনাথ।—বলুন। পথের লোকের মনের কথাটাই বলুন।

কালীকিংকরবাবু।—মশাই, যুদ্ধও করবেন অথচ একটু কষ্ট করবেন না, এ কি করে হয়? সরকার বাহাদুর যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করেন—ট্যাক্স

বসিয়ে, ঋণ নিয়ে এবং তাতেও না কুলোলে, ইনফ্লেশন করিয়ে অর্থাৎ কাগজের নোট ছাপিয়ে। সরকার তখন সবচেয়ে বড় খদ্দের হয়ে দাঁড়ান, সবসে আচ্ছা দর দেনে-ওয়ালা। এই ফাঁপা কারেন্সি প্রকারান্তরে একটি জবরদস্ত ট্যাক্স মাত্র। বাজারে সাতশো কোটি টাকার নোটের ব্যাঙাচি থৈ থৈ করছে—লোকের হাতে পয়সা আছে। কিন্তু খরিদ করতে গেলে সরকারের দরের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পণ্যলক্ষ্মীও এই দেমাকে দর চড়িয়ে তার কদর বাড়িয়ে দেন।

ইন্দ্রনাথ—তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? যুদ্ধের জন্য সরকার মাল কিনছেন, মাল একচেটে করছেন—আসলে মালের ঘাটতির কারণেই দরের ডাকাতি শুরু হয়েছে।

কালীকিংকরবাবু—কিন্তু এই ঘাটতি যে সরকারই করালেন, ইনফ্লেশন করিয়ে।

ইন্দ্রনাথ—এর মধ্যে মজুতদারদের হাত নেই কি? বেপরোয়া মাল মজুত করে মালের ঘাটতি হয়েছে—অনেকে তো এই কথা বলেন।

কালীকিংকরবাবু—ঘোড়ার আগে গাড়ি থাকে না। আগে ইনফ্লেশন তারপর মজুতদারী চোরাবাজার। স্বয়ং সরকার বাহাদুর যে সবচেয়ে বড় মজুতদারী আরম্ভ করেছেন। হরিলুটের বাতাসার মত এই যে কাগজের নোট বাজারে ছড়িয়ে পড়লো, তাতে সবারই হাতে পয়সা হয়েছে মনে করা ভুল। বে-সামরিক জীবনের সেবায় যারা কাজ করেছে, তাদের উপার্জন প্রায় সেই পুরনো দরেই বাঁধা আছে। শোনেননি কি, যে, এসেন্সিয়াল আর নন্-এসেন্সিয়াল নামে দু' শ্রেণীর জীবন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে?

ইন্দ্রনাথ—আপনার কথার শেষে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়, সবার মূলে রয়েছে ইনফ্লেশন।

ডাক্তার মুখার্জি—ইনফ্লেশনেরও মূলে যেটি রয়েছে, সেটিকে কি চিনলেন না?

ইন্দ্রনাথ—না।

ডাক্তার মুখার্জি—এই যুদ্ধটার কথা ভুলে গেলেন? যুদ্ধ না থাকলে এই সময় এত কড়া ইনফ্লেশনের দরকার হতো কি? এই যুদ্ধের বাঁশ না থাকলে, ইনফ্লেশনের বাঁশীও বাজতো না মশাই।

হঠাৎ প্রকাশবাবু এই প্রসঙ্গের স্থৈর্যকে চম্‌কে দিয়ে বলে উঠলেন।—আবার সমস্ত কথাকে টেনেটুনে সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে! ঐ একটি নন্দ ঘোষকে হাতের কাছে পেয়েছেন, সব দোষ তারই ঘাড়ে না চাপালে আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না।

প্রকাশবাবুর উষ্মায় ইন্দ্রনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। কালীকিংকরবাবু দু'হাত জোড় করে, বেশ একটু থিয়েটারী ঢঙে মিষ্টি করে বললেন।—এই অধম এযাবৎ ছত্রিশ হাজার টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছে। আরও কেনার মতলব আছে। আর যাই বলুন, যুদ্ধ-বিরোধী বলবেন না, এর চেয়ে প্রচণ্ড মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না।

প্রকাশবাবু যেন নেহাৎ অযাচিত ভাবে তাঁর অর্থনীতিজ্ঞতাকে জাহির করার জন্য বললেন।—ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্টার্লিং জমার জোরেই নোট চালু করা হয়েছে। একে ইনফ্লেশন বলে না।

কালীকিংকরবাবু লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে গেলেন।

ডাক্তার মুখার্জী একটু সন্দিগ্ধ ভাবে কালীকিংকর বাবুর এই হঠাৎ মৌনতা লক্ষ্য করলেন। যুদ্ধ নেই, ইনফ্লেশন নেই, মজুতদারী ফাটকা নেই—এমন একটা নিষ্ফল পৃথিবীকে কালীকিংকর বাবুর অন্তরতম চেতনা বোধ হয় মেনে নিতে পারে না। পেট্রিয়টের গর্ব নিয়ে, শুধু কয়েকটা

বড় বড় কথা বলার আনন্দে প্রকাশবাবুর যুদ্ধবাদকে যুক্তি দিয়ে ছিন্ন করতে পারেন তিনি, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে চান না। এক জায়গায় এসে তাঁকে থেমে যেতে হবে। প্রায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, অন্ততঃ কাজের বেলায় তিনিও যুদ্ধবাদী। 'কিন্তু কেন ? এই প্রশ্নের ভয়েই আর বোধহয় কিছু বলতে চান না কালীকিংকর বাবু। এইখানে এসে প্রসঙ্গটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান। প্রকাশবাবুকে ডোবাতে গিয়ে তিনিও ডুবে যেতে পারেন। হয়তো সেই ভয় তাঁর আছে। ব্যাঙ্কার কালীকিংকর বাবুকে একটু ঘনিষ্ঠভাবেই চেনেন ডাক্তার মুখার্জী।

প্রকাশবাবু পরিশ্রান্তের মত নির্জীব স্বরে তবু বললেন।—যুদ্ধের ভবিষ্যৎটা কি কিছুই নয় ? আমাদের অভাব আর উপোসটাকে শুধু বড় করে দেখতে হবে।

কেউ কোন উত্তর দিল না।

প্রকাশবাবু একটু প্রেরণা ছড়াবার চেষ্টা করলেন।—একবার এই অভিমান ছেড়ে দিয়ে যদি যুদ্ধের জন্য অন্য দেশের লোকের দুঃখ ও ত্যাগের দিকটা দেখতেন, তাহ'লে এই উপোসটা আপনাদের কাছে এত বড় কথা হয়ে উঠতো না।

ইন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো প্রকাশবাবুর অবস্থাটা কল্পনা করে। প্রকাশবাবু সোজাসুজি একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে চান, কিন্তু প্রসঙ্গের প্রশ্নময় স্রোতের কম্বলটা তাঁকে ভালুক হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে, ছাড়তে চায় না। প্রকাশবাবুর জ্ঞানবুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথ তাঁর আলেচনার এই পদ্ধতিটাকে ঠিক মনের মধ্যে গ্রাহ্য করে নিতে পারছিল না। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে একটা ভাল প্রসঙ্গের আলোচনাটাও শেষ দিকে কেমন একটু লাঠালাঠি গোছের হয়ে গেল।

প্রকাশবাবু শেষ দিকে একেবারে বিরক্ত হয়ে বললেন।—বর্তমানের ক্ষতিটা সত্যিই ক্ষতি, যদি ভবিষ্যতে সেটা কোন লাভ না আনতে পারে। ভারতের বর্তমান দুঃখ যদি একটা মহত্তর ভবিষ্যৎ নিয়ে আসে, তবে আজ সেটা আদৌ দুঃখক্লেশ নয়।

গুরুদয়ালবাবু যেন একটা তন্দ্রার পর জেগে উঠলেন।—খুব সত্যি কথা। আপনারা দু'জনেই রাইট্। কালীকিংকরবাবুর সঙ্গে আমি একমত—আজকের এই ইনফ্লেশনের জন্যই যত দুঃখ সইতে হচ্ছে। প্রকাশবাবুর সঙ্গেও আমাদের একমত হবে যে, যুদ্ধক্ষান্তির পর আবার একটা ডিফ্লেশনের জ্বালা সইতে হবে না—একটা মহত্তর ইয়ে আছে ভবিষ্যতে।

ডাক্তার মুখার্জী।—বর্তমান শেষ হয়ে গিয়ে ভবিষ্যৎ এসে পড়েছে, এইখানে হল্ট্ করাই ভাল।

গুরুদয়ালবাবু—বর্তমানে শুধু স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকে আপনারা সিতাকে তার জন্মদিনে আশীর্বাদ করতে এসেছেন। আমার অহংকার—সিতা আমার মেয়ে। বাপের মুখে এই স্নেহের প্রলাপ আপনারা মাপ করবেন। এ রকম মন, এ রকম প্রতিভা, শীলতা ও বুদ্ধি আমি দেখিনি।

—তুমি থামো বাবা। সিতা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল।

গুরুদয়ালবাবু—আমাকে ধমক দিয়ে স্যুট থেকে ধুতি-চাদরে নামিয়ে এনেছে সিতা। কত বললাম, ওরে এটা আমার বিলাতিয়ানা নয়, আমি একটু ইন্টারন্যাশনাল মনোভাবের মানুষ; কিন্তু কে শোনে? আপনারা আমাকে যে মিস্টার বসু ব'লে ডাকেন সেটাও ওর পছন্দ নয়। বেশ, সিতা মায়ীকি মর্জি—আমি গুরুদয়ালবাবুই হয়ে গেলাম।

অতিরিক্ত আন্তরিকতায় গুরুদয়ালবাবু ছেলেমানুষের মত বকে যাচ্ছিলেন।—লোকের উপকার না করতে পারলে যেন সিতার গায়ের জ্বর ছাড়ে না। চাকর-বেয়ারাগুলি আমার কাছে ঘেঁষবে না; জানে, দিদিমণির কাছে একবার হাত পাতলেই বাস্। এই ধরুন না, প্রকাশবাবুরা হাত পাততেই জাগৃতি সংঘে এক কথায় পাঁচশো টাকা চাঁদা ফেলে দিয়েছে।

সিতা যেন দুঃসহ লজ্জায় আর্তনাদ করে উঠলো।—কি বলছো বাবা। তোমার কথা কেউ বুঝতে পারছেন না। তুমি চুপ কর!

ইন্দ্রনাথের মুখে হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত রক্তাভার জ্বালা ছড়িয়ে পড়লো। সম্মুখের দৃশ্যটাকে ভোলবার জন্য যেন মাথাটা হেঁট করে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল। গুরুদয়ালবাবু তখনো খুশির উচ্ছ্বাসে চোখের তারা দুটি বড় করে সিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, সিতার আপত্তির অর্থটা কি?

ডাক্তার মুখার্জী অবস্থাটাকে এই সংকট থেকে মুক্তি দিলেন।—এখন একটু মিউজিক হলেই আমাদের সবারই ভাল লাগতো। সিতা মা, তুমিই যদি একটা নতুন গানটান শোনাও, তবে আমি এখন অন্য কিছু শুনতে চাই না।

গুরুদয়ালবাবু আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—হাঁ, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো ডাক্তার মুখার্জী। হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়েছে; কিছুতেই গাইবে না। অথচ গত বছরেও আপনারা শুনেছেন—এমন নাইটিংগেলের মত ভয়েস্ খাম্‌কা নষ্ট করছে।

সিতা কাঁচুমাচু হয়ে ডাক্তার মুখার্জীকে লক্ষ্য করে বললো।—কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু, সত্যিই আমি আজকাল গাইতে পারি না।

গুরুদয়ালবাবু—সেই ছেলেটিকে আসতে বলনি সিতা? তোমার

পারুলদির কি জানি হয় ছেলেটি? দেবর বোধ হয়। শুনেছি ছেলেটি বেশ গাইতে বাজাতে পারে। সে এল না কেন?

সিতা—সে এলেও গাইতো না।

গুরুদয়ালবাবু—কেন? প্রফেশনাল বোধ হয়? তা, কার্ডের সঙ্গে একটা পঞ্চাশ টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেই পারতে।

সিতা—না, তাকে কার্ড পাঠানো হয়নি।

গুরুদয়ালবাবু মুখ দিয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে দিয়ে চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে বললেন।—এইবার আপনাদের শেষবারের মত বিরক্তটা করে নেব।

তারপর হাঁক দিলেন—বয়, মেজ লাগাও।

এবারে সিতার জন্মদিনে অন্য বছরের তুলনায় অনেকগুলি ব্যতিক্রম ঘটে গেল। এবার সেই গল্প ও গানের মজলিসী উল্লাস নেই, তার বদলে দুটো তত্ত্বভরা তর্ক যেন উৎসবের রগ চটিয়ে দিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেই একটু অপ্রতিভের মত বসেছিলেন। দেখে মনে হয়, উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, ইনি একটু উদাস—আর একটু দূরে প্রকাশবাবু একেবারেই অন্যমনস্ক। ডাক্তার মুখার্জী একটু ক্লান্ত। গুরুদয়ালবাবুর হাঁক শুনে সকলের চেতনায় একটু সাড়া লাগলো—এইবার ভোজন পর্ব আরম্ভ, তারপরই সম্মেলনের সমাপ্তি। এতক্ষণে যেন সবারই চোখে পড়লো এই প্রীতি-সম্মেলনের হেতু রূপ আর মর্ম সিতার জন্মদিন—সেই সিতা চুপ করে বসে আছে। এতক্ষণ যেন সিতা ছিল না, শুধু সম্মেলনটাই ছিল।

এবারের জন্মদিনের উৎসবে অনেক ব্যতিক্রম। সিতার মনেও

তাই। সিতার হঠাৎ মনে হয়েছে, আজ এখানে যেন সে একটু বেমানান হয়ে গেছে। এই উৎসবে সেও যেন একটি অভ্যাগত।

অনেক ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। গুরুদয়ালবাবু ধুতিচাদর পরে রয়েছেন। সিতারও রূপসজ্জায় সেই হেলিয়োট্রোপ আর নেই—শেড-মানানো শাড়ি আর জাম্পারের আহ্নিক বর্ণবিবর্তন ঘুচে গেছে। কাঁধের দু'পাশে নীল লিমারিক ব্লাউজের দুটি পুষ্পিত শ্রাগ্ আজ উপড়ে ফেলে দিয়েছে সিতা। গাউন-ঢঙের যে নিভাঁজ ক্রেপের শাড়িগুলি বর্মের মত এতদিন সংক্ষেপে তার তনুরুচিকে সবার গোচরে রেখে পাহারা দিত—আজ হঠাৎ সেগুলিকে বড় বেশী নিলাজ মনে হয়েছে সিতার। তাই একটি ধানী রঙের জামদানী পরেছে সিতা। দোলন চাঁপা প্যাটার্নে একটা রূপোর বাজুবন্ধ দুলছে হাতে। চোখের চাউনিটাও যে আজ এত নিবিড়, তার কারণ শুধু তার ঘনপক্ষ্মপল্লবের ছায়া নয়-দুটো বর্ণচোরা কাজলের আয়ত রেখা লুকিয়ে আছে সেখানে। পায়ে জরির কাজ করা স্যাণ্ডেল থাকলেও সরু আলতার টান ঢাকা পড়েনি। সাদা ফুলের মালা দিয়ে বড় করে খোঁপা বাঁধা। যারা কখনো দেখেনি, তারাই একটু আশ্চর্য হয়ে দেখবে এই কানাড়া ছাঁদের কবরীবন্ধ। রিভাইভালিস্ট শিল্পীর আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে সিতাকে—একটি অতি আধুনিক রূপের ফুল পুরাতন বর্ণে ও সৌরভে ফুটে উঠেছে।

প্রকাশবাবুর দিকে লক্ষ্য রেখে গুরুদয়ালবাবু বললেন—আপনাদের সংঘটা সত্যিই ডেঞ্জারাস্। কি যে মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন—সিতা প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার এরিস্টোক্রেসি ভাঙবে। আমি বলেছি, বেশ তাই হোক্ তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ। আপনারা জনতার সেবায় নেমেছেন, সিতাকে নামিয়েছেন। আপনাদের আদর্শটা যে খুবই মহৎ সন্দেহ নেই। সমাজের সকলের সঙ্গে সুখদুঃখ সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে—খুব ভাল

আইডিয়া। সিতা বল্‌ছে—শুধু আইডিয়া নিয়ে থাকলে চলবে না, জীবনে সেটা কাজে লাগাতে হবে। দেখুন না, কেমন গাঁয়ের মেয়েটি সেজে বসে আছে। হাঁ, আমার আর একটা তুষ্কৃতি আপনাদের মাপ করতে হবে। আজ শুধু ডাল-ভাতেই আপনাদের তৃপ্ত হতে হবে। শুধু ডাল-ভাত—গরিব বাংলা দেশের ছ'কোটি লোকে যা খেয়ে বেঁচে আছে।

তুটো বয় বড় বড় তুটো বারকোশ ব'য়ে নিয়ে এল—ছোট ছোট বাটি সাজানো তার ওপর। বাটিতে ডাল। এক কিস্তি ডাল পরিবেষণের পর আর এক কিস্তি বাটি এল, এটাও ডাল। তারপর আরও। সবশুদ্ধ তের রকমের ডাল।

রূপের বোল'এ করে একরাশ ঝরা জুঁইয়ের কুঁড়ির মত ভাত এল। নিমন্ত্রিতদের পাতে পাতে মাত্র এক চামচ করে সুশ্বেত অন্ন নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে দেওয়া হলো।

গুরুদয়ালবাবু উঠে দাঁড়ালেন।—এই চালটার নাম লক্ষ্মীকাজল। নামে ও চেহারায় কত পার্থক্য দেখ্‌ছেন! যেমন আমি, গুরুও নই দয়ালও নই—স্রেফ্ ব্রোকার।

আবার এক বোল ভাত। গুরুদয়ালবাবু বয়টাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এক চামচ করে দাও। এ চালটার নাম কনকচুর।

কোথাও যেন অন্নপূর্ণার ঝাঁপি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বয়গুলি অকাতরে সেইখান থেকে একের পর এক ভাতের পসরা কুড়িয়ে আনছে। নিমন্ত্রিতদের বিস্ময়ের ওপর ডুগডুগি বাজিয়ে গুরুদয়ালবাবু যেন একটা ভেল্কি খেলতে লাগলেন—দাও, একটু চট্‌পট্ দিয়ে দাও। এটার নাম দেওয়ানপ্রসাদ, ওটার নাম ভবানীভোগ, আর এটা হচ্ছে চন্দনশালি। আচ্ছা এইবার নিয়ে এস—সোনাজিরা, সোহাগমণি আর···।

সবশুদ্ধ পনের রকম চালের ভাত। চালহীন কলকাতার কপালে চরম আভিজাতিক চালিয়াতি। খাওয়া আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরটা তর্ক ও বক্তৃতার কবল থেকে যেন ছাড়া পেল, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিমন্ত্রিতদের ঘরোয়া আলাপের কলোচ্ছ্বাসে ভরে উঠলো। ইন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে বললো—বড় অস্বস্তি বোধ করছি প্রকাশবাবু।

প্রকাশবাবু—কেন? কি হলো তোমার?

—একটা প্রহসন দেখছি।

—ওসব হামবাগ্‌দের কথায় কান দিও না।

—কাদের কথা বলছেন?

—ঐসব ব্যাঙ্কার আর শতং মারী ডাক্তারদের!

—আমি তাঁদের কথা বলছি না; গুরুদয়ালবাবুর বড়মানুষী ভাঁড়ামি আর সহ্য হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচি।

—ওঁর কথা ছেড়ে দাও। ওঁরা হলেন সাদাসিধে মনখোলা মানুষ। ওঁদের একবার বুঝিয়ে দিতে পারলে ঠিক বোঝেন। কারণ ওঁদের মধ্যে বুদ্ধির কোরাপ্‌শান্ নেই। কিন্তু ঐ যে দুটি ঝানু কুতার্কিক এতক্ষণ পলিটিক্‌স্ আর ইকনমিক্‌স্ নিয়ে পণ্ডিতি করলেন, ওঁরাই হলেন সাংঘাতিক জীব। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক তবু একটু পদের আছেন কিন্তু ঐ ডাক্তারটা…।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল সিতাকে বলছিলেন—বড় বড় কাজে হাত দিলে বাধাটাও বড় হয়েই আসে। লোকের বুঝতে দেরি হয়, বুঝতে ভুলও করে। ডাক্তার মুখার্জিও অবশ্য একদিন তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। আমরা শুধু কাজ করে যাব; নিন্দে শুনে মুসড়ে যাবে, জাগৃতি সংঘ সে ধাতুতে তৈরী নয়।

সিতা—জাগৃতি সংঘের নিন্দে কারা করলেন ?

উর্মিলা।—এতক্ষণ শুনলেন না ? ডাক্তার মুখার্জি আর কালীকিংকর-বাবু কী ভয়ানক ভাবে, কতগুলি কুযুক্তি দিয়ে, অল্পবিত্তের ভয়ঙ্করী কেরামতি দেখিয়ে···।

সিতা।—আপনাকে আর একটু ডাল দিক্ ? মুগের ডাল ?

উর্মিলা।—না, আর চাই না।

গুরুদয়ালবাবুর সুউচ্চ আনন্দোদ্গার শোনা গেল।—বড় আনন্দ। বড় আনন্দ। বছরে মাত্র একটি দিন। আপনাদের মত এতগুলি সজ্জনকে আবার যে কবে এক সঙ্গে পাব! বহুদিন অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি, নইলে আজ একবার বেহালাটা নিয়ে বসতাম।

ডাক্তার মুখার্জি মুখ নীচু করে খেতে খেতেই বললেন।—হাঁ, যখন রোম নগরী পুড়ছে তখন··· ।

গুরুদয়ালবাবু।—রোমের বুঝি হয়ে এল ? অ্যালায়েড আর্মিকে আর ঠেকাতে পারছে না। আগেই বুঝেছিলাম পারবে না।

দারোয়ানটা হল্লা সুরু করেছে। ফটকের কাছে একটা ঠুলিপরা আলো খানিকটা ঘেয়ো অন্ধকার ছড়িয়ে রেখেছে। আশেপাশে কয়েকটা ঝাউ চোরের মত চুপ করে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। আর দেখা যায়, ফটকের গরাদ। গরাদের ওপারে যেন একটা থিয়েটারের ছেঁড়া সীন অল্প অল্প দুলছে। দারোয়ানের ধমকের হুংকারে সেই সীন একবার থর থর করে কেঁপে আবার আগের মত দুলতে লাগলো।

হাঁড়ি আর সরা হাতে একটা নোংরা ক্ষুধার্তের জনতা ফটকের গরাদের

পর হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। উৎসবের আসর থেকে সেই মানুষগুলির মুখ আর চোখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও চিনতে পারা যায়। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, ফটকের ওপারে যেন প্রাচীন গুম্ফার কটা ভগ্নাংশ এসে লেগে রয়েছে। ভাঙাচোরা সব মূর্তি—নাক, চোখ, াত-পা সবই কেমন ভাঙা ভাঙা। আজকের জন্মোৎসবের সজীব প্রসন্নতার ধ্যে ওদের খুবই অবাস্তব ও অবান্তর মনে হয়।

হল্লা বেড়ে চললো। নিমন্ত্রিতদের কলালাপ ততই মৃদুতর ও মন্দতর য়ে আসতে লাগলো। প্রত্যেকেই এক একবার ফটকের দিকে একটু ন্যমনস্কভাবে আলগোছে ভীতভাবে তাকাচ্ছিলেন। এই জন্মোৎসব াটকের উপসংহারে যখন তৃপ্তোদর নিমন্ত্রিতদের একটু রোমন্থনের পালা, ঠক সেই সময় অভাবিতভাবে একটা শত্রুবাহিনী যেন দুর্গতোরণে হানা য়েছে। অভ্যাগতদের উদ্বেগ আর অস্বস্তি তাঁদের মুখের চেহারায় াবিষ্কার করা যায়—কারণ, এই ফটক দিয়েই সবাইকে এখন বাইরে যেতে বে, গাড়িগুলি সব বাইরেই আছে।

তবু ভরসা, দারোয়ানটা হুংকার দিচ্ছে। অতিথিদের মুখগুলি নীরব াকলেও, আন্তরিক একটা ইচ্ছা ভেতরে ভেতরে সরব হয়ে উঠছিল। কটা হুংকার আর সামান্য একটা লাঠির খোঁচা দিয়েই দারোয়ান হাঁপিয়ে ড়ছে কেন? এই মারাত্মক আবির্ভাবকে কি ওভাবে হঠাতে পারা য়? দারোয়ানের লাঠিটার মানবতাবোধ একটু বেশী প্রখর। যদি াকটা এখন ভালয় ভালয় হঠাৎ সাহসী হয়ে একচোট লাঠি চালাতে ারে—তবেই উদ্ধারের পথটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কাল্চার আর ভদ্রতার বোঁচকা নিয়ে যে যার সুবিধা মত গা বাঁচিয়ে তাহলে সরে পড়তে পারেন।

মনে মনে মুষড়ে পড়ছিলেন সবাই। দারোয়ানটা শুধু মুখের গর্জনে

তাড়া দিয়ে কর্তব্য সেরে দিচ্ছে। কিন্তু ফল হচ্ছে না কিছু। কিছুক্ষণ আগেই দু'দুটো বেয়াড়া রাজনীতি আর অর্থনীতির প্রশ্ন এই সম্মেলনের মেজাজ তিরিক্ষি করে দিয়েছিল। তার ওপর যদি সভাভঙ্গের এই প্রাক্কালে আর একটা ভব্যতাহীন প্রশ্ন কেউ পেড়ে বসে, কেউ যদি বেফাঁস বলে ফেলে—ওদের ওপর আমাদের একটা কর্তব্য আছে, তা'হলে তর্কের হালে আর পানি পাওয়া যাবে না। হয়তো কাজের কথা এসে পড়বে। হয়তো এখনি ক'রে দেখাতে হবে। মুলতুবী করে রাখার উপায় থাকবে না। সব তাত্ত্বিকতা, সামাজিকতা ও ভদ্রয়ানার ওপর নোটিশ না দিয়েই সমস্যাটা যেন একটা পরোয়ানা হাতে তুলে ফটকের ওপারে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সময় পেলে কাল সকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা বিবৃতি পাঠিয়ে এই সমস্যার একটা সমাধানের পথ সহজে দেখিয়ে দিতে পারা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ফাঁদে পড়া শেয়ালের মত করুণভাবে সবাই ফটকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতগুলি ভদ্র মনস্বী ও মনস্বিনীর হৃদয় যেন পরস্পরের স্পন্দনটুকু টের পাচ্ছিল। যেন একসূত্রে হঠাৎ তারা গেঁথে গেছেন। মতান্তর ও তর্কের উপদ্রবে এতক্ষণ যারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ মনে মনে তারা এখন একই ফ্রণ্টে মিলে গেছে—একটি কথার অনুরোধও খরচ করতে হয়নি। সবাই আজকের উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে এই উদর তৃপ্তির উদ্‌গারটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সরে পড়তে চায়।

দারোয়ানটা একটা চৌবাচ্চা থেকে এক বাল্‌তি ময়লা জল নিয়ে উচ্ছিষ্ট-গৃধ্নু জনতার ওপর ছিটিয়ে দিল। নিমন্ত্রিত সজ্জনেরা আড়চোখে তাকিয়ে সে-দৃশ্য দেখছিলেন। কালীকিংকরবাবু একবার পকেট ঘড়িটা বের করে সময় দেখলেন।

দারোয়ানটা উচ্চস্বরে কদর্য খিস্তিভরা ভাষা ও ততোধিক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে জনতার ওপর যেন কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে লাগলো। সজ্জনেরা বসে বসে সবই শুনলেন আর দেখলেন। ডাক্তার মুখার্জি হাতছড়িটা হাতে তুলে নিয়ে পা দোলাতে লাগলেন।

দুম্ দাম্ শব্দ ফাটতে সুরু করলো। সজ্জনেরা দেখলেন—দারোয়ানটা বেপরোয়া চড় চাপড় চালাচ্ছে। সবাই যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলেন। প্রকাশবাবু খদ্দরের চাদরটা একটু গুছিয়ে নিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলালের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

দারোয়ানটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু জনতা যেন শত নখর দিয়ে ফটকের গরাদ আঁকড়ে ধরে আছে। মরণ পণ করে, উত্তীক্ষ্ণ প্রতিজ্ঞার কণ্টকবর্ম প'রে একটা ক্ষুধার্ত শজারুর পাল হানা দিয়েছে। কোন ভীতি বা শাস্তি আজ ওদের আক্রমণ ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

গুরুদয়ালবাবু অলসভাবে আসরের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তার পরেই যেন একটি ভদ্রোচিত ভণ্ডামির, একটি পরিপাটি চম্পটের পথ অবিষ্কার করলেন।—আমার ড্রইং-রুমে নতুন একটি জিনিস রয়েছে, সম্প্রতি এসেছে, সেটি আপনাদের দেখাতে পারলে খুশী হতাম।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল উৎসাহিত ভাবে সাড়া দিলেন।—নিশ্চয় দেখবো আমরা।

গুরুদয়ালবাবু সকলকেই উদ্দেশ্য করে বললেন—সম্প্রতি একখানি তিব্বতী পেন্টিং কিনেছি।

নিমন্ত্রিতেরা উঠলেন। গুরুদয়ালবাবু পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অল্প কিছুদূর হাঁটার পর একটা পাতাবাহারের কেয়ারি পার হয়ে খিড়কির দরজার কাছে পৌছলেন। নিমন্ত্রিত সজ্জনতা তুড়্ তুড়্ করে পেছনে

পেছনে এসে পৌঁছলো। একটা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কতগুলি ভীরুচিত্ত প্রাণ চোরাপথে পালিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর দৃশ্য! এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা। বাংলা দেশের একটা খাঁটি আত্মার সমাবেশ—ক্যাপিটালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, কম্যুনিস্ট—শত্রু দলের চোখ এড়িয়ে কেমন গুটিসুটি হেঁটে চলেছে, কত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে সবাই।

খিড়কি দিয়ে ঢুকে একটা বড় চত্বরের মত জায়গায় সবাই কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। গুরুদয়ালবাবু সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। আবার এগিয়ে চললেন সবাই। চাকরদের ঘরগুলি পাশে পড়ে রইল। রান্নাঘরের সুমুখ দিয়ে লম্বা করিডর ধরে খাবার ঘরের কাছে পৌঁছতে কয়েকটি মিনিট লাগলো মাত্র। গুরুদয়ালবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অতিথির দল বাঁ দিকের বারান্দার দিকে চললেন। তার পরেই একটা হল আর তার উত্তর দিকে হলো ড্রইংরুম। ড্রইংরুমে পৌঁছে মুক্তির শ্বাস ছাড়তে পারা যায়। এর পরেই মাত্র কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ, গাড়ী বারান্দা। তার পরেই লতাবিতানে সাজানো সদর ফটকটা—সাধুর আশ্রমদ্বারের মত নীরব নির্জন উদার ও প্রশস্ত। তিব্বতী পেন্টিং চক্ষের পলকে দেখে নিয়ে এক একটি গুড-নাইট সম্ভাষণ ব্যস্তভাবে পথে নেমে পড়লো। কেউ হেঁটে ট্রামপথের দিকে, কেউ বাগানের ফটকের দিকে গাড়ি আনতে ছুটলেন।

আসর ভাঙলো। ড্রইংরুমে একটি সোফার ওপর অবসন্নভাবে বসেছিলেন গুরুদয়ালবাবু। সিতা চুপ করে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশে জয়ন্ত মজুমদার।

জন্মোৎসবের প্রীতির আসরটা ভাঙবার আগে আর একটা চরম ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সিতাকে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানাতে সত্যই সকলে ভুলে গেছে। নিমন্ত্রিতেরা যেন এতক্ষণ একটা বন্দীদশায়

ছটফট করছিলেন, মুক্তির পথ পাওয়া মাত্র ছুটে পালিয়ে গেলেন সবাই।

জয়ন্ত মৃদুস্বরে বললো।—আজ তোমার শুভ জন্মদিনে তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ ছিল সিতা।

সিতা।—আজ আর কিছু বলো না জয়ন্ত। আমি বোধ হয় উত্তর দিতে পারবো না।

জয়ন্ত।—তুমি যদি কিছু না মনে কর. তবে তোমার বাবাকে বলতে পারি।

সিতা।—ভুল করছো জয়ন্ত। আজ আর তুমি আমার দুঃখের বোঝা বাড়িও না।

জয়ন্ত।—দুঃখের বোঝা?

সিতা।—তোমার চোখ নেই।

জয়ন্ত।—আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।

সিতা।—আজ সিতা বসুর জন্মোৎসব না মরণোৎসব? আজকের উৎসবে বাবা পন্টিয়াক কিনেছেন, ইনফ্লেশন হয়েছে, জনযুদ্ধ বেধে গেছে, পনের রকম ভাত আর ডালের সৎকার হয়েছে, শুধু সিতা বসুই বাদ গেছে। সিতা বসু একটা আশীর্বাদও পায়নি আজ। আজকের উৎসবে অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু মানুষ কেউ আসেনি। নইলে, সিতা বসু একটা আশীর্বাদ পেত নিশ্চয়। যদি একটিও মানুষ থাকতো তবে ··।

জয়ন্ত।—কিন্তু আমার অপরাধ নিও না সিতা। আমি সে'দলে নই।

সিতা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ রুষ্ট ও স্পষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো।—হ্যাঁ তোমারও অপরাধ আছে।

জয়ন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো।—আমার অপরাধ?

সিতা।—বাবা যখন শিশিরের নামে যাচ্ছেতাই বলছিলেন, তখন তুমি তো একটি কথাও উচ্চারণ করে প্রতিবাদ করলে না।

জয়ন্ত।—আমি তাঁর একটা ধারণার প্রতিবাদ করতে যাব কেন?

সিতা।—বুঝেছি, সায়লেণ্ট ওয়ার্কার তা করতে পারে না।

জয়ন্তর মনটা বোধ হয় খুবই শক্ত ও সহনশীল ধাতুতে গড়া, সিতার কথার আঘাতে অমনি ভেঙে পড়বার মত নয়। অনুচারী ছায়ার ম জয়ন্ত সিতার ভালবাসাকে যেন ধাওয়া করে ফিরছে। ছায়া, তাই তাকে সরানো এত কঠিন। আঘাতে অপমানে কোন ফল হয় না। জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সিতা।—তোমার গাড়িটা এবার নিয়ে এস জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—কোথাও যেতে চাইছ?

সিতা।—হ্যাঁ।

জয়ন্ত।—কোথায়?

সিতা।—বালিগঞ্জ প্লেস।

শিশিরের বাসার সামনে একটা মোটরকার নিশীথ-মাতালের মত যেন চুপি চুপি টলতে টলতে এসে থামলো। সিতা নেমে পড়লো। রাত্রি দশটা।

জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো।—আবার কখন্ গাড়ি নিয়ে আসবো তোমার জন্য?

সিতা।—এস, কিছুক্ষণ পরে।

জয়ন্ত।—যদি একেবারে ভোরেই নিয়ে আসি, তাহ'লে তোমার আপত্তি আছে কি?

—জয়ন্ত! সিতার মুখের সাবধানবাণী রাত্রির স্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে যেন সশব্দে জ্বলে উঠলো। জয়ন্ত ছায়া, কিন্তু তার দাঁতগুলি বোধ হয় লোহার তৈরি। নইলে এই কঠিন নির্লজ্জ অভিযোগ কিকরে তার মুখ থেকে ভাষা ধরে বের হয়ে আসে?

স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে, এই যে তুচ্ছ লঘু মূর্খ একটি সুবাধ্য দাস্যমূর্তির ছায়া, ওর হৃৎপিণ্ডে এতখানি দুঃসাহসের শোণিত এল কোথা থেকে? পথ থেকে সরে যাক্ এই ছায়া—চিরকালের মত। সিতার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের গায়ে যেন পোষা কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। একটা ক্ষমাহীন প্রতিশোধ স্পৃহা চক্‌চক্ করছিল সিতার চোখে।

সিতা বললো।—হ্যাঁ একেবারে ভোরেই গাড়ি নিয়ে এস।

সেকেণ্ড গীয়ারে একটা আচম্‌কা লাফ দিয়ে জয়ন্তর গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে সরে গেল। রুস্তমজী স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ঘুরে গেল বাঁদিকে। ইঞ্জিনের কাতরানি আর শোনা গেল না।

বিপিনের কাজ সারা হয়ে গেছে। বিপিন বাইরে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই।

কেনিং থেকে কোন দল পৌছলো কিনা, অন্নহারাদের এক একটি আড্ডায় গিয়ে বিপিন প্রশ্ন করে বেড়ায়। শুধু রাত্রির অন্ধকারে নয়, দিনের বেলার আলোতেও বিপিনের চোখে একটা ধাঁধা লেগে থাকে। একটু দূর থেকে যেকোন সসন্তান মেয়েকে দেখা মাত্র প্রথমে চম্‌কে ওঠে, তারপর শিউরে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিপিন! টুনা আর টুনার মা বলেই মনে হয়। পরক্ষণে বিভ্রম ঘুচে যায়, অন্যদিকে আর একটি আড্ডার দিকে বুকভরা কৌতূহলের বেদনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। আবার থমকে দাঁড়াতে হয়।

রাত্রির অন্ধকার। এখানে এক জায়গায় ঘাস আর ধূলোর ওপর একটা ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা দিয়ে কোন মা ও ছেলে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিপিন আস্তে আস্তে একটা দেশলাই জ্বালে ঘুমন্ত মা-ছেলের মুখ দুটো ঢাকা থাকায় দেখা যায় না, শুধু মা-গোছের জীবটির পায়ের পাতা দুটো বার হয়ে আছে। পাকা চোরের মত চুপি চুপি সেইখানেই তাক্ বুঝে বসে পড়ে বিপিন; কাঁচা চোরের মত বুকের ভেতর একটা শ্বাসবায়ুর গোলক ঢিপ ঢিপ করে আছাড় খেতে থাকে—ভয়ে আগ্রহে লোভে ও সংশয়ে। আবার দেশলাই জ্বালে। কাঁথা-ঢাকা ছেলেটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যতখানি ঠাহর করা যায়, প্রায় টুনার সমানই মনে হয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি মিলে যায়, ঐ এক জোড়া অল্পগৌর পায়ের পাতা, শুধু চুটকি জোড়া নেই, টুনার মায়ের আছে। দেশলাইয়ের কাঠি পুড়ে শেষ হয়ে যায়; বিপিন মাথায় হাত দিয়ে ধুঁকতে থাকে।

হঠাৎ ঘুমন্ত স্ত্রীলোকটির নিশ্বাসের শব্দ একবার জোরে নাক ডেকে শেষ হয়ে যায়—ধড়ফড় করে উঠে বসে।—এত রাত্রে আবার মরতে এলে কেন?

স্ত্রীলোকটি রুক্ষ স্বরে একটা ঝামটা দিয়ে উঠে বসলো, হাই তুলে গা-মোড়া দিতে লাগলো। বিপিন যেন তার নিজের অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। নিস্পন্দ মূর্তির মত বসে থাকে বিপিন। স্ত্রীলোকটি আবার বলে।—ফটিক আসে নাই?

বিপিনের নিরুত্তর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—ওমা, কে গো ওখানে? কথা বলে না যে গো!

বিপিন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল।—তোর যম।

শিশির যে কিছু ফল কিনে নিয়ে যাবার জন্য বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, সেকথা একেবারে ভুলে গেছে বিপিন। রাত হয়ে গেল, সব

দোকান বন্ধ হয়ে গেল—সেদিকেও কোন হুঁস ছিল না বিপিনের। রেল লাইনটা পার হয়ে একবার কস্‌বার দিকটা দেখে আসবে কিনা, বিপিন তখন শুধু তাই ভাবছিল। পথের গ্যাসের আলোগুলি একে একে নিভে যায়, বিপিনের মনের ভেতর তার ভাবনার জোরটাও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে। এই অন্বেষণের যেন শেষ হবে না কোনদিন। টুনা আর টুনার মায়ের অভিযানও বোধ হয় ক্ষান্ত হবে না। তারা শুধু চিরকাল আসতেই থাকবে।

একটু এগিয়ে গিয়ে আবার মন্থর হয়ে এল বিপিন। গামছাটা মাথার ওপর টেনে, কান ঢাকা দিয়ে ক্লান্তভাবে সেইখানে বসে পড়লো। একটা বিড়ি ধরালো, মনের অস্বস্তিটাকে একটু চাপা দেবার জন্যই বোধ হয়।

চারদিকের দৃশ্যটার দিকে চোখ পড়তেই বিপিনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো। নরকের একটা রাত চুপিসাড়ে যেন এইখানে এসে ঢুকে পড়েছে। একটা প্রকাণ্ড পাপাত্মার ছাউনি ঘুমোচ্ছে। জাত নেই, ধর্ম নেই, স্বামিপুত্রের মায়া নেই—শুধু পেট-চাঁড়ালের পূজো। শুধু দুটো খেয়ে বাঁচবার জন্য ঘর ছেড়ে এই নরকে এসে সবাই ঢুকছে। মরার পর নাকি সবাইকে একটা নরক ভুগতে হয়; সে-নরক কি এর চেয়ে দেখতে খারাপ ?

—টুনার মা'ও এই পথেই পা বাড়িয়েছে। কিচ্ছু বুঝলো না মাগী। এখনো মনের সাধে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে দেই দেই করে আসছে। এখনো কিছু বুঝছে না।

—কিন্তু তাকে আট্‌কাবে কে ? সে আসবেই। অন্ধকারে গাছতলায় এক কোণে শুয়ে শুয়ে এই নরকরাত্রির আস্বাদ নেবে। তারপর ? তারপর তাকে আর ঘরে ডেকেই বা লাভ কি ?

ভাবতে ভাবতে বিড়ি নিভে গেল বিপিনের। একটা বন্য আক্রোশ

হাতের পেশীগুলিতে দপ্ দপ্ করতে লাগলো। মাত্লার খালে কি একটা কুমিরও নেই? হিড় হিড় করে মাগীকে টেনে নিয়ে গিয়ে ইহজন্মের মত গুম করে দিতে পারে না? আর টুনা? এত লোক আসছে, টুনাকে কি কেউ পথ থেকে কোলে তুলে নিয়ে আসবে না? বিপিন বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলে—শালার ভগবানের যদি কোন বিচার থাকতো, এভাবে একটা সুরাহা নিশ্চয় হয়ে যেত। কিন্তু তাতো হবার নয়।

সামনে লক্ষ্মী বস্ত্রালয় বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দোকানের ভেতর থেকে ঘড়ির শব্দ আসছে, টুং টাং করে এগারোটা বাজলো। একটা ঘরমুখো ট্রাম উর্ধ্বশ্বাসে বালিগঞ্জ ডিপোর দিকে ছুটির আনন্দে দৌড়ে চলেছে—ট্রামের টালিটা থেকে থেকে নীল আলোকের ঝিলিক ছাড়ছে।

বাবুর জন্য ফল কেনা হয়নি। বিপিন হতাশ হয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। আর ভুল শোধরাবার উপায় নেই, সারা শহরটা নিঝুম হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি খুব পছন্দ হয়েছে শিশিরের। আজ সারা দিন ধরে এই কবিতাটির ওপর একটা কঠিন সুরের পরীক্ষা গেছে। শুধু স্বরলিপিটা লিখে শেষ করতেই পঞ্চাশ পাতার ওপর লেগেছে। লিখতে লিখতে রাত হয়ে গেছে। শেষ হলো এতক্ষণে।

সমস্ত কবিতাটিকে পংক্তি হিসাবে দশটা অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছে শিশির। এক একটি অধ্যায়ের শেষে দোহার দেবার মত কতকগুলি উপজ নিজেই রচনা করে নিয়েছে। ধ্রুপদের রাগে, ধামার তালে, একটা বাবুয়ালি লোভের সুগম্ভীর ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে সরব হয়ে ওঠে। হঠাৎ

দুই বিঘা জমির হৃৎপিণ্ড নখ দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে সেই যড়যন্ত্রের সুর উল্লাসে দুলতে থাকে।

মাটীর আত্মা বিদ্রোহ করে,—'দুই বিঘা জমি নয় দুই বিঘা সোনা। প্রাণ গেলেও কেউ ছেড় না। হোক বিঘে দুই ভুঁই—তাকে ছাড়তে নেই। দুই বিঘে ধূলি ধূলি নয় সে'যে জীবনের রেণুকায়া। তাকে ছাড়তে নেই। তোমার ধানের ঘর—তোমারই মানের ঘর। যৌবনে বাসর—সংসারে দোসর। বাবুদের খাতায়, ঋণ লেখা থাক্ পাতায় পাতায়। ভয় কি তাতে? জমির মান রইবে মাথায়—চাষী ভাইয়ের লাঠি হাতে।'—ধীর মূর্ছনা ভরা তান আর দুন চৌদুনে লয় বদলফের ক'রে উপজগুলিকে সুরে সেধে রেখেছে শিশির।

মহাজনের গাথা যে সুরের পথে শত বছর ধরে জনতার হৃদয়ে নতুন বাণী পৌঁছে দিয়ে এসেছে, সেই তৈরী পথেই তার চারণ-ব্রতের আরম্ভ। শিশির বিশ্বাস করে, সারা দেশের মন জুড়ে একটা সুরের মানুষ কান পেতে বসে আছে। হঠাৎ একটা সিমফনির ঝড় তুলে তার কাছে পৌঁছনো যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে এই অভিনবত্ব নিছক একটা আক্রমণ মাত্র, আবির্ভাব নয়। কিন্তু ঐ সপ্তম সিম্‌ফনির লক্ষ ক্লান্ত আত্মার পদধ্বনির করুণতাটুকু একটি ভজনের মধ্যে সুরের অন্তরায় ছড়িয়ে দিতে পারা যায়; সারা দেশের লোক শুনবে বুঝবে মুগ্ধ হয়ে যাবে—সেইখানে শিল্প সত্য হয়ে ওঠে।

মনের মত একটা কাজ এতদিন পরে আবিষ্কার করেছে শিশির। জীবিকার জন্য যেটুকু তাকে কাজ করতে হয়, সেটা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ঠিক মাসের দশ তারিখে বাড়ি থেকে দেওয়ান মশাইয়ের মনিঅর্ডার যদি না পৌঁছয়, তবে একটা পোস্টকার্ড লিখতে হয়—স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। আর কোন কাজ নেই। কাজের চিন্তা নেই।

সিতা এসে এতদিন চিন্তার একটা দিক দখল করে বসেছিল। সে বালাই মিটে গেছে। শিশিরের মনে হয়েছে, কাজের মধ্যে না থাকলে তার মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে যাবে, সিতার মত সাধারণ একটি মেয়ের মুখের একটা ধিক্কারে তার ভালবাসার মর্যাদা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। কাজই হলো জীবনের চক্ষু। নিছক সুর শিল্প সাহিত্যেরই বা মূল্য কতটুকু, যদি তা কাজের রূপে ফুটে উঠতে না পারে। বনবাসীর নিস্পৃহা, বোবার আহ্লাদ আর গুলিখোরের চাঁদের ঘুড়ির মতই সেসব অর্থহীন ও অবাস্তব।

প্রথমে একটা প্ল্যান মাথায় এসেছিল, একটা সভা আহ্বান করবে শিশির—'অনশনে মৃত দেশের অখ্যাত লোক-শিল্পীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি' দেবার জন্য শহরের যত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করা হবে। একটি মর্মর মনুমেণ্ট রচনার জন্য চাঁদা তোলা হবে। কোন পার্কে একটুকরো জমি আদায় করতে হবে। সেইখানে মনুমেণ্টের গায়ে উনিশশো তেতাল্লিশের বংলার চরম শোকের বেদনা শিলাশাসনে উৎকীর্ণ থাকবে। প্রতি বছর শিল্পীরা আসবে পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে তর্পণ করতে।

প্রস্তাবে বাধা দিয়েছেন অবনীবাবু। অবনীবাবু বলেছেন,—ভুল করলেন শিশিরবাবু। কর্তব্যকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার এই ধরণের আলংকারিক উপায় আরও বহু আছে! এতে কোন লাভ হবে না মনে হয়।

শিশির।—আপনি বলছেন, এই ধরণের শোকসভা আহ্বান করার অর্থ কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া? এটা কি কোন কর্তব্য নয়?

অবনীবাবু হেসে উত্তর দিলেন।—না, তা বলছি না। কিছু না-করার চেয়ে তবু এটা অনেক ভাল। তবে আপনার ঐ সভায় আমি কিন্তু একটা সংশোধন প্রস্তাব তুলবো।

শিশির।—এতে আবার সংশোধন প্রস্তাব কেন?

অবনীবাবু।—'অনশনে মৃত' কথাটির বদলে 'অনশনে নিহত' কথাটি বসিয়ে দিতে হবে।

শিশির চুপ করে রইল।

অবনীবাবু।—তার চেয়ে ওপথে না যাওয়াই ভাল। যদি নেহাৎই কোন সভা আহ্বান করতে হয়, তবে কোন গাঁয়ে গিয়ে করবেন। হরু ডোমের গাঁয়েতেই প্রথম সভা আহ্বান করলে ভাল হয়। শহুরে শিল্পীদের সেখানে নিমন্ত্রণ করুন। যাচিয়ে দেখুন, শহুরে শিল্পীদের জাতীয়তার ময়ূরপুচ্ছ আর কম্যুনিজমের সিংহচর্মের রহস্য ধরা পড়ে কিনা। আমার বিশ্বাস সেখানে এঁদের একজনকেও উপস্থিত দেখতে পাবেন না। সুতরাং……।

শিশির যেন হঠাৎ চিনতে পারলো অবনীকে।—বুঝলাম অবনীবাবু।

এবার থেকে মাসের মধ্যে অন্ততঃ পনরটা দিন তাই শিশির বাইরে বার হবে। এ মাসে যাবে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে, আসছে মাসে কাঁথি, তার পরের মাসে কাটোয়ার দিকে। গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে ফিরবে শিশির, জনতার সাড়া যাচাই করবে। যদি কেউ তাকে না বোঝে, তবে বুঝতে হবে তার ভুল হচ্ছে কোথাও। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে।

শিশির ডাকলো।—বিপিন এসেছ?

বিপিনের সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু দরজার পর্দাটা নড়ে উঠলো। শেডঘেরা আলোটার দ্যুতি শুধু টেবিলের খাতাপত্রের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে। দরজাটা পর্যন্ত তার একটা ফিকে আবছায়া পৌঁছেছে। সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে মূর্তি, শিশির তাকে চিনতে পারলো না। একটা বিস্ময়ের আবেশে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে শিশির বললো।—কে? কুন্তলা? মীরা? জ্যোৎস্না?

সিতা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।—ধরা পড়ে যাচ্ছ শিশির। না, তারা কেউ নয়, আমি।

শিশির।—একি, তুমি ?

সিতা।—হাঁ, আজ আমার জন্মদিন। আজ আমায় কেউ আশীর্বাদ করেনি, তাই তোমার কাছে এলাম শিশির। আশীর্বাদ বা অভিশাপ, যা দেবার হয় তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। তাই নিয়ে আমি এখনি চলে যাই।

সিতার চোখের পাতাগুলি ভিজে ভারী হয়ে এল। হঠাৎ অভাবিতভাবে, শিশিরের কাজের পথে যাত্রাসুরুর রৌদ্রময় লগ্নে এক কাজরী মায়ার মত সিতা যেন আবার দেখা দিয়েছে। হিসেব ভুল করিয়ে দেবার মত এত বড় ছলনা বুঝি আর কিছু নেই।

শিশির বললো।—তুমি শান্ত হয়ে আগে বসো।

সিতা।—আজ আমায় আশীর্বাদ করতেও তোমায় দ্বিধা করতে হচ্ছে; তোমার কাছে এতটা অবহেলা পাওয়ার মত কোন অপরাধ করেছি কি ?

আর একটু হলে বোধ হয় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো সিতা। তবু শিশিরের অনুরোধটাই আগে রাখলো। একটা চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসলো।

শিশির।—তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারবো না, এতটা কৃপণ আমি নই।

সিতা।—তবু এখনও তুমি দাতা হতে পারলে না। এখনো শুধু দানের ব্যাখ্যা করছো।

শিশির।—হাঁ, আশীর্বাদ করি……।

সিতা।—কি আশীর্বাদ করলে ?

শিশির।—তোমার ভাল হোক্।

সিতা।—এ আশীর্বাদ তো বিপিনকেও করা যায়।

শিশির।—পৃথিবীর সব কিছু কি তুমি বিশেষভাবে পেতে চাও? আর কত চাই তোমাদের?

সিতা।—তুমি আমার ওপর রাগ করছো শিশির। বিশেষভাবে আমার আজ এই লাভ হলো; এর আগে কখনো তোমার কাছে এই জিনিসটি পাইনি।

শিশির।—বিপিন যা পেয়ে খুশী, তুমি সেটা পেলে খুশী হবে কেন?

সিতা।—বিপিন তোমার চাকর, আমিও কি তাই?

শিশির।—বিপিনকে যখন আশীর্ব্বাদ করি, তখন অন্ততঃ সেই মুহূর্তে আমার কাছে চাকর নয়। সে তখন আমার প্রিয়জন।

সিতা।—বল, তোমার যা ইচ্ছে বল।

সিতা রুমালে মুখ চাপা দিল। কাঁদছিল সিতা। এক পলাতক মধুপতঙ্গ যেন তার ভাঙা চাকের কাছে ফিরে এসে দুঃখের গুঞ্জন তুলেছে। তার কান্না দেখে সেই রকম মনে হয়। সিতার মত গরবিনী মেয়ের এই অবলুণ্ঠিত অভিমান শিশিরের কাছে যেন একটা সফল প্রতিশোধের তৃপ্তি এনে দিচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই শিশিরের মনের ভেতর এক উজ্জাগর প্রহরী শত সতর্কতা সত্ত্বেও সম্মুখের দৃশ্যটার করুণতার ছোঁয়াচ লেগে ক্রমেই বিবশ হয়ে পড়ছিল।

—তুমি একটু চুপ কর সিতা।

শিশিরের অনুরোধে সমবেদনার আভাস ছিল। সিতা চুপ করে গেল, কিন্তু শিশির তার বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেললো। এইটুকু বলেই চুপ করে থাকা যায় না, কিন্তু কি-ই বা আর বলার আছে?

বক্তব্য খুঁজতে গিয়ে ভাবনায় পড়লো শিশির। একদিন একপথে তারা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিল—তাকে ভাল-লাগা, ভালবাসা,

অনুরাগ বা গুণগ্রাহিতা যা-ই বলা হোক্ না কেন। সে পথ আজও কো
বিপত্তির বাজ পড়ে ভেঙে যায়নি। তবু ব্যবধান এসে গেছে। শিশি
আর সিতার জীবনের ইঙ্গিত দুটি ভিন্ন গ্রহের মত নিজের নিজে
কক্ষটিকেই সত্য বলে বুঝতে সুরু করেছে।

ভাবতে গিয়ে আবার খেই হারিয়ে ফেলে শিশির। একটা মুগ্ধ দৃ
দু'চোখের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে স্থানকালের সীমা পার হয়ে এ
যুগোপান্তে পৌঁছে সিতাকে দেখতে থাকে। এক মঙ্গল কাব্যের নায়িকা
মত দেখাচ্ছে সিতাকে। অগ্নিপাটের শাড়ি প'রে সন্ধ্যামালতীর ব
সুন্দর পান্থের আশায় যারা প্রতীক্ষায় থাকতো. জলটুঙ্গী ঘরে সোহাগি
রূপে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে যারা একদিন শাওনিয়া মেঘ দেখেছে আ
বারমাস্যা গান করেছে, প্রবাসী রত্নেশ্বর সাধুদের চৌদ্দ ভুবনে পাটেশ্ব
হয়েও যে-বিরহিণীরা এক গোপনে-আপন কিশোর বন্ধুর পবনের ডিঙাখানি
প্রতীক্ষায় ঘাটের দিকে তাকিয়ে অধীর হয়ে উঠতো—সিতা আজ সে
অতীতের যত মানিনী মূর্তিদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছে। কলকাতা
বিখ্যাত ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর মেয়ে সিতার গত বছর বি-এ পাশ করা
ঘটনাটাও যেন সর্বৈব মিথ্যা। সিতা এ যুগের কেউ নয়, কোন যুগের
নয়। সিতা একটি অভিজাতক প্রেমের আত্মা, নিছক মানের বালা
নিয়ে যারা ত্রেতা দ্বাপর পার করে দিল। প্রণয়কলাপে পরাজিত হ
কেঁদে ফেলে, জয়ী হলে তুচ্ছ করতে শেখে।

সমালোচনাটা একটু মাত্রাহীনভাবে কঠোর হয়ে পড়ছে। শিশি
মনে মনে লজ্জিত হলো। কিন্তু মেঘরৌদ্রের খেলার মত সিতার ওপ
এই দুই মনোভাবের দ্বন্দ্ব থেকে আজ রেহাই পাচ্ছিল না শিশির
কোনমতেই। কোথাও যেন একটা ক্ষত প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ক্ষতটা খুব
গভীর বোধ হয়।

সিতা ডাকলো।—শিশির।

শিশিরের হুঁস ফিরে এল।—আঁ্যা, আমায় কিছু বলছো ?

সিতা।—হাঁ, চল আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু তার আগে আমি যা চাইব, আজ আমাকে সেই আশীর্বাদ দিতে হবে।

শিশির।—বল।

সিতা।—আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না। যদি এতটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে বল—আমার চেয়ে আর কাউকে বেশী ভালবাসতে পারবে না।

শিশির।—এভাবে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি কেন আদায় করছো সিতা?

সিতা।—না, আমি কোন কথা শুনবো না।

শিশির।—শোন সিতা···।

সিতা।—না।

আগ্রহে সুন্দর একটি বরণদৃষ্টি শিশিরের মুখের দিকে স্থির হয়ে রইল।

শিশির বললো।—তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে কাউকে পারবো সিতা।

বলবার সময় বুকটা কেঁপে উঠেছিল। কথাটা শেষ করেই শিশির এক লাফে দূরে সরে গেল।—ছি ছি, কি করছো সিতা! পা ছুঁতে পাবে আমাকে বিপদে ফেলো না।

সিতা যেন ধমক দিল।—চুপ করে দাঁড়াও, আমায় বাধা দিও না।

শিশির স্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বললো।—এ কি কাণ্ড করলে তুমি ?

সিতা।—কোন কাণ্ড করিনি। চল, আমায় পৌঁছে দেবে।

বিপিন তখনো এসে পৌছয়নি। দরজায় কুলুপ লাগিয়ে শিশির পথে নেমে পড়লো। টব থেকে দুটো নতুন গাঁদা পট্ পট্ করে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে সিতা বললো।—আজ থেকেই বিনা হুকুমে নিতে আরম্ভ করলাম।

সিতা এক টুকরো স্ফূর্তির মত শিশিরের পাশে পাশে হেঁটে চলেছিল। একটা আশ্রয়লিপ্সু হাত শিশিরের মুঠোয় বন্দী হয়ে চলেছে। শিশিরের আংটিটা সিতার নরম হাতটার ওপর চেপে বসে গেছে—একটু ব্যথাও লাগছে। তবু ভাল লাগছিল সিতার।

শিশিরের দেহ-মন এক প্রবল মমতার উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। কত বড় আশ্বাসে আজ তারই গা-ঘেঁসে পাশে পাশে চলেছে সিতা। কত ছোট্টটি হয়ে গেছে সিতা। সেই গরবিনী আধুনিকার অবলেশও খুঁজলে এখন পাওয়া যাবে না। অসহায় অথচ আদুরে মেয়ের মত মাত্র একটি কথার সান্ত্বনাতেই কত বড় তৃপ্তি বয়ে নিয়ে চলেছে।

সিতার মুখে অবাধ কথার ফোয়ারা ছুটছিল।—তুমি তো কোন খোঁজ রাখবে না, রাখতেও চাও না। জয়ন্ত বাবার কারবারে পার্টনার হতে চলেছে। দলিলও তৈরী হয়ে গেছে, শুধু রেজিস্ট্রেশন বাকী।

শিশির।—তবু ভদ্রলোক একটা কাজে নামছেন। আমি এখনও নিষ্কর্মাই রয়ে গেলাম।

সিতা—জয়ন্তকে আমি ভয় করি না শিশির। বাবাকেই ভয়। জয়ন্ত এরই মধ্যে বাবার কাছে আইডিয়াল ইয়ং ম্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিশির।—বাবাকে ভয়? এ যে নতুন কথা শুনছি। মিস্টার বসু চুরুট খাবেন, না, সিগারেট খাবেন, সেটাও শুনেছি তোমারই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

সিতা—হাঁ, সেই জন্যেই ভয়। বাবা যদি কোনদিন তাঁর নিজের

চ্ছ জাহির করেন, সেদিন সেটা চরম হয়েই হাজির হবে। বাবার সেই ইচ্ছাটা এখন থেকেই অনুমান করে নিতে পারি। তাই সত্যি আমার ভয় করে—অবাধ্য হয়ে বাবাকে কষ্ট দেবে, কল্পনা করতেও আমার কান্না পায় শিশির।······তুমি হাসছো মনে হচ্ছে ?

শিশির।—হাসছিলাম নিজের অবস্থাটা কল্পনা করে।

সিতা।—বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ করা উচিত ছিল। আমার সে অনুরোধ রাখলে না।

শিশির।—আমি তো আগেই আমার সেই ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েছি। মিস্টার বসুর সঙ্গে আলাপ করে পরিচিত হতে আমি অক্ষম, সেটা আমারই দোষ বলতে পার।

কিন্তু তুমি আর ঘরকুনো হয়ে থাকতে পারবে না। ঘরে বসে বসে শুধু দিনরাত রাগ-রাগিণীর চচ্চড়ি ভেজে আর আমার ওপর রাগ করে দিন কাটিয়ে দিলে চল্‌বে না।

শিশির।—রাগরাগিণীর ওপর এখনো তোমার আক্রোশ মিটে যায়নি দেখছি।

সিতা।—রাগ-রাগিণীর ওপর আমার কোন রাগ নেই। কিন্তু সে-গানের সঙ্গে জনমনের যোগ নেই, সে-গানের কোন মূল্য নেই। তোমার ঐ ঘরটি হলো একটি সুন্দর সুরের কবর, ঘরের বাইরের কাছে তার কোন মূল্য নেই।

শিশির চম্‌কে উঠলো। সোনার পিঞ্জরের পাখির শিসে সমুদ্র-বাতাসের শব্দ শিউরে উঠছে যেন। এই বাণী কোথা থেকে পেলে সিতা!

শিশির।—তুমি আমাকে আশ্চর্য করে দিলে সিতা। যা বললে, তা সত্যিই বিশ্বাস কর তো ?

সিতা।—করি বৈকি। এটাই যে আমাদের জাগৃতি সংঘের বাণী।

শিশির।—জাগৃতি সংঘ ?

সিতা।—হাঁ, তোমাকে এই সংঘে আসতে হবে। জনতার জন্য গান গাইতে হবে।

শিশির।—কিসের গান ?

সিতা।—ফাসিস্ত-বিরোধী গান। এখন সব চেয়ে আগে এটাই আমাদের প্রয়োজন।

শিশির।—ও হরি ! বুঝলাম।

সিতা।—তুমি বিদ্রূপ করছো শিশির।

শিশির।—বিদ্রূপ নয়। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি হঠাৎ বুঝে ফেললাম।

সিতা।—কি বুঝে ফেললে ?

শিশির।—তুমি একটা দলের বুলি আওড়ে দিলে শুধু।

সিতা।—বুলিটা যদি সত্য হয়, তবে তোমার আপত্তি কি ?

শিশির।—বুলি কখনো সত্য হতে পারে না।

সিতা।—তুমি এসব শুধু বলছো তোমার অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্য। কাজ এড়িয়ে যাবার ছুতো।

শিশির।—না, আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই সিতা।

সিতা।—তাহ'লে জাগৃতি সংঘে আসছো ?

শিশির।—না, আমি একাই কাজ করবো। যদি ব্যর্থ হই, যদি দেখি ভুল হচ্ছে আমার, তখন তোমাদের জাগৃতি সংঘের উপদেশ শোনবার চেষ্টা করবো। আপাততঃ···।

সিতা।—কি করবে ঠিক করেছ।

শিশির। আমি বাইরে যাচ্ছি। ডায়মণ্ডহারবার, কাঁথি, কাটোয়া···

সিতা।—কিছু প্রচার করতে যাচ্ছ ?

শিশির।—হাঁ, প্রচারই করবো।

সিতা।—কিভাবে ?

শিশির।—গান শুনিয়ে।

সিতা।—এটাও বোধ হয় তোমার রাগ মহাদেশ আবিষ্কারের যাত্রা।

শিশিরের মনে হলো, সিতা বোধ হয় মুখ টিপে হাসছে। শিশির উত্তর দিল।—আমার আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী বেড়ে গেছে সিতা। আমি রাগ মহাদেশ আবিষ্কার করবো না, তৈরী করবো। সেই সুরের বীজ ছড়াবো দেশ জুড়ে।

নিজের মনের উত্তেজনাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে একটু শান্তভাবেই শিশির বললো।—খেতে না পেয়ে এক একটা গাঁয়ের শানাইওয়ালার দল শেষ হয়ে গেছে। মনের ওপর দিয়ে এখন যেন একটা কালাশৌচের পালা চলেছে। এই ক্ষতিটা তুমি কতদূর ভাবতে পার জানি না ; কিন্তু আমার কাছে এটা স্বজনের মৃত্যুর মত দুঃখ। বিপিনের বউ ছেলে কোলে করে মৃত্যুযাত্রায় বার হয়েছে, বিপিনটা কাঁদছে আর ছট্‌ফট করছে, পথেই ওদের শেষ হয়ে যাবে কিনা কে জানে। অবনীবাবুর মত লোক গামছা হাতে পথে খাবি খাচ্ছেন, এক সের আটার জন্য। সবই দেখছি, বুঝছি। আজ কোন্ গান গাইবার সময় এসে গেছে, তা'ও বুঝতে পাচ্ছি।

সিতা হঠাৎ ভয় পেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বললো।—এ অবস্থায় তুমি আবার কি করতে চলেছ ?

• শিশির।—আমি বাঁচবার গান গাইবো।

সিতা।—বেশ তো, তার জন্য বাইরে যাবার দরকার কি ? তুমি লিখে দিও, আমি পত্রিকাগুলিতে ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেব।

শিশির।—খেতে না পেয়ে দেশের লোক নিঃশেষ হয়ে যাবে, এটাকে

আমি মৃত্যুর ব্যাপার বলি না। এটা নিছক হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকে ঠেকাতে হবে। ধানের দাবি, জমির দাবি, মজুরীর দাবির গানই আমার গান। আগে বাঁচতে হবে।

সিতা ভয় পেয়ে নির্বোধের মত চেঁচিয়ে উঠলো।—এসব করতে যেও না শিশির। শেষে কি একটা বিদ্রোহ···।

শিশির।—বিদ্রোহ নয়, বাঁচবার দাবির সংগ্রাম।

সিতা।—না, না, ওসব তুমি করতে পারবে না। তুমি সবই ভুল বুঝেছ। প্রকাশবাবুর কাছে একবার চল—তিনিই তোমাকে বোঝাতে পারবেন। তুমি ভুল করে ফাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের ব্যবস্থা নষ্ট করতে চলেছ। ভয়ানক ভুল করছো, জাপানীরা এসে পড়লে কাউকে আর আস্ত রাখবে না। তোমাকে কিছু করতে হবে না, চুপ করে ঘরে বসে থাক। নইলে আমি পারুলদিকে কালই চিঠি দিয়ে দেব যে তুমি ক্ষেপে গিয়ে যা-তা করতে চলেছ।

আবোল তাবোল বকে যাচ্ছিল সিতা। উদ্বেগের প্রকোপে কথাগুলি সবই খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।—আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ তোমাকে এসব শিখিয়ে উস্কে দিয়েছে নিশ্চয়। হাঁ, একটা কথা জানবার ছিল। কুন্তলা কে?

শিশির।—ছোড়দির মেয়ে।

সিতা।—ভাল কথা। মীরা কে?

শিশির হেসে ফেললো।—কিছু একটা পরীক্ষা করে দেখছো বোধ হয়?

সিতা।—যা বলছি, তার উত্তর দাও।

শিশর।—মীরা হলো বড়দির নাতনি।

সিতা।—বেশ, আর একটি কার নাম শুনলাম? জ্যোৎস্না?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—কে এই মহাশয়া ?

শিশির।—অবনীবাবুর বোন।

সিতা।—আচ্ছা, আর একটি কথা। এই যে কম'াস তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, ততদিন তুমি কি করতে ?

শিশির।—সেরকম নতুন কিছুই করিনি। লোকগীতি নিয়ে একটা রিসার্চ গোছের কাজ করেছি, অবনীবাবু খুব সাহায্য করেছেন। প্রচারক বল আর চারণ বল, দেশের মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে দেশের গীতময় প্রাণের প্যাটার্নটি আগে বুঝে নিতে হবে।

সিতা বিরক্ত হয়ে বললো।—একটু থাম তুমি।

শিশির।—যদি দেশের মর্মে পৌঁছতে চাও, তবে এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। এমন যে দূর আরব দেশের ইস্‌লাম, তাও বাঙালাদেশে এসে গাজীর গানে ও জারির গানে বাণীরূপ পেয়ে কত সহজ সজীব ও সত্য হয়ে উঠলো। মাটীর সুরে মেজে না দিলে কোন বাণীই সত্য হয় না। কীর্তন, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, বারমাস্যা, ধামালি, ঝুমুর, যোগীদের গীত, গাজন গান, চণ্ডীমঙ্গল, বেহুলা মনসা ও বিষহরির গান—এই সব লোকগীতি নিয়েই দেশের জীবন্ত কলাদেহটী তৈরী হয়ে আছে। তাকে চিনতে হবে। অবনীবাবুও আমার সঙ্গে সমানভাবে খেটেছেন, বলতে গেলে তিনিই সব পুঁথিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন।

সিতা।—তোমার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি।

শিশির।—আমাদের খাটুনি অন্তত একদিক দিয়ে এইটুকু সার্থক হয়েছে যে, আর্টের ক্ষেত্রে প্রচারতত্ত্বের দুটো নিয়মের সূত্র আজ ধরতে পেরেছি। প্রথম হলো, নতুন বাণী প্রচার করতে হলে পরিচিত সুরে সাজিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়, সুরটি নতুন হলে পরিচিত বাণীর আশ্রয়ে

তাকে পরিবেষন করতে হবে। আর একটা বড় গলদ ধরা পড়েছে—কাল্‌চারের ব্যাপারে দেশে একটা দ্বৈরাজ্য চলেছে। গাঁ আর শহর নামে দেশের মাটিতে দুটো সভ্যতা পাশাপাশি চলেছে—কেউ কারও সঙ্গে মিশতে পারছে না। এই ব্যবধান জুড়ে দিতে হবে। অবনী বাবুকে ধন্যবাদ দিই—আজ আমি যে এত প্রাঞ্জল ও সরল একটা কাজের প্রোগ্রাম পেলাম, সেটা তাঁরই বন্ধুত্বের প্রসাদ। না, আর কাজ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই সিতা। আমার এস্‌রাজ আর 'দুই বিঘা জমির' দাবী—এই মূলধন নিয়েই প্রচারে নামবো। দেখি, আমাদের থীসিস্‌ মিথ্যে না সত্য।

সিতা।—অবনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক তোমার হাতে এই থীসিসের গর্ব তুলে দিয়েছেন। সেই অবনীবাবুর বোন জ্যোস্না। কেমন?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—ডোভার লেন এসে পড়েছে। আর তোমাকে আসতে হবে না, এইটুকু আমি একাই স্বচ্ছন্দে চলে যাব।

শিশির।—আচ্ছা, এস।

তোমার চাইতে আর কাউকে বেশী ভালবাসতে পারবো না—সিতার কাছে তার প্রেমিকতার নিষ্ঠা ঘোষণা করার আগের মুহূর্তেও শিশির বুঝতে পারেনি যে, কথাগুলি বলতে গিয়ে তার বুক কেঁপে উঠবে, তার বিশ্বাসের নেপথ্য থেকে হঠাৎ একটা গোপন প্রতিবাদ সেই প্রতিশ্রুতির ছন্দ নষ্ট করে দেবে। দুষ্টু ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে কাজের মা যখন নিশ্চিন্ত মনে উঠতে যান, হঠাৎ আঁচলে টান লাগে, চমকে উঠে দেখেন যে, আঁচলটি ঘুমন্ত ছেলের সাবধানী মুঠোর ভেতর বন্দী হয়ে আছে। শিশিরেব মনের আঁচলে আচম্‌কা টান পড়েছিল; তাই

বুক কেঁপে উঠেছিল। এরকম যে হবে, আগে তার তিলমাত্র আভাসও টের পায়নি শিশির।

ধরতে গেলে একটা মাসও পুরো পার হয়নি। সামান্য কয়েকটা ঘটনা শিশিরের মনের বাগানের ডালপালা নুইয়ে দুলিয়ে যেন ভিন্ন করে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। যদি সেদিন বিপিনকে খুঁজতে বাইরে যেতে না হতো, তবে শিশিরকে মার্কেটের কাছে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হতো না। কণ্ট্রোলের লাইনের দীনসাধারণের মধ্যে একটি ভদ্রবেশ মূর্তির দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকতে হতো না। যেচে আলাপ করে, অভাবিত ভাবে, অবনীর সঙ্গে পরিচিত হতে হতো না। তাহ'লে অবনীনাথের বাড়িতে যাবার কোন কারণও ঘটতো না শিশিরের। অরুণা ও জ্যোৎস্নার সঙ্গে আলাপই বা হতো কি করে? সেখানে গান গাইবার দরকারও হতো না। গান শেষ হলে জ্যোৎস্নাও অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো না, অরুণা দেবী এত খুসী হতেন না।

পর পর এতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। নেহাৎ পথে-বিপথে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক বটের ছায়া পেয়ে গেছে শিশির, অবনীর বন্ধুত্ব। এই আশ্রয়ে ক্ষণিকের জন্য জিরিয়ে নিতে পারলে আপনা থেকেই ক্লান্তি মুছে আসে—একাকিত্বের রিক্ততা ঘুচে যায়। কাজ করবে শিশির, কিন্তু অবনী যেন যেচে সেই ভাবনার অর্ধেক ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। তার জন্য অবনীকে কোন অনুরোধ করার দরকার হয়নি। লোকগীতি নিয়ে রিসার্চ করার জন্য যতখানি সাধ্য ততখানি সাহায্য করেছে অবনী। অবনী বোধ হয় এখনো ঠিক করে জানেও না—শিশিরের দেশ কোন্ জেলায়, কোন্ গাঁয়ে? কায়স্থ না ব্রাহ্মণ? চাকরি করে কি করে না? কিন্তু মানুষ হিসাবে যে-পরিচয় সবচেয়ে বড় সত্য, সেটা আগেই জানা হয়ে গেছে। প্রথম আলাপের

পরদিন শিশির জিজ্ঞাসা করেছিল।—আপনারাও কি শুনেছেন যে, একটা গ্রামের সব শানাইওয়ালারা খেতে না পেয়ে মরে গেছে ?

অবনী বলেছিল।—শুনিনি, তবে খবরটা বিশ্বাস করি। একটা গ্রাম কেন, বহু গ্রামেই বাদ্যকর, কারিগর, চাষা মজুর একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এর জন্য দুঃখ করবেন না।

অবনী দেখছিল, ভদ্রলোকের মুখটা হতাশ্বাসে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। শিশিরকে তখুনি যেন চিনতে পারলো অবনী। ওর মনের ভেতর একটি দেশী মানুষ অঝোরে কাঁদছে, হরু ডোমের মৃত্যুর দুঃখটা ভুলতে পারছে না। অবনী তার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললো।—আমার বাসায় চলুন, মন খুলে আলোচনা করা যাবে। পথে দাঁড়িয়ে কথা বলার অসুবিধা আছে।

খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট। অবনী দ্বিধা না করে বলেই ফেললো।—আর মুখ বুঁজে মরতে চাই না শিশিরবাবু। আমরা প্রতিবাদ করবো, সেই জন্যই আপনার সঙ্গে আলোচনা।

আলোচনার শেষে শিশির বললো—আপনি যা বললেন, আমি সবই বিশ্বাস করছি অবনীবাবু। আমি কাজ করবো। তার জন্য কোন আপদকে আমি ভয় করবো না। যখন নিজেকে একা মনে করি, তখনই শুধু ভয় করে। যদি জানি আপনি সহায় আছেন, তবে···।

অবনী।—শুধু আমি নই, বিশ্বাস করুন হাজার হাজার প্রাণ আপনার আগে ও পেছনে, আপনার আশেপাশে সহায় হয়ে আছে। কাজের মধ্যেই তাদের পাবেন।

এই গরিব বাড়িটার হৃদয়ের মধ্যেও একটা মাঙ্গলিক মোহ ছড়িয়ে আছে। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেলে অবনীবাবু বলেন—আর একটু দেরি করুন, একেবারে খেয়েই ফিরবেন।

জোছু হাত-পা ধোয়ার জন্য জল দিয়ে যায়। হাতে তোয়ালে তুলে দেয়। খেতে বসলে পিসিমা একবার চৌকাঠের বাইরে এসে বসেন। কথা বলতে গিয়ে পিসিমার গলার স্বর ভারী হয়ে আসে।—যাবার সময় হয়ে গেছে তবু যাবার ডাক আসে না। এ মরা প্রাণ যেতে চায় না বাবা। বিধি আরো কত দুর্ভোগ অদৃষ্টে লিখে রেখেছেন কে জানে! আরো কত দেখতে হবে, সইতে হবে। নইলে আজ তোমাকে বাজ্‌রার খিচুড়ি খাইয়ে···স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি বাবা।

পিসিমা আঁচলের খুঁটে চোখ মোছেন! শিশির খেতে খেতেই আবেগভরে চেঁচিয়ে বল্‌তে থাকে—আপনি সব ভুল বুঝেছেন পিসিমা। আবার দিন আসবে—আপনার হাতের রান্না ক্ষীরের পায়েস এইখানে বসেই খেয়ে যাব।

খাওয়া শেষ হলে শিশির দেখে, অরুণা এঁটো থালা নিয়ে গেল। শিশিরের চেতনায় এক বিস্ময়ের বর্ণালী খেলতে থাকে। প্রীতি এত স্বচ্ছন্দ হতে পারে, তা আগে কখনো জানা ছিল না শিশিরের। সব ব্যক্তিত্বের দর্প এখানে আপনা হতেই নত হয়ে আসে। এক আপন-করে-নেবার সুন্দর চক্রান্ত নীড় বেঁধে রয়েছে এখানে। যেই আসুক না কেন, এখানে পরাজিত হতেই তার ভাল লাগবে।

বাইরের ঘরে এসে শিশির দেখতে পায়, একটা ইজি চেয়ারে ঘাড় কাৎ করে ঘুমিয়ে পড়েছে অবনী। গলার পেশীগুলি নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপছে। ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁকে বুকের হাড়গুলি উঁকি দিচ্ছে। ডান চোখের ভুরুর ওপর একটা পুরাতন ক্ষতের দাগ। শ্রান্ত সৈনিকের মত দেখাচ্ছে অবনীবাবুকে। শিশিরের ভাবাকুল চোখের দৃষ্টি শ্রদ্ধা ও মমতায় আরও নিবিড় হয়ে আসে। শিশির শুধু দেখতে থাকে অবনীকে, জাগাতে ইচ্ছে করে না।

ততক্ষণে অরুণা এসে যায়।—একটা গান না শুনিয়ে যেতে পারবেন না।

শিশির উত্তর দেয়।—নিশ্চয়।

জোছু এসে বলে।—একটা বাংলা গান।

শিশির হেসে স্বীকৃতি জানায়।—তথাস্তু।

অবনী গা-মোড়া দিয়ে জেগে ওঠে।—হ্যাঁ, ওদের পাওনা আর বাকী রাখবেন না। যাবার আগে মিটিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। আর ক'টা দিনই বা আছেন।

কলকাতা থকে চলে যাবার আগে সিতাকে একবার মনে মনে খুঁজেছিল শিশির। শেষ দুটো দিন প্রায় সব সময় একটা আশাভরা প্রতীক্ষায় কাটতো। এক আধবার বাইরে বেড়াতে গেলেও, বিপিনকে বলে যেত—ডোভার লেনের দিদিমণি এলে, বসতে বলো বিপিন। আমি এখনি আসছি।

শেষ পর্যন্ত সিতা আর এল না। শিশিরের মন থেকে একটা উদ্বেগের পীড়া দূর হয়ে যায়। ভারবদ্ধ মনের পাখা দুটো যেন শিকলি কেটে লঘু হয়ে ওঠে। নিজের কাছেই ধরা পড়ে যায় শিশির। এটাই কি সে চাইছিল? তার ভালবাসার প্রতিশ্রুতিকে একটা ভুয়া বাক্যোচ্ছ্বাস মনে ক'রে সিতা সাবধান হয়ে যাক্, এই প্রতিশ্রুতিকে শতভাবে তুচ্ছ করুক্ সিতা—ঘৃণায়, সন্দেহে, রাগ করে, না এসে। শিশিরের মনস্কাম কি ভীরুচোখে এই চোরাপথে মুক্তির স্বপ্ন দেখছিল?

ভাব্‌বার শক্তি ফুরিয়ে আসছিল শিশিরের। তার পৌরুষের উদ্ধত মূর্তিটা সিতার কাছে এক অপরাধের গ্লানিতে নুয়ে পড়ছে। কাজ ও জীবনের স্বচ্ছন্দ ধারাকে স্বেচ্ছায় বিকৃত করে একটা কুটিলাবর্ত সৃষ্টি করেছে শিশির। নিজের ওজন যে জানে না পদে পদে তাকে স্খলন

পতনের দুঃখ ভুগতে হবেই। নিজেরই মূঢ়তাগুলি ক্রুর সর্পের মত নির্মমভাবে শিশিরের গায়ে যেন ছোবল দিচ্ছে। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

নিজের কাছে একে একে ধরা পড়ে যাচ্ছে শিশির। প্রতিজ্ঞা করার সময় বুক কেঁপে ওঠে। সিতার কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার বিপরীত পটে কাঁকুলিয়ার একটি অন্তঃপুরের প্রীতি স্মিতগোধূলির ছবির মত ফুটে ওঠে। সিতা তখন যেন দূর নক্ষত্রের মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শিশির ডাকলো।—বিপিন, শীগ্‌গির আমার বিছানাটা বেঁধে দাও। আমি স্টেশন চললাম। ক'দিন পরে ফিরবো।

শিশির চলে গেল, যেন এতক্ষণ ছটফট করে পালিয়ে যাবার একটা পথ খুঁজছিল।

কণ্ট্রোলের লাইনে দাঁড়ানো অভ্যাস হয়ে গেছে অবনীর। যারা নিয়মিত লাইনে এসে দাঁড়ায়, তাদের চক্ষেও অবনীর মূর্তিটা পরিচিত হয়ে উঠেছে। লাইনের আগু-পিছু সংস্থান নিয়ে যারা কুকুরের মত ঝগড়া করে, তারাও সাগ্রহে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় অবনীকে। অবনী তাদের ধন্যবাদ জানায়, খুশী মনে লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ বাবুটি রোজই আসে—তারা বলাবলি করে। সারি সারি মাথাগুলি ডাইনে-বাঁয়ে কাৎ হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে থাকে অবনীকে। কে এই বাবুটি? এরই মধ্যে লাইনসমাজে এই প্রশ্নটা নানারকম গল্প ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে জানে—বাবুটি নাকি কোন্ এক রাজার ছেলে, গরিবের জন্য সব দান করে দিয়েছে। এখন নিজেই খেতে পায় না। কেউ বলে—গান্ধী মহাত্মা পাঠিয়েছেন বাবুটিকে। এই চাল পাঠানো

হবে গান্ধী মহাত্মার কাছে। গরিবেরা যা খায়, গান্ধীজীও যে তাই খান। কদাচিৎ দু'এক জনের অনুমান ও জল্পনায় খানিকটা সত্যের আভাস ফুটে ওঠে—বাবুটি হলেন কংগ্রেসের লোক। গরিবের দুঃখ স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। হবে হবে, একটা ব্যবস্থা হবেই, বেশীদিন আর এই নরক যন্ত্রণা ভুগতে হবে না।

বেশ লাগে অবনীর। দুঃখে ক্লেশে ও দৈন্যে কঠিন এই লাইনের ভিড়ের মধ্যে এক নূতন আশ্বাসের বাতাস বইছে, তার সমস্ত অন্নদাসত্বের ঘৃণা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিড়ির দোকানে ছোট একটা শ্রোতার ভিড়ের ভেতর থেকে কোন রসিক গাইয়ের গান শোনা যায়—'সমরের ঢেউ লেগেছে বাংলায়।' একটা মাংসের দোকান থেকে ধুপ্ধাপ্ দা-কোপানির শব্দ আসে—কসাইরা কিমা কুটে ঢেরি লাগিয়ে রাখছে। একটা গুণ্ডা আসে গোটা দশেক পোষা ভিখিরী নিয়ে, জোর করে লাইনের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে। অবনীকে দেখতে পেয়ে কিভেবে অন্য দিকে চলে যায়। পাঁচটা মুটের মাথায় চেপে কোন নেমন্তন্ন বাড়ির বাজার চলে গেল। ঝাঁকাভরা নতুন কপির ওপর গণ্ডা গণ্ডা ইলিশ রোদ লেগে যেন রূপো হয়ে গেছে। চারদিকে কতকগুলি নাটুকে ঘটনা কিছুক্ষণের জন্য সব বাস্তব কদর্যতাকে ভুলিয়ে দেয়। লাইনটা মাথাছাঁটা হয়ে ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হতে থাকে।

দৈবী আবির্ভাবের মত কতকগুলি ভদ্রবেশী তরুণ তরুণীর মূর্তি লাইনের কাছে এসে দাঁড়ালো। অবনী কিছু ঠাহর করার আগেই তারা কাজে লেগে গেল।

'স্থির হয়ে দাঁড়াও। ধাক্কাধাক্কি করো না। চেঁচাচ্ছ কেন? এই চুপ কর, টিকিট আসছে।' আবির্ভূত মূর্তিগুলি দলে দলে ভাগ হয়ে, চেঁচিয়ে চারদিকে একটা খবরদারির হুল্লোড় সৃষ্টি করলো। ছোট একটা

ছেলে সামনের লোকটার পায়ের ফাঁকে মাথা গলিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। একটি তরুণ পায়জামা হঠাৎ ছুটে এসে ছেলেটার কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। ধমক দিয়ে বললো—ডিসিপ্লিন নষ্ট করবে তো মেরে তোমার···

কে এরা? অবনী তখনো কিছু বুঝতে পারছিল না। খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে অবনীর পেছনে দাঁড়িয়ে লুঙ্গিপরা লোকটি উত্তর দিল—আর এক ফ্যাচাং জুটেছে বাবু মশাই, এরা লাইন সাজাতে আসে। মিছিমিছি ঘাঁটাতে আসে বাবু। বলে—জাপানীকে রুখ্‌বে চল। আমি বলি, কি করে সেটা হয় বাপধন? আমার যে শ্লেষ্মা হয়েছে, পাঁজরগুলো একটু তেল মালিশও পাচ্ছে না। ওষুধ পথ্যি না পেয়ে দিন দিন বেঁকে যাচ্ছি মশাই—সাধে কি আমাকে বাঁকারাম বলে!

অবনী কৌতূহলী হয়ে আবার প্রশ্ন করলো।—ওরা এই কথা বলতে প্রায়ই আসে বুঝি?

লোকটি বুকে হাত দিয়ে কেশে নিয়ে উত্তর দিল।—হ্যাঁ গো মশাই। যাকে ইচ্ছে বলুক, আমাকে কেন? তিন ভাইয়ের মধ্যে দুভাই তো লড়াইয়ে ভেগেছে। শুধু আমি বাঁকারাম পড়ে আছি। আল্লা মিঞার মরজি, বাঁকারামেরও হয়ে এল।

অবনীর সব সংশয় ও কৌতূহল ভঞ্জন করে ততক্ষণে সত্যি সত্যি একটা কোরাস্ গান মার্কেটের রঙ্গমঞ্চে এক অকথ্য চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে।

"জাপানীকে রুখ্‌বি বল্
কিউয়ে দাঁড়াবি চল্······

গান গেয়ে আর ভেজা বারুদের পট্‌কার শব্দের মত কতকগুলি আধাভৌতিক বুলি চীৎকার করে তারা ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো। অবনীর সামনে এসে যেন একটা বিষম খেয়ে সেই চড়া গর্জনের স্বরটা

হঠাৎ খাদে পড়ে গেল। জোড়া জোড়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টি অবনীর আপাদমস্তক যেন খুঁটে খুঁটে দেখছিল—পাতিহাঁসের দলে এই বকটি আবার কোথা থেকে এসে ভিড়েছে ?

কৌতূহল সাম্‌লাতে না পেরেই তাদের মধ্যে দুচার জন, তারপর একে একে সবাই অবনীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। একটি যুবক বেশ সমীহ করে অবনীকে প্রশ্ন করলো।—চাল পেতে আপনাকে খুব ভুগ্‌তে হচ্ছে, নয় ?

অবনী।—আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসব প্রশ্ন করছেন, কেনই বা এখানে এসেছেন, তা না জান্‌লে আমি কিছু বলতে পারছি না।

—আমরা জাগৃতি সংঘের কর্মী, ফুড ফ্রণ্টে কাজ করছি।

অবনী।—এখানে কি করতে এসেছেন ?

—এখানে কাজ করছি।

অবনী।—কিসের কাজ ?

—ফুড ফ্রণ্টের কাজ।

অবনী।—যান, কাজ করুন গিয়ে।

জাগৃতি সংঘের, কর্মীদের মধ্যে একটা কানাঘুসা ফিস্‌ফাস্ করতে লাগলো।

আর একটি কর্মী উৎসাহিতভাবে এগিয়ে এসে বললো—আপনার কোন অভিযোগ থাকলে বলুন।

অবনী।—অভিযোগ নেই, একটা প্রশ্ন আছে।

—বলুন।

অবনী।—আপনারা রোজ ভাত খাচ্ছেন তো ?

কর্মী ছেলেটি হেসে ফেললো।—তা খাচ্ছি বৈকি।

অবনী।—চাল কোথায় পাচ্ছেন ?

—কিন্‌ছি।

অবনী।—কণ্ট্রোলের দোকান ছাড়া তো চাল কোথাও পাওয়া যায় । শুধু চোরাবাজারে পাওয়া যায়।

ছেলেটি একটু হক্‌চকিয়ে সহকর্মীদের দিকে তাকালো। বয়স্ক হারার একজন কর্মী ছেলেটির তরফে উত্তর দিল।—এই চোরাবাজারের যন্ত্র ধ্বংস করার জন্যই আমরা কাজে নেমেছি।

অবনী।—বিশ্বাস করলাম, কিন্তু আপনারা চাল কিনছেন কোথা কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

—আপনার ঠিকানাটা জানতে পারি কি?

অবনী।—না।

—আপনি কি কোন কাগজের রিপোর্টার?

অবনী।—না। আপনারা এখানে চাল কেনার একটা ঢং লোককে খাতে এসেছেন, কিন্তু নিজেরা কোন্ ঢঙে কেনেন, সেই খবরটা মাকে জানাতে পারেন?

কর্মীদের মধ্যে চাপা স্বরে একটা ঘরোয়া আলোচনা হয়ে গেল।

আর একটি কর্মী উত্তর দিল।—আমাদের একটা বৃহত্তর রাজনীতিক দেশ্য আছে, সেইজন্যই এখানে এসে……।

অবনী।—সেই জন্য এখানে লাইনের গরিব লোকগুলিকে নিয়ে নিমিনি করতে এসেছেন।

—আমরা পীপ্‌লের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখতে এসেছি।

অবনী।—কিন্তু পরিণামে সেটাই একটা দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্মীদের ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন টিট্‌কারি দিল।—এখানে া কষ্ট করছেন কেন? বর্মা চলে যান, জাপানীরা সস্তায় চাল লোচ্ছে সেখানে।

বিদ্রূপটা শুধু কানে শুনে শেষ করে দিল অবনী। ক্ষোভ সংযত করে শান্তভাবে জবাব দিল।—আমার কড়া কথা মাপ করবেন আপনারা। আমি জানি, আপনারা বাধ্য হয়েই চোরাবাজার থেকে চাল কেনেন, কিংবা আগেই কিনে মজুদ করে রেখেছেন, অথবা অফিস থেকে পাচ্ছেন, যারা প্রত্যেকে মজুতদারী করছে। এই তিনের যদি কোনটিও সত্য না হয়, তবে ধরে নিতে হবে আপনারা অনশনে আছেন।

একটি ছেলেমানুষ কর্মী বেফাঁস বলে ফেললো।—আমরা এখান ওখান থেকে চাল পাই।

অবনী।—ঐ এখান-ওখানকেই চোরাবাজার বলে খোকা।

—লাইসেন্স থাকলে চোরাবাজার হবে কেন?

অবনী।—তোমার সংঘদাদা কি এই সোজা তত্ত্বটাও শিখিয়ে দেননি? দেশের মানুষের পেটের খোরাক দেশের হাটবাজার থেকে সরিয়ে ভাঁড়ারে বন্ধ করে রাখাটাই পাপ। পাপের আবার লাইসেন্স কি?

বোঝা গেল, কর্মীদের মধ্যে একটা উষ্মা ধীরে ধীরে মুখর হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। লাইনটা এরই মধ্যে ছোট ও জনবিরল হয়ে এসেছে।

অবনী।—অন্ততঃ এইটুকু নিষ্ঠা আপনাদের মত কর্মীদের থাকা উচিত ছিল যে, মজুতদারের চাল আপনারা খাবেন না। ফুড ফ্রণ্ট তো চোখের সামনে রয়েছে। ঐ তো পীপ্‌ল্ রয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিচ্ছেন কেন? ভেতরে আসুন। এসে দাঁড়ান না এর মধ্যে! তাহলে আমরা কতখানি জোর পেতাম বলুন তো?

কর্মীদের উষ্মা যেন একটু ফিকে হয়ে এল।

অবনী।—মজুতদারের চাল যারা কিনে খায়, তারাও চোরাবাজারী চক্রান্তের ভাগী। সবচেয়ে হতভাগ্য তারা। আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই কাল থেকে এই লাইনে এসে চাল কিনতে দাঁড়াবেন। আপনাদের

প্রতিদিনের খাওয়া-পরার জীবন যদি চোরাবাজার সমর্থন করে, তবে কথার বিদ্রোহে কি ফল হবে বলুন ?

কর্মী ছেলে ও মেয়েরা চুপ করেই সব কথা শুনলো। আরও কিছু যেন তারা শুনতে চাইছিল। অবনীর সামনে তখন মাত্র অল্প ক'জন ক্রেতা দাঁড়িয়ে আছে। চাল নেবার পালা এগিয়ে এসেছে।

অবনী বললো।—আমি আশা করে রইলাম। কাল আপনারা আসবেন, তারপর আমরা সবাই মিলে লাইনে এসে দাঁড়াবো।

পেছন থেকে বাঁকারাম কাশলো।—এগিয়ে চলুন বাবু, চাল দিচ্ছে।

অরুণা সামনে এসে বললো।—কোথায় যাচ্ছ ?

অবনী।—অফিস চললাম। চাকরিটা আর থাকবে না। রোজ লেট হচ্ছে।

কতকগুলি কাগজপত্র হাতে নিয়ে অবনী বললো।—জোছু কি এখনো শুয়ে আছে? ওর মতলব কি? পরীক্ষাটা দেবার ইচ্ছে নেই বোধ হয় ?

অরুণা।—জানি না। চুপ করে বসে আছে তখন থেকে।

অবনী।—কেন ?

অরুণা।—জানি না।

অবনী হাঁক দিয়ে জোছুকে ডাকতে যাচ্ছিল, অরুণা বাধা দিয়ে বললো—না, ডেক না।

অবনী সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।—তুমি একটা কিছু বোধ হয় অস্পষ্ট করে বলতে চাইছ? স্পষ্ট করে বললেই বুঝতে পারবো, বল।

অরুণা খানিকক্ষণ দ্বিধার মধ্যে থেকে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছ ইন্দ্রনাথ এখন কোথায় ?

অবনী।—কলকাতায়।

অরুণা।—ইন্দ্র কি এদিকে আসা একেবারে ছেড়ে দিল ?

অবনী।—তা আমি বলতে পারি না। আমার সঙ্গে আর দেং হয়নি।

অরুণা।—ইন্দ্রনাথ কি আমাদের ওপর রাগ করেছে ?

অবনী।—ইন্দ্রনাথ জানে।

অরুণা।—যদি কিছুই না জানো, তবে কিছু শুনতেও চেয়ো না।

অবনী।—এইটুকু শুধু জানি, ইন্দ্রনাথের পক্ষে এখানে আসার এব বাধা আছে।

অরুণা।—কেন ?

অবনী।—ইন্দ্রনাথ এখন জাগৃতি সংঘের মানুষ।

অরুণা।—তাতে বাধাটা কোথায় ? এখানে এলে কি জাগৃতি ন হয়ে যাবে ?

অবনী।—অন্ততঃ ইন্দ্রনাথ আজকাল তাই মনে করে।

অরুণা।—তোমার সঙ্গে কোন ঝগড়া হয় নি তো ?

অবনী হাত তুলে তার ভুরুর ওপর একটা পুরাতন ক্ষতচি দেখালো।—এটার ইতিহাস জানো ?

অরুণা—না।

অবনী।—আমি আর ইন্দ্র একই স্কুলে পড়তাম। দেশের কাজ করে গিয়ে আমাদের ছেলেবেলার জীবনও দুটো দলে ভাগ হয়েছিল। আমাদে ছিল মুক্তি-সমিতি, ইন্দ্রদের ছিল শ[illegible] সমিতি। ইন্দ্রনাথের প্রথ দেশসেবার কীর্তি হলো এই দাগটা।

অরুণা বুঝতে পারছিল না, অবনী তাই আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল—ইন্দ্রনাথ ছুরি মেরেছিল।

অরুণা।—ইন্দ্রনাথ ?

অবনী।—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা চরকা একজিবিশন সেরে দুর্লভপুর থেকে মাঠে মাঠে ফিরছিলাম, ইন্দ্রনাথ কোথা থেকে ছুরি নিয়ে এসে পথ রুখে বললো—দেশের শত্রুকে শেষ করবো।

অরুণা।—দেশের শত্রু ?

অবনী।—হ্যাঁ, আমরা তখন দলের শত্রুকেই দেশের শত্রু বলতাম, অর্থাৎ রাজনীতির চর্চা করতাম।

অরুণা।—বলিহারি তোমাদের বন্ধুত্ব আর শত্রুত্ব !

অবনী।—তার দু'বছর পরে আমরা আবার পার্ব্বতীপুর জংশনের প্ল্যাটফর্মে রাত্রিবেলা পাশাপাশি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে শীতে কাঁপছিলাম। ইন্দ্র জেল থেকে বেরিয়ে এল ম্যালেরিয়ায় রক্তহীন হয়ে, আমি বের হলাম কালাজ্বর নিয়ে, একই দিনে।

অরুণা।—আবার দুই শত্রু বুঝি বন্ধু হয়ে গেলে ?

অবনী একটু অন্যমনস্কের মত বিড় বিড় করে উত্তর দিল।—হ্যাঁ, সেই শত্রুতার পরেও তো ইন্দ্র আবার এসেছে। পথ বন্ধ হয়নি কখনো। সব দাগ মিটে গিয়েছিল। কিন্তু এইবার ইন্দ্রনাথ আর আসবে না। পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

অরুণা।—তুমি একবার ভালভাবে আসতে বললেই আসবে।

অবনী।—যতদূর শুনছি আর বুঝতে পারছি, বললেও ইন্দ্র আর আসবে না।

অরুণা।—আমার বি[illegible]াস হয় না। তুমি তিলকে তাল করে দেখছো।

অবনী।—না অরুণা, তুমি জান না। জাগৃতি সংঘের লোকেরা

সংঘেরই মানুষ। তাদের মনুষ্যত্বই ভিন্ন। খেতাবী মানুষ যেমন সকলের কাছে পর হয়ে যায়, ঐ সংঘের অফিসটি সেই রকম একটি অমনুষ্যত্বের সুড়ঙ্গ। যে সেখানে যায়, সেই সরীসৃপ হয়ে যায়। চারদিকের আলোকের জীবনের জন্য কোন দরদ থাকে না। ইন্দ্রনাথ এখন ভিন্ন মানুষ। এখন যদি সে শত্রুতা করতে চায়, তবে নিজের হাতে ছুরি নিয়ে আসবে না, ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে।

অবনীর চোখ দুটো চকচক্ করে উঠলো। অরুণা শঙ্কিত হয়ে অবনীর হাত ধরলো।—কী ভয়ানক কথা বলছো তুমি। না, এ তোমার ভুল ধারণা। আমি ইন্দ্রকে ডেকে আন্‌বো। তুমি তার ওপর অন্যায় করছো, খুব বেশী রাগ করছো।

অবনী।—একটুও রাগ করিনি আমি, তুমি ইন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়ো না, ভুল হবে।

অবনী।—একটু আস্তে বল, জোছু কি মনে করবে বুঝতে পারছো না?

অবনী ব্যস্ত হয়ে উঠলো।—থাক্ এসব কথা। আমি যাই। আজও অফিস লেট হবে।

অবনী বাইরে যেতেই জোছু ওঠে এল। অরুণা কিছু বলবার আগেই জোছু বললো।—কিছু মনে করো না বৌদি। তুমি দাদাকে এইমাত্র মস্ত একটা মিথ্যা কথা বলেছ।

অরুণা কিছু ঠাহর করতে না পেরে বললো।—বুঝলাম না জোছু।

জোছু।—ইন্দ্রদা আর আসে না, এটা তোমার আর দাদার ভাবনা হতে পারে, আমার ভাবনা নয়।

অরুণা।—কি বলছো জোছু! তোমাদের ভাইবোনের দুজনারই কথার মর্ম বুঝতে আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না।

জোছু হেসে ফেললো।—মোট কথা তুমি এতক্ষণ যা ভাব্‌ছিলে তা সবই ভুল। এটা বিশ্বাস কর।

অরুণার মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা অপ্রসন্নতার ছায়া দেখা দিয়ে সরে গেল।—তোমরা গায়ের জোরে সব বিশ্বাস উল্টে দিচ্ছ।

জোছু।—না বৌদি। তুমি বিশ্বাস কর।

অরুণা।—ইন্দ্রনাথ না এলে এ বাড়ির কি কারও কোন ক্ষতি হবে না?

জোছু।—বিশেষ করে কারও ক্ষতি হবে না। সবারই সমান ক্ষতি হবে।

অরুণা।—বেশ, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। তোমার হাতে ওটা কি?

জোছু।—চিঠি, এইমাত্র পিওন দিয়ে গেল।

অরুণা।—কার চিঠি?

জোছু।—দাদার নামে এসেছে।

অরুণা চিঠিটাকে হাতে নিয়ে একবার দেখলো।—এ যে শিশির-বাবুর হাতের লেখা মনে হচ্ছে! তাই নয় কি?

জোছু উত্তর দিতে একটু দেরি করে বললো।—হতে পারে।

অরুণা যেন পরীক্ষকের মত জোছুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললো—তুমি জেনেও সত্যি কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলে না জোছু।

কথাগুলির মধ্যে সমবেদনার স্পর্শ ছিল না বলেই বেশ একটু রূঢ় শোনালো।

ছেলেটার মাথাটা শুকনো নারকেলের মত, গলাটা দড়ির মত, তার

নীচে মাছের কাঁটার মত ছোট ছোট পাঁজরা। রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টের নীচে মাটির ওপর একটি শিশুর মূর্তি বিষন্নভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিল। পাশে একটা নোংরা কাঁথার পুঁটুলি আর হাঁড়ি। অল্প একটু ভাতের ফেন হাঁড়ির তলায় থিতিয়ে আছে। মাছির ঝাঁক হাঁড়ির উদরে উৎপাতের সুখে ভন্ ভন্ করছে। শিশুটির চেয়ে হাঁড়িটাকেই বেশী জীবন্ত মনে হয়।

আয়ুর সলতে পুড়ে ক্ষয়ে এসেছে। শিশুটির চোখে সেইরকম একটা নিভন্ত প্রদীপের বিষন্নতা। তালুর মাঝখানে একটা ঘা, মাছির কামড় থেকে পরিত্রাণের আশায় মাঝে মাঝে হাত তুলতে চেষ্টা করে। দেয়াল ঘড়ির কাঁটার মত লিক্‌লিকে হাতটা আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে—উঠতে চায় না। ছেলেটার সামনে একটা ঠোঙায় খানিকটা রান্নাকরা তরকারি কে জানি ফেলে দিয়ে গেছে। দুটো কাক লাফঝাঁপ দিয়ে বারবার এসে ঠোঙাটা উল্টে দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ছেলেটা একবার প্রতিবাদের সুরে কাঁদবার চেষ্টা করলো। ড্রেনের ইঁদুরের আর্তনাদের মত সেই কান্নার শব্দ কাছে দাঁড়িয়েও শোনা যায় না। দশদিক জুড়ে কলকাতার কাজের ফুসফুস সগর্জনে দপ্ দপ্ করছে। ট্রাম বাস দৌড়য়, রিক্সা গাড়ি ছুটে যায়, এক একটি দোকানের অদৃশ্য স্বরনালী থেকে রেডিওর সাঙ্গীতিক হর্ষ সেই শব্দের তাণ্ডবে নতুন মাতান্ সৃষ্টি করে। ল্যাম্পপোস্টের নীচে ছেলেটা এক একবার মুখ বিকৃত করে কেঁদে ওঠে—উদ্বাস্তু কলকাতার পায়ের তলায় পড়ে যেন একটি দলিত শিশুর পরমায়ু আক্ষেপ করতে থাকে।

সব কাজ ভুলে বিপিন ল্যাম্পপোস্টের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। চোখের দৃষ্টিতে একটা রিক্ততা, মনের ভেতর একটা বাঘিনীর প্রাণ যেন হারানো শাবকের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। ছেলেটার কাছাকাছি

নিজের বলতে কোন লোক ছিলনা। টুনা যদি হঠাৎ আশি বছরের বুড়ো হয়ে যেত, কতকটা এইরকমই দেখাতো বোধ হয়। দুঃসহ একটা উত্তেজনায় হাবুডুবু খেয়ে বিপিন হাঁপিয়ে পড়ে। রাস্তার ওপারে বিপরীত ফুটপাতে কতকগুলি বিশ্রান্ত ট্যাক্সির আড়ালে বিপিন চুপচাপ বসে থাকে, যেন ওৎ পেতে শিকারী জানোয়ারের মত। ওই যদি টুনা হয়, তবে টুনার মায়ের দফা আজ এইখানেই শেষ। এইখানে হাজার লোকের ভিড়ের চোখের স্মুখে দাঁড়িয়ে টুনার মাকে ইঁট দিয়ে ছেঁচে শেষ করে দেবে বিপিন। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিপিনের চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যায়, ব্যথায় টন টন করে। কোন সন্দেহ থাকেনা—এ টুনা না হয়ে যায়না। এমন তাজা-গোটা ছেলেটাকে এভাবে আম্‌সি করে পথের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে যে, সেই রাক্ষসীর টুঁটি আজ শুধু একবার পাঁচ আঙুলের থাবার মধ্যে খুঁজছে বিপিন। সেই পরম প্রতিশোধের মুহূর্তটিকে মনপ্রাণ দিয়ে সে জপতে থাকে। দাঁতে দাঁত পিষতে থাকে। পথের শব্দ আলো গতি সব মুছে গিয়ে একটা কুহেলিকার ঘোর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করে নেমে আসে। টুনার মূর্তিটা কাকের পালকের ফাত্‌নার মত তারই মধ্যে যেন ভাসতে থাকে। পেঁকো জলের বানের মত এই হাভাতে জনতার স্রোতে কোথায় ঘাই দিয়ে ফিরছে টুনার গর্ভধারিণী? কিসের আশায়? কোন্ সাধে? বিপিন বুঝে উঠতে পারছিল না কিছু। কিন্তু সে আসবে নিশ্চয়। টুনার ক্ষিধে পেয়েছে—কাঁদছে। আর কতক্ষণ বা সে দূরে দূরে থাকবে?

কাছে গিয়ে টুনার নাম ধরে একবার ডাকতে পারলো না কেন বিপিন? ইচ্ছে থাকলেও বিপিন পারলো না। ওর বিশ্বাস, ডাক শুনেই ছেলেটার প্রাণপাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। ছেলেটার ধড়ে আর সাড়া দেবারও কোন শক্তি নেই।

দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কতক্ষণ বসেছিল বিপিন তা সে জানেনা। যখন মুখ তুলে তাকালো, তখন বেলা অনেক বেড়ে গেছে। ট্রামের দৌড়াদৌড়ি বিরল হয়ে এসেছে। লাইনম্যানটা শাবল হাতে গাছের ছায়ায় টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছে।

বিপিনের বুকের ভেতরটা আচম্‌কা ধড়াস্ করে লাফিয়ে উঠলো। ফাত্‌না নড়েছে—একটি স্ত্রীলোক টুনাকে কোলে তুলে নিচ্ছে। বিপিন তিন লাফে রাস্তাটা পার হয়ে স্ত্রীলোকটির সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। কোন্ জাতের তা সহজে ঠাহর করা যায় না। স্ত্রীলোকটির কোঁচড়ের ভেতর থেকে কলাপাতার একটা টুকরো উঁকি দিচ্ছে—বোধ হয় এঁটো ভাত তরকারি বাঁধা। কোঁচড় চুঁইয়ে ঝোল পড়ছে টপ্ টপ্ করে।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে প্রায় স্ত্রীলোকটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিপিনের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো।—এই ছেলেকে তুমি পেলে কোত্থেকে গো মেয়ে?

চম্‌কে বিপিনের মুখের দিকে স্ত্রীলোকটি তাকিয়ে রইল। বিপিনের গলায় কালো স্থতোর তাগাটার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি বিবর্ণমুখে রোগীর মত আস্তে আস্তে বার কয়েক কেঁপে উঠলো। পর মুহূর্তেই খেঁকিয়ে উত্তর দিল।—কিরকম কথা গো তোমার? ছেলেকে পাব আবার কোথা থেকে। আমার ছেলে।

বিপিন ডাকলো—টুনা।

ছেলেটির শীর্ণ ঘাড়ের পেশীগুলিতে যেন চকিতে একটা বিদ্যুতের শক্ লাগলো। দু'চোখে সজীব দৃষ্টি তুলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলো বিপিনকে।

বিপিন ডাকলো—আয় টুনা আয়।

টুনা যেন প্রত্যাঘাত খেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। স্ত্রীলোকটির কাঁধের হাড়টার ওপর ভারী মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে দু'হাতে আগ্রহে গলা জড়িয়ে ধরলো।

আতঙ্কিত টুনাকে যেন আশ্বস্ত করার জন্য আদর করে আস্তে আস্তে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো স্ত্রীলোকটি। তারপর ভৎ'সনার ভঙ্গীতে বিপিনের দিকে একটা চোখমুখের ভেংচি ছুঁড়ে সরে যাবার উদ্দেশ্যে অন্যদিকে পা বাড়ালো। পথ রুখে দাঁড়ালো বিপিন।—পালাতে দেব না গো ঠাকরুন। টুনার মা কোথায়, সেই খবরটা আগে বল।

ছেলেটাকে ধীরে ধীরে কোল থেকে নামিয়ে স্ত্রীলোকটি দাঁড়ালো। উত্তর দিতে গিয়ে একটা শঙ্কা ও দ্বিধায় তার গলার স্বর দু'বার হেঁচকি দিয়ে উঠলো।

বিপিন বললো—টুনার মা কোথায়?

স্ত্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে বললো—তুমিই কি টুনার বাপ?

স্ত্রীলোকটির চুলের ঝুঁটি খপ্ করে মুঠোর মধ্যে ধরে একটা ঝাঁকানি দিল বিপিন।—আমি তোরও বাপ। বল্ শীগগির।

স্ত্রীলোকটি।—হাঁ বাবা। টুনার মাও' হেথা আছে। তোমার কথাটা বলবো ওকে।

ঝুঁটি ছেড়ে দিল বিপিন।—আমার কথাটা বলতে হবেনি, ওর কথাটা বল্। কোথায় আছে?

স্ত্রীলোকটি কুপিতভাবে উত্তর দিল।—তা আমি কি জানি?

বিপিন।—তুই আমার ছেলে চুরি করেছিস।

স্ত্রীলোকটি।—চুরি? এখনো টুনার মা আমার কাছে তেরটি টাকা ধারে?

বিপিন।—কিসের ধার?

স্ত্রীলোকটি।—তোমার মাগ টাকা ধার নিয়েছে গো। আমি টুনাকে জমা নিইছি। টাকা শুধে দাও, ছেলে নিয়ে যাও। আমি কারও গালি শুনবার বাঁদী নই।

স্ত্রীলোকটি কঠোরভাবে কথাগুলি শেষ করে টুনাকে মরা মাছের মত এক হাতে তুলে ধরলো।—ছেলে ছেলে কি করছো, এই নাও ছেলে। হাঁ, আমার টাকাটি শুধে যাও বাপ। নইলে আমিও সাপের মত পিছু নেব। কেওটানীর সাথে লাগতে এস না বাপু।

বিপিন।—তোমার নাম পুনি?

স্ত্রীলোকটি।—হাঁ গো হাঁ, আমিই তোমাদিগের পুনি কেওটানী। শ্যাম স্যাক্‌রা বলে কেউটেনী—জান তো? তা বলুক গিয়ে। এখন কেউটেনীর টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে চলে যাও, ছেলেকে বুকে তুলে নাও। কেউটেনীও আর ফোঁসটি করতে যাবেনা।

পুনি কেওটানীর হাতে ঝুলতে ঝুলতে টুনা চিঁ চিঁ করে কাঁদতে লাগলো। টুনাকে মাটির ওপর বসিয়ে দিল পুনি। হতভম্ভ হয়ে তাকিয়েছিল বিপিন। পুনি কেওটানী রঙ্গ করে গলার স্বর দুলিয়ে দুলিয়ে বললো—কই গো? মরদ হয়েছ মুরোদ নাই কেন? টাকা দাও, ছেলে নিয়ে যাও।

নিষ্প্রাণ মাটীর মূর্তিটির মত নিরুত্তর বিপিন শুধু তাকিয়েই ছিল। পুনি কেওটানীর অঙ্গভঙ্গী উদ্দাম হয়ে উঠলো, কণ্ঠস্বর ততোধিক। এক দুর্বোধ্য নাটকের তিনটি কুশীলবের মত পুনি বিপিন ও টুনা রাসবিহারী এভেনিউয়ের ফুটপাথের একপাশে অভিনয় জমিয়ে তুলেছিল। ছোট একটা ভিড় একটা জমাট উপসংহার আশা করে উদ্‌গ্রীব হয়ে আসর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পুনি কেওটানীর মুখটা শেয়ালের মত দাঁত খিঁচিয়ে বিদ্রূপ করলো।—কি রে আবাগীর ছেলে? বড় যে

তেড়েমেরে ঝুঁটি ধরেছিলি? নে, এইবার টাকা শুধে দিয়ে ছেলে নিয়ে যা।

বিপিনের হুঁস ফিরে এল। চারদিকে তাকালো। একটা দায়রা জজের আদালতে আসামীর কাঠগড়ার মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে আছে বিপিন। পুনি কেওটানীর নির্লজ্জ সওয়াল ও নিষ্ঠুর জেরায় বিপিনের অন্তরাত্মা খান্ খান্ হয়ে ছিঁড়ে পড়ছিল। মনের ভেতর লুণ্ঠিত যত সাহস ও মর্যাদা আবার টেনেটুনে সংযত করে নিয়ে জবাব দিল বিপিন—এখন টাকা নাই। তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি।

পুনি কেওটানী দর্শকদের ভিড়টাকে যেন সাক্ষী মেনে নিয়ে ঘোষণা করলো—তোমরা শুনে রাখ বাবুরা।

বিপিন।—কী টাকার ভয় দেখাচ্ছিস্? এখুনি টাকা নিয়ে আসছি।

পুনি।—নে, তোর ছেলে নে। আমি টাকা চাইনা। নে, নে, শীগ্গির নিয়ে যা তোর ছেলে।

দর্শকেরা নাটকের বিষয়বস্তুটি অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছিল। তারা বুঝেছিল, কোন্ এক অভাগিনী পেটের দায়ে ছেলে বন্ধক রেখে তেরটি টাকা ধার নিয়ে গেছে যার কাছ থেকে, পুনি কেওটানী নামে এই স্ত্রীলোকটি সেই মহাজন। পুনি কেওটানীর মত দরিদ্রার হৃদয়ের মহিমা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কি স্বার্থ আছে পুনির? এই বিচিত্র তেজারতির পেছনে পুনি কেওটানীর শুধু উদারতাটুকুই বড় হয়ে চোখে পড়ে। সুদ নেই, লাভ নেই, উল্টো ছেলেপোষার খরচ। গাঁটের কড়ি খরচ করে ফুটো কলসী কিনেছে পুনি। তার ওপর, সব কিছু সন্দেহ ও অপবাদকে চরমভাবে মিথ্যে করে দিয়ে পুনি কেওটানী শেষ পর্যন্ত সুদমূল সবই ছেড়ে দিতে চাইছে।

বিপিনের দিকে দৃপ্তভাবে তাকিয়ে পুনি আবার গর্জন করলো—নিয়ে যা ছেলে। তাকিয়ে দেখছিস্ কি ?

যেন ফাঁসিকাঠের সামনে দাঁড়িয়েছিল বিপিন। পুনির ধমক শুনেও কোন সাড়ার চিহ্ন দেখা গেল না। চারিদিকের ভিড় বড় কড়া রকম ঠেসে রয়েছে—পালাবার ফাঁক নেই। বিপিনের পিতৃত্বের স্পর্ধা পুনির হাতে হঠাৎ একটি মারাত্মক খোঁচা খেয়ে সন্ত্রস্ত চোরের মত মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

সের পাঁচেক ওজনের একটা হাড়চামড়ার মূর্তিকে সামনে ঠেলে দিয়ে পুনি কেওটানী তখনো হাঁক দিচ্ছিল—নিয়ে যা তোর ছেলে।

হেঁটমুখে মাটীর দিকে তাকিয়ে বিপিন তার ভীরু চোখের দৃষ্টি লুকোবার চেষ্টা করছিল।

পুনি কেওটানী দর্শকদের মনস্তত্ত্বে ওস্তাদ বাজিকরের মত একটা মোচড় দিল।—দেখছো বাবুরা ? স্বচক্ষে দেখে নাও। নিজের ছেলেকে নিতে চাইছেনা।

বাপ না পিশাচ ? মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের আক্রোশ সরবে গর্জন করে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললো। এক পশলা চড় ঘুসি ও লাথির বৃষ্টি ঝরে পড়লো বিপিনের ওপর।

ভিড় ভাঙলো। গামছাটা দিয়ে ধীরে ধীরে নাকের রক্ত মুছে ফেললো বিপিন। একটা পাহারাওয়ালা পুলিস হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে দেখে পুনি চট্ পট্ টুনাকে কোলে তুলে নিয়ে সরে পড়ার জন্য পা বাড়ালো। বিপিন বললো—পালিয়ো না পুনিদিদি। টুনার মাকে একবার খবর দিয়ে নিয়ে এস।

পুনি চলে যাবার আগে আর একবার মুখ ঝাম্টা দিল—হাঁ, আসবে টুনার মা, ঝাড়ু হাতে নিয়ে আসবে, এইখানে বসে থাক।

আমাদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে ডিসিপ্লিন একটু কড়া করতে হবে—কথা কয়টি একনিশ্বাসে ছেড়ে দিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলাল আশ্রমমাতার মত বাৎসল্যভরা আবেগ নিয়ে প্রকাশবাবুর দিকে তাকালেন।

প্রকাশ বাবু উত্তর দিতে গিয়ে আশ্রমপিতার মত একটা স্নেহপ্রবণ উদ্বেগ নিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কথা ভুলে গেলেন।

জয়ন্ত মজুমদার বললো।—লোকটার নাম অবনীনাথ।

সিতা চমকে উঠলো।—অবনীনাথ ?

ইন্দ্র বললো।—আমার বন্ধু অবনীনাথ।

প্রকাশবাবু কাশলেন।—হ্যাঁ, এই অবনীনাথ আমাদের কয়েকজন কর্মী ছেলেমেয়েদের মনে বিষ ঢুকিয়েছে।

সংঘের ধর্মতলা শাখা-অফিসের বিবরে হৈমন্তী বিকালের ঘোলাটে আলোর মধ্যে কার্যকরী কমিটির দুশ্চিন্তার ভার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে রইল। প্রকাশবাবু সজীব হয়ে উঠলেন।—পার্টির নির্দেশ সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশের একতিল ব্যতিক্রম হলে কোন কর্মীর এখানে স্থান নেই।

ইন্দ্রনাথ যেন এই ধরণের একটা উক্তির প্রতীক্ষায় দম ধরে ছিল। কৌতূহলের তীব্রতা চাপতে না পেরেই বলে উঠলো।—পার্টি ? কোন্ পার্টির নির্দেশ ? কিসের নির্দেশ ?

ইঙ্গিতে ইন্দ্রকে শান্ত করে প্রকাশবাবু বললেন।—ডাক্তার গোপ্‌ড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো এক কপি করে সব কর্মীদের দিয়ে দেওয়া হোক্। অক্ষরে অক্ষরে এই নির্দেশ মেনে চল্‌তে হবে। এর মধ্যে কোন প্রশ্নের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

বিস্ময় সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছিল ইন্দ্রনাথের। একটু বেহায়ার মত সভাঘরের স্থৈর্য উত্যক্ত করে ইন্দ্রনাথ আবার বললো।— ম্যানিফেস্টো? কেন? কিসের জন্য?

প্রকাশবাবু সভাস্থ জনতার সবাইকে উদ্দেশ্য করে ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন।—আমাদের বিশ্বস্ত কমরেড ইন্দ্রনাথের মনে কতগুলি গোলমাল রয়ে গেছে। আমার মনে হয়, আরও অনেকের মধ্যে এই রকম চিন্তার সংকট দেখা দিয়েছে। কর্মীদের মধ্যে এই সব সংশয় ও প্রশ্ন কাজের পথে সব চেয়ে ভয়ানক বাধা। আপনারা জেনে রাখুন সবাই, ইন্দ্রনাথ ভাল করে শুনে রাখ……।

ঢোঁক গিলে নেবার পর প্রকাশবাবুর মূর্তিটা আরো কঠোর হয়ে উঠলো।—জেনে রাখুন, আমাদের পার্টির নাম কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টির ভয়ে হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র জাতিবাদী আত্মা দুঃস্বপ্নে আঁৎকে উঠছে। জাগৃতি সংঘ সেই পার্টির একটি বাহু। সব কাজের বড় কাজ, সব চেয়ে প্রথম কাজ —এই পার্টিকে বড় করা। আমাদের যতকিছু শ্লোগ্যান এই পার্টিকে বড় করার জন্যই। পার্টির প্রতিষ্ঠার পথে অন্য যেকোন দলের প্রভাবকে নৃশংসভাবে, ছলে বলে কৌশলে উপড়ে ফেলতে হবে। পার্টি আমাদের প্রাণ, পার্টি আমাদের আত্মা, পার্টি আমাদের সমাজ। আমরা পার্টির গান গাইবো, পার্টির ছবি আঁকবো, প্রেমে-প্রণয়ে পার্টির মানুষকেই দোসর করে নেব। পুরাতন পৃথিবীর মানুষের কাছে এই আদর্শ অদ্ভুত লাগবে, তারা নিন্দে করবে। করুক, আমরা নতুন পৃথিবী তৈরি করতে চলেছি, সুতরাং আমাদের পার্টির মতপথনীতি সবই নতুন হবে। পার্টির অন্যতম প্রিয় নেতা ডাক্তার খোপড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো আমাদের কাছে বেদ বাইবেল কোরানের মত। পার্টির কর্মীদের শুধু সৈনিকের মত এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে—They are not to reason why।

প্রকাশবাবুর বক্তৃতার সুরে শম পড়লো। উর্মিলা কাঞ্জিলাল বললেন —সুতরাং আমাদের ছেলেমেয়েরা……।

জয়ন্ত মজুমদার ধুয়া ধরে বললো—অবনীনাথকে চিনতে শিখুক ……।

প্রকাশবাবু ড্যাশ পূরণ করে দিলেন —……সে একজন পঞ্চমবাহিনী ফ্যাসিস্ট এবং সবার ওপর কম্যুনিস্ট পার্টি তথা জাগৃতি সংঘের শত্রু।

কথাগুলি ইন্দ্রনাথের বুকেপিঠে যেন ঘাতকের ছুরির মত কুপিয়ে চলেছিল। সমস্ত অন্তর একটা ক্ষোভে ও আতঙ্কে রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল। মরিয়া হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে মনের সব প্রতিযুক্তি প্রতিবাদ ও সংশয় চেপে, তবু বেহায়ার মত চেঁচিয়ে উঠলো ইন্দ্রনাথ।—এ কি রকম কথা প্রকাশবাবু? বলুন, কেন অবনীনাথ আপনাদের শত্রু? কেন তাকে ফ্যাসিস্ট বলছেন? কেন তাকে পঞ্চমবাহিনী বলতে আপনাদের একটুও বাধছে না?

ইন্দ্রনাথের কানের দিকে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রকাশবাবু সমস্ত পার্থিব সত্যকে যেন দাঁতের কামড়ে উল্টে দিলেন।—অবনীনাথ কংগ্রেসের লোক। এই কংগ্রেস আমাদের পার্টির পথে সব চেয়ে বড় বিঘ্ন।

ইন্দ্রনাথ যেন ডুবন্ত মানুষের মত চীৎকার করতে লাগলো—প্রকাশবাবু, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু কি বলছেন আপনি? কংগ্রেস আমাদের পথের বিঘ্ন? কি অপরাধ করলো কংগ্রেস? কই, আপনারা তো আজকাল একথা লেখেন না। আপনারাই তো কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবি করেন!

প্রকাশবাবু।—অনেক কিছুই মুখে বলতে নেই, খুলে লিখতে নেই। একটু তলিয়ে বুঝতে শেখো ইন্দ্র।

অভিভাবকের হাতে চড় খেয়ে অতি দুরন্ত ছেলেও পরিত্রাণের জন্য

ক্ষণকালের মত সব উপদেশ শিরোধার্য্য করে নেয়। ইন্দ্রনাথ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উত্তর দিল।—হাঁ, বুঝতে পারছি প্রকাশবাবু। জনযুদ্ধ থিওরি আগে বুঝতে পারিনি, আজ সবই স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমাকে মাপ করবেন, আমি সব বুঝতে পারছি।

ইন্দ্রনাথের অবস্থা দেখে উর্মিলা কাঞ্জিলালের করুণা হচ্ছিল। পাশের আসনে সিতা বসুর অন্যমনস্কতা ভেঙে দিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলাল চাপাস্বরে বললেন।—যত সব আন্‌কোরা গোঁয়ারগোবিন্দ নিয়ে প্রকাশবাবুর কারবার!

প্রকাশবাবু।—আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি এখনো বুঝতে পারনি ইন্দ্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথাটা তোমার খুব খারাপ লাগছে। তোমার ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেণ্টে বাধছে।

ইন্দ্র।—আজ্ঞে না প্রকাশবাবু, আমি সব বিশ্বাস করছি।

প্রকাশবাবু হেসে ফেললেন।—উঁহু, তুমি চেপে যাচ্ছ ইন্দ্র।

ইন্দ্র।—আজ্ঞে না।

ইন্দ্রনাথ মিথ্যে বলেনি। জাগৃতি সংঘের অনেক কথার মর্ম বুঝতে তার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যেত। সংঘ অফিসের এই বৈকালী বৈঠকটি সব রহস্য ভঞ্জন করে দিয়েছে। দেশের শত্রু কংগ্রেস—এই কষ্টিপাথরটি দিয়ে এখন সংঘ-মতবাদের সব সোনাগুলি একের পর এক ঘষে যাচাই করে নিতে পারা যায়। ইন্দ্রনাথের ক্লান্ত মস্তিষ্কের স্নায়ুপথে ডাক্তার খোপ ড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো যেন একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের মত হু হু করে দৌড়ে যাচ্ছিল। বিচিত্র তত্ত্বে বোঝাই এক একটি কাম্‌রা। কাম্‌রার দরজার গায়ে এক একটি উদ্ভট শ্লোক লেখা—'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য' 'জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা', 'আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার কর', 'যুদ্ধোদ্যোগে সাহায্য কর', 'পাকিস্তান চাই'।

পার্টির পথের কাঁটা কংগ্রেস—ভাবতে গিয়ে যেন একটা ধূলোর ঝাপ্টা ইন্দ্রনাথের চোখে এসে লাগে। চোখ ঘসে নিয়ে ভাল করে তাকাবার চেষ্টা করে। চমকে ওঠে ইন্দ্র। রহস্যটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডাক্তার খোপ্ড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টোটা ঠিক ম্যানিফেস্টো নয়—একটা হুকুমনামা, একটা সার্কুলার। ঠিক স্পেশ্যাল ট্রেন নয়—লাটের স্পেশ্যাল।

—আমাদের ছেলেমেয়েরা···উর্মিলা কাঞ্জিলাল আশ্রমমাতার মত আবার বললেন। ইন্দ্রনাথ রুদ্ধ নিশ্বাসটাকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বসলো। সভায় কাজের প্রোগ্রাম আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মজুমদার একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। তারই ওপর নির্ভর করে একটা কর্মপন্থা আবিষ্কারের জন্য আজকের জরুরী বৈঠক আহূত হয়েছে।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন।—আর দেরি করা যায় না। আমাদের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে। স্কোয়ারের সভার সময় হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মজুমদার।—আমি এইবার আরম্ভ করি··· অবনীনাথ নামে কংগ্রেসের একটি দালাল কাঁকুলিয়া রোডে থাকে। রীতিমত ধূর্ত লোক। খুব সম্ভব সে একটি দল পাকিয়েছে। কতকগুলি এক্স-টেররিস্ট ছেলে তার সহায় হয়েছে। অনেক নতুন রিক্রুটও সংগ্রহ করেছে। মফঃস্বলের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে লোক্যাল কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বেশ ভালভাবে অর্গানাইজ করছে। মার্কেটের কণ্ট্রোলের লাইনে ও লঙ্গরখানাগুলিতে লোক রেখে ঘাঁটি তৈরী করেছে। সব চেয়ে সাংঘাতিক হলো, লোকটা পাঁচ হাজার নিরন্নকে নিয়ে দল পাকিয়ে একটা সত্যাগ্রহ করার ষড়যন্ত্র করেছে। অ্যাসেম্ব্লী হাউসের ফটকে,

প্রত্যেক মার্কেটে, লাটভবনের ফটকে, মিনিস্টারদের বাড়ির সামনে ওরা দল বেঁধে শুয়ে থাকবে। চাল না পেলে নড়বে না। এক কথায়, অবনীনাথ একটি ভয়ানক রকমের এনার্কি সৃষ্টির প্ল্যান এঁটেছে।

রিপোর্টের প্রথম অধ্যায় শেষ করে জয়ন্ত একটু জিরিয়ে নিল।—আর একটি খবর আছে, সে বিষয়ে একটু নির্ভুল হয়ে নিয়ে তারপর কমিটিকে জানাবো।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল।—বেশ তো, খবরটার একটু আভাস এখনি দিতে পারেন।

জয়ন্ত।—অবনীননাথ গাঁয়ে গাঁয়ে গাইয়ে প্রচারক পাঠাতে আরম্ভ করেছে! জমি আর ফসলের ব্যাপার নিয়ে চাষাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ গোছের গোলমাল বাধাবার উদ্দেশ্যে······।

হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা বরাভয় দৃষ্টি দিয়ে সিতার দিকে যেন গোপন আশ্বাস ছুঁড়ে জয়ন্ত আবার বলে চললো।—আজ এ বিষয়ে বেশী কিছু আর বলতে চাই না। প্রয়োজন হলে সবই জানতে পারবেন।

জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে সিতার মুখ থেকে সব সজীবতার আভা মুহূর্তের মত নিঃশেষে মুছে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই চোখের তারা দুটো স্ফুলিঙ্গের মত একবার জ্বলে উঠে কুঞ্চিত হয়ে এল। উঠে দাঁড়ালো সিতা।—আমি এ বিষয়ে কিছুটা নির্ভুল খবর দিতে পারি। এই গাইয়ে প্রচারকটির নাম শিশির। কিছু করেনা, শুধু গান গায়।

বলতে গিয়ে সির্‌সির্‌ করে কাঁপছিল সিতা। আর কেউ না দেখুক জয়ন্ত ঠিকই দেখতে পেয়েছিল।

এরই মধ্যে কর্মীদের জন্য নির্দেশলিপি লিখে শেষ করেছেন প্রকাশ বাবু। ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল বললেন—অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে

আমাদের কর্মী ছেলেমেয়েরা আর কতক্ষণ একা একা মিটিং চালাবে? এখন ওঠা উচিত।

প্রকাশবাবু উঠলেন। যেতে যেতে গম্ভীরভাবে বললেন।—তোমার বন্ধু অবনীনাথকে আর বাঁচাতে পারলাম না ইন্দ্র!

ইন্দ্র বোকার মত না বুঝেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।—অবনীকে কি করতে চাইছেন আপনারা?

প্রকাশবাবু।—অবনীকে পথ থেকে সরাতে হবে।

ইন্দ্র।—মারধর করবেন নাকি?

প্রকাশবাবু।—অবনীর প্ল্যান সব চূর্ণ করবো। কর্মীদের কাছে আজ এই নির্দেশ দেওয়া হবে। ফ্যাসিজ্‌মের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লোপাট করে দিতে হবে। তুমিও এবার থেকে একটু সাবধান হয়ে যাও ইন্দ্র। অবনীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা কিছুদিনের জন্য শিকেয় তোলা থাক্। নইলে, তোমার কাজের অসুবিধা হবে।

আহত ও অসহায় জীবের মত ধড়টাকে কোনমতে দু'পায়ে গড়িয়ে নিয়ে সংঘবন্ধুদের সঙ্গে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। জনযুদ্ধের প্রথম কামান নল উঁচিয়ে তাক করেছে প্রথম শত্রুর দিকে—অবনীনাথের হৃৎপিণ্ডের দিকে।

জনযুদ্ধ কি জয়! সভাস্থলের দিক থেকে উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তালগাছের কোটরে ঘুমন্ত পেঁচা জেগে ওঠে, বিরক্তভরে উঁকি দিয়ে দেখে।

সকলে এগিয়ে গেছে। স্কোয়ারের ফটকে পা এগিয়ে দিতেই পেছন থেকে কে ডাকলো।—ইন্দ্রবাবু।

ডাকছিল সিতা। ইন্দ্রনাথ থম্‌কে দাঁড়ালো। সিতা বললো।—

আপনার কাছে একটা দরকার ছিল। এখানে নয়। একটু অপেক্ষা করুন, গাড়িটা আসুক্।

সন্ধ্যের সার্কুলার রোডের আধো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সিতা বসুর গাড়ি দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছিল। নেপালী ড্রাইভারের ছোট ছোট চোখ দুটো অন্ধকারে বোধ হয় আরো ভাল দেখতে পায়। পথের এলোমেলো গাড়ি-ঘোড়া ও পথিকের মন্থর ভিড়গুলিকে সিতা বসুর পন্টিয়াকের স্পীড লঘু গ্যাসের কুণ্ডলীর মত অবাধে তুচ্ছ করে, ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। দু'পাশে দোকানগুলিতে ও থামের গায়ে জোনাকির গায়ের আঠার মত ঠুলি-পরা প্রদীপের নির্জীব ছটা যেন অন্ধকারের গাম্ভীর্যকে চিমটি কাটছিল। এর নাম ব্ল্যাক-আউট—সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নাগরিক জীবনের বর্ণশব্দছন্দ ভুসো মেখে ছদ্মমূর্তি ধরবে, কোমর-ভাঙা জীবের মত হামা দিয়ে এক অন্ধকারের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়বে। শক্রর সন্ধানী দৃষ্টি যেন শিকারের টিকিটিও দেখতে না পায়। দফায় দফায় কড়া আইনের ধম্কানি আলোকবিলাসী নাগরিকের সব চপলতা বন্ধ করে দিয়ে সংযম শিখিয়েছে। চাদর ঢাকা দিয়ে বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাবধানী পথিকের গোঁপ পুড়ে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই এক লাফে পথের পাশে সরে যেতে হয়—একটা মিলিটারী লরীর প্রবাহ উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে হেডলাইটের সুতীব্র আলোকের ছটায় ক্ষণিকের জন্য সন্ত্রস্ত পথ গলি ও অট্টালিকার কালো বোরখার লজ্জা ছিঁড়ে পড়ে। গোঁফপোড়া পথিকের ক্ষোভ নিঃশব্দে আইনের কেরামতিকে ধিক্কার দিতে থাকে।

সিতা বসুর গাড়িটাকে দেখাচ্ছিল অ্যাম্বুলেন্স কারের মত পেছনের সীটের দুই কোণে দুই আহত মানুষ অসাড়ভাবে পড়ে আছে-

সিতা আর ইন্দ্র। ল্যান্সডাউনের দিকে মোড় ফেরার জন্য গাড়িটা একটু কাৎ হতেই পাশের লাইট-পোস্টের শীর্ষ থেকে এক মুঠো আলোকের বিবর্ণ আবীর গাড়ির ভেতর ছিটকে এসে পড়লো। সিতা দেখলো, ইন্দ্র তার কপালটাকে এক হাতে টিপে নিঝুম হয়ে বসে আছে।

অনেকক্ষণ দ্বিধা করার পর সিতা বললো।—এতক্ষণ নিশ্চয় বন্ধু অবনীনাথের কথা ভাবছিলেন।

ইন্দ্র সাড়া দিল।—না, নিজের কথাই ভাবছিলাম।

সিতা।—অগত্যা কি করবেন, সেই কথাটাই বোধ হয় ভাবছেন।

ইন্দ্র।—এ প্রশ্ন আপনার মনে কেন আসছে?

সিতা।—অবনীবাবুকে বাঁচাতে হবে।

ইন্দ্র একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলো না। অবনীকে বাঁচাবার জন্য মাথাব্যথা আর যারই থাক, সিতা বসু নামে এই সংঘচারিকা ধনী দুহিতার পক্ষে সেটা একান্ত অস্বাভাবিক। সিতা বসু তাকে জীবনে দেখেওনি বোধহয়। অবনী কি বেতারে প্রভাব বিস্তার করছে? আজকের বৈঠকে প্রকাশবাবুর পার্টিবাদের ব্যখ্যা শুনে কয়েকজন কর্মীর মুখে মেঘলা দিনের মত একটা গুমোট দেখা দিয়েছিল, তাও লক্ষ্য করেছে ইন্দ্র। একটা খুশিমাখা হিংসা অগোচরে ইন্দ্রনাথের মনের ভেতর ঢুকে যত পুরণো অভিমান ও ধারণার দাম্ভিকতাকে অবজ্ঞাভরে ছোট করে দিচ্ছিলো।

ভাবতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ছিল ইন্দ্র। অবনীর কথা আজ নতুন করে মনে পড়ছে তা নয়; প্রায়ই যেন মনে পড়তো। দুঃখ হতো—

তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।

অবনী সেখানেই থেমে আছে। জাগৃতি সংঘের মতবাদের প্রসাদে এ কয়টা মাস অবনীনাথকে শুধু মনে মনে করুণা করছিল ইন্দ্র। এই গোলকীয় যুদ্ধে পুরাতন জীবনের সব স্বস্তিবাদ উপড়ে পড়ছে, পাল্টে যাচ্ছে। সংকটের পর সংকট দেখা দিচ্ছে, নতুন কাজের আহ্বান আসছে। ঠিক সেই সময় অবনীনাথ যেন ফুরিয়ে গেল। বড় আপসোস নিয়ে সেদিন অবনীর বাসা থেকে চলে গিয়েছিল ইন্দ্র।

আজ ভাবতে গিয়ে অলক্ষ্য একটি গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল ইন্দ্র। এর কারণ কি, তা'ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। পুরণো সেপাই অবনীনাথ তাহ'লে থেমে যায়নি। ঠিক সময়মত ঘুম ভেঙে গেছে অবনীনাথের। ঠিক বুঝেছে অবনীনাথ—ক্ষুধার্তের জিহ্বাকে প্রার্থনাস্তোত্র শিখিয়ে কোন লাভ নেই। মিনতি করলে মৃত্যু দূরে সরে যায় না—প্রতিরোধ করতে হয়। জয়ন্ত মজুমদারের রিপোর্টটা এক নিমিষে ইন্দ্রনাথের একটা গর্বকে আরও উদ্ধত করে দিয়েছে—তারই বন্ধু অবনীনাথ। বর্ণে বর্ণে সত্য হোক্ জয়ন্ত মজুমদারের রিপোর্ট।

গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের চিন্তা থেমে গেল। প্রাসাদের মত বিরাট ও সুশ্রী একটি বাড়ির ফটকের সামনে গাড়িটা দাঁড়ালো। সিতা বললো—নামুন।

হলঘরের ভেতর ঢুকতেই অনেককে দেখামাত্র চিনতে পারলো। সিতার জন্মদিনে এঁরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ঐ যে উনি, সেই বৃদ্ধ ডাক্তার মুখার্জি। বিশেষ করে ব্যাঙ্কার কালীকিংকরবাবুকে আগে চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কালীকিংকর বাবুর বেশভূষার একটা নূতনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাঁর খদ্দরের সাজ।

—আসুন আসুন। ইন্দ্রনাথকে দেখে অভ্যর্থনা-বাণী উচ্চারণ

করলেন গৃহস্বামী কালীকিংকরবাবু, কিন্তু প্রশ্নভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলেন সিতার দিকে।

সিতা বললো।—হাঁ মেসোমশাই, ইনি ইন্দ্র বাবু, অবনীনাথের একজন বন্ধু।

এখানেও অবনীনাথ! অবনীনাথের নাম কি পাখির ডাকে, বাতাসের দোলায় আর জলের স্রোতে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে? সবাই মিলে কি ঐ নামটি শেষে জপতে আরম্ভ করবে? বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ইন্দ্র।

কালীকিংকরবাবু।—আমরা আপনার সহযোগিতা চাই ইন্দ্রবাবু। আপনাকে বোধ হয় নতুন করে বলে দিতে হবে না যে, এখানে যাঁদের দেখছেন তাঁরা সবাই ন্যাশনালিস্ট। আপনার বন্ধু অবনীনাথও নিজেকে ন্যাশনালিস্ট বলে, সে নাকি কংগ্রেসের লোক; কিন্তু আমাদের উভয়ের ধারণার মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। এই পার্থক্যটাই একটা ভেদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভেদটা আবার একটা বিরোধে না দাঁড়িয়ে যায়। সেই জন্যই, একটা ব্যবস্থা করার জন্য আপনার সহযোগিতা চাই।

ইন্দ্র।—আপনার কথা আমি এখনও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।

কালীকিংকরবাবু।—আপনার বন্ধু অবনী যে-পথ ধরেছে, সেটা ভুল পথ। সেটা ন্যাশনালিজ্‌মের পথ নয়, সম্ভবত কংগ্রেসেরও পথ নয়।

ইন্দ্র।—তাই কি আপনারা একটা নির্ভুল পথ ধরতে চাইছেন?

কালীকিংকরবাবু।—হ্যাঁ, সেই জন্যই আপনার সহযোগিতা চাই।

ইন্দ্র চুপ করে রইল। কালীকিংকরবাবু সুকথকের মত তাঁর বক্তব্য টেনে নিয়ে চললেন।—আপনি জানেন যে, আমরা গভর্ণমেণ্টকে ছেড়ে কথা বলি না?

ইন্দ্র।—আজ্ঞে না, সে-খবর আমি রাখি না।

কালীকিংকরবাবু।—এই ধরুন, সিতার জন্মদিনের আসরে আপনাদের সঙ্গে আমার যে ডিবেট হলো, তাতে আমি যেসব পয়েন্ট তুলেছিলাম, সেগুলি কি ভুয়ো ?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে আমাদের একটি দায়িত্ব আছে, আপনি কি অস্বীকার করবেন ?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—দায়িত্ব থাকবে অথচ ক্ষমতা থাকবে না, এই অবিচার কি চুপ করে মেনে নিতে হবে ?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—দেশের লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ না খেয়ে মরে যাবে, এই দৃশ্য কি আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো ?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—সেই জন্য আমরা একটি আন্দোলন করতে চাই। দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যেও ভারতরক্ষা আইন এসে উপদ্রব করবে. ভেবে দেখুন, পরাধীনতার কোন্ স্তরে এসে আমরা পৌঁছেছি।

ইন্দ্র।—দেশের ব্যাঙ্কগুলির ওপর গভর্নমেণ্ট কি কোন জুলুম আরম্ভ করেছে ?

কালীকিংকরবাবু।—না, ব্যাঙ্কের ওপর নয়, চালের ওপর।

ইন্দ্র।—চাল ?

কালীকিংকরবাবু।—হাঁ।

ইন্দ্র।—সত্যিই আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না কালীকিংকরবাবু।

কালীকিংকরবাবু।—যখন দেখলাম দেশের লক্ষ লক্ষ গরিবের মুখের

ভাত নিয়ে ছিনিমিনি চলছে, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হলো। জানি, ইণ্ডাস্ট্রি, ব্যাঙ্কিং সাইন্টিফিক্ ফার্মিং সবই জানি। দেশের উন্নতির সব উপায় জানা আছে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য এই সব বড় বড় কথা আর কাজ স্থগিত রাখতে হবে। এখন কোন মতে দেশের চাল বাঁচাতে হবে, দেশের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ইন্দ্র।—সুতরাং আপনারা কি করতে চান?

কালীকিংকরবাবু।—আমরা কিছুটা করতে পেরেছি। এই সংকটে দেশের জনসাধারণের জন্য একটা খাদ্যের রিজার্ভ তৈরী করতে হবে।

ইন্দ্রনাথের ধৈর্যের কাঠিন্য হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত পেল।—বলেন কি মশাই? আপনারা কি তবে চাল স্টক করতে চাইছেন?

কালীকিংকরবাবু হেসে ফেললেন।—ঐ বাজারী বুলিটা একবার দয়া করে ছাড়ুন তো মশাই! স্টক করা মানে? ঐ কথাটার অর্থ কি? আমরা ব্যবসার জন্য ব্যবসা করি না। দেশের লোকের সেবার জন্য ব্যবসা। আপনারা বড় তাড়াতাড়ি ভুল বোঝেন। ব্যাপারটা চাল স্টক করা নয়। চালের রিজার্ভ তৈরী করতে চাই। ভগবান না করুন, জাপানীরা যদি হঠাৎ ভয়ানক রকমের একটা কাণ্ড করে বসে, তখন দেশের লোককে খাওয়াবে কে? প্রভুরা? প্রভুদের কথা আর বলবেন না।

ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কালীকিংকরবাবুর কথাগুলি বিষমাখা ছুঁচের মত ইন্দ্রনাথের বুদ্ধির গ্রন্থিগুলির মধ্যে ফুটছিল। একটা বীভৎস অবসাদ ঘিরে ধরছিল ইন্দ্রকে। মজুতদার! এতদিন মজুতদার বলতে গড়পারের শ্রীনাথ মুদির মত একটা গামছাপরা মূর্খ মূর্তি মনের মধ্যে দেখা দিত। আজ ল্যান্সডাউন রোডের এই প্রাসাদের কক্ষে বসে মজুতদারী সিংহস্বরূপকে চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ইন্দ্র। শ্রীনাথ মুদিরা মজুতদারের ফেউ মাত্র। একটি লাথি মেরে তাদের হয়তো সরিয়ে দেওয়া

যায়, কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডের মর্মর কক্ষ এই 'জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির' ক্ষুরধার দুর্বুদ্ধির বিষ দাঁত ভাঙতে, নিখুঁত ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলতে, দুর্মদ মুনাফার লোভ শান্ত করে দিতে পারে, এমন সাধ্য কার? এরা ইচ্ছে করলে মাধ্যাকর্ষণ আইনকেও ঘুসের জোরে কিনে ফেলতে পারে বোধ হয়। ভারতরক্ষা আইন কোন্ ছার!

কালীকিংকরবাবু ততক্ষণে আবার আরম্ভ করেছেন।—আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, চালের রিজার্ভ তৈরী করলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? বুভুক্ষুরা খাবে কি? আমরা অন্ধ নই ইন্দ্রবাবু। এই কর্তব্যজ্ঞানটুকু আমাদের আছে। শহরে ষোলটি লঙ্গরখানা আমাদেরই উদ্যোগে চলছে। দৈনিক এগার হাজার নরনারীর মুখে ভাত দিচ্ছি আমরা। এর জন্য কোন প্রাইজ, কোন প্রতিদান আশা করি না আমরা।

ইন্দ্র।—একটা প্রশ্ন, ধরুণ এই চালের রিজার্ভটি তৈরী করলেন। তারপর তার সদ্‌গতি কিভাবে হবে?

কালীকিংকরবাবু।—আমাদের বিশ্বাস খাদ্য সংকট ভবিষ্যতে আরো কঠিন ও জটিল হয়ে উঠবে। তখন ······।

সৌজন্য ভুলে গিয়ে ইন্দ্রনাথের স্বর হঠাৎ মাত্রাহীনভাবে তিক্ত হয়ে উঠলো।—অর্থাৎ, চারশো পার্সেণ্ট প্রফিটেও পেট ভরছে না। আটশো পার্সেণ্ট চাই। আরও কয়েক হাজার গ্রামকে শ্মশান করা চাই। এক কথায়, এই সংকটকে একেবারে চরমে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

সন্দিগ্ধভাবে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কালীকিংকরবাবু বললেন।—এতক্ষণ কি আমি বৃথাই এতগুলি বাক্য ব্যয় করলাম ইন্দ্রবাবু। আপনার ভুল ভাঙেনি দেখছি।

সিতা বললো।—তর্কে কোন নিষ্পত্তি হবে না মেসোমশাই।

ইন্দ্রবাবুকে তর্কের মধ্যে টানবেন না। আসল কাজের কথাটা নিয়েই আরম্ভ করুন।

কালীকিংকরবাবু গলাঝাড়া দিয়ে চারদিকে তাকালেন। সিতা একটু ব্যস্ত হয়ে বললো।—আমি ভেতরে যাই, নইলে মাসীমা রাগ করবেন।

সিতা চলে গেলে ডাক্তার মুখার্জি পাকা ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়ালেন।—আমিও যাই, কাজের কথার মধ্যে আমি নেই।

কালীকিংকরবাবু অনুযোগ করলেন।—আপনি আমাদের কেস খারাপ করে দিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার মুখার্জি।

ডাক্তার মুখার্জি।—যাতে খারাপ না হয়, তাই সরে পড়ছি। সিতার জন্মদিনে একবার জাগৃতি সংঘের কেস খারাপ করেছি। ভয় হচ্ছে, আজ আবার আপনাদের ন্যাশানালিস্ট কেস খারাপ করে দেব। আমাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আমি নিজের কেস নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট আছি। ফী বাড়িয়ে দিয়েছি।

ডাক্তার মুখার্জি চুরুট ধরিয়ে চলে গেলেন। হাসতে চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

একটা অস্বস্তিকর নিঃশব্দতার মধ্যে কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ ক'রে জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির চেহারাটা ক্রমে সজীব হয়ে উঠলো। বঙ্গকল্যাণ ইনসিওরেন্স কোম্পানির নিমাই চ্যাটার্জি হাসলেন। আলকাত্‌রা মার্চেণ্ট হৃষীকেশ রায় কাশলেন। কুমার শুভেন্দুনারায়ণ চশমা জোড়া খুলে নিয়ে মুছলেন। শুধু বন্দে মাতরম্ গানটাই বাকী রইল।

কালীকিংকরবাবু বললেন।—আপনার বন্ধু অবনীনাথ কিন্তু ভয়ানক ভুল করছে ইন্দ্রবাবু। তাকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার আপনাকে দিতে চাই। এই জন্যই আপনার সহযোগিতা চাই

ইন্দ্র।—বলুন।

কালীকিংকরবাবু।—অবনীনাথ একটা সত্যাগ্রহ করবার প্ল্যান এঁটেছে। খবর পেয়েছি, ওর ভলান্টিয়ারেরা কয়েক হাজার ভিখিরী নিয়ে আমাদের স্টোরে ধর্ণা দেবে। এখন ভাবুন, অবনীর এই মতিচ্ছন্নতা কি করে দূর করা যায়!

ইন্দ্র।—এক্ষেত্রে আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি, বুঝতে পারছি না।

কালীকিংকরবাবু।—অবনীকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার ভার আপনার ওপর দিলাম।

জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির স্তম্ভ কয়টির দিকে কালীকিংকরবাবু একটা সংকেতপূর্ণ দৃষ্টি ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি নরসিংহের পকেট থেকে পাঁচটি চেক বই ও ফাউন্টেন পেন বের হয়ে এল। কিছুক্ষণ শুধু খস্‌খস্ কলমের শব্দ—আর কিছু শোনা যায় না। মূর্ছার মত একটা হতভম্বতার প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন ইন্দ্রনাথ ভাল করে তাকালো, তখন তার সামনে টেবিলের ওপর পাঁচটি চেক জ্যান্ত মাছের মত বাতাসে ফর্‌ফর্ করে নড়ছে। এক এক হাজার করে—সাকুল্যে পাঁচ হাজার।

কালীকিংকরবাবু অকপট সৌহার্দ্যের আবেগে গলা খুলে বলে যাচ্ছিলেন।—আপাততঃ এই নিয়েই অবনীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কুমার শুভেন্দুনারায়ণ তখনো মনোযোগ দিয়ে আর একটি চেক লিখছিলেন।

কালীকিংকরবাবু প্রশ্ন করলেন।—আর কেন?

কুমার শুভেন্দু।—সবাইকে যখন দিচ্ছি, যখন সরকারী আমলাগুলি পর্যন্ত দু'হাত ভরে নিয়ে গেল, তখন জাগৃতি সংঘই বা বাদ পড়বে কেন?

কালীকিংকরবাবু চেঁচিয়ে আপত্তি করলেন।—আরে না না। জাগৃতি সংঘকে ভয় করবার কিছু নেই। ওরা অত্যন্ত নিরীহ। অত্যন্ত ভীরু

এজিটেটারের দল। তা'ছাড়া ওদের নিজেদেরই তোফা গৌরী সেন রয়েছে, তার সঙ্গে দরে এঁটে উঠতে পারবেন না। ওরা আপনার চালের গোলা ঘিরে ধরতে আসবে না। ওরা ইস্তাহার বিলি করে, আবেদন করে, গালাগালি দেয়। আপনিও সেই ইস্তাহার দুহাতে তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিন। বাস্—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

কালীকিংকরবাবু মাতালের মত হাসতে লাগলেন।

বঙ্গকল্যাণ ইনসিওরেন্সের নিমাই চ্যাটার্জি বললেন।—হ্যাঁ একটা জার্নাল চালাবার যে প্রস্তাবটা ছিল, সেটা এবার…।

কালীকিংকর বাবু—হ্যাঁ, আর একটি কাজের কথা শুনতে হবে ইন্দ্রবাবু। আপনাকে জাগৃতি সংঘ ছাড়তে হবে; আমি জানি সেখানে আপনার মত ন্যাশনালিস্ট মন টিঁকতে পারবে না। সিতাও সেই কথা বলছিল। আপনাকে এই জার্নাল চালার কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

আল্‌কাত্‌রা মার্চেণ্ট হৃষীকেশ রায় কাশলেন।—জাগৃতি সংঘের কাজ্‌লামিকে আর বরদাস্ত করা যায় না। ওরা শুধু দেশের লোকের কাণে বৃটিশ-প্রীতির মন্ত্র পড়ছে। যত পাপের মূল নাকি আমরা—ন্যাশনালিস্ট ক্যাপিট্যালিস্টের দল।

কালীকিংকরবাবু—এর ওষুধ আমরাও জানি। আমরাও দেশের লোককে জোর গলায় এই সত্যটা বুঝিয়ে দেব যে, যত অনর্থের মূল বৃটিশ। দেখি, কে হারে কে জেতে? কি বলেন ইন্দ্রবাবু?

ইন্দ্র হঠাৎ সব ভব্যতার সংযম ভুলে গিয়ে স্পর্ধার স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—কিন্তু মশাই, কংগ্রেসী অবনীনাথের ন্যাশনালিজ্‌ম এখনও আপনাদের চেক স্পর্শ করেনি। সে যদি দেশের পথে হাটে মাঠে প্রচার করে বেড়ায় যে আপনারা ভুয়ো, আপনারা মিথ্যা, আপনারা দেশের শত্রু,

আপনারা শুধু আপনাদেরই জন্য। আপনারা না দেশের, না নেশনের, না বৃটিশের, না পৃথিবীর। অবনী যদি কংগ্রেসের নাম করে বলে, জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতি কারও মঙ্গলের জন্য নয়, তারা একটা প্রচণ্ড ছলনা। তারা একটা জুয়াড়ী সংঘ—ক্ষুধার্তের পাকস্থলী নিয়ে তারা ফাট্‌কা খেলছে…

কালীকিংকরবাবু উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন।—থামুন থামুন। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ইন্দ্র।—না, উত্তর দিন, আমি খোলাখুলি জানতে চাই।

কালীকিংকরবাবু—যদি তাই হয়, তখন অবনীনাথের সঙ্গে অপোষের দিনও শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরাও দেখে নেব, কে কংগ্রেস? অবনীনাথ, না আমরা।

ইন্দ্র।—তখনও যে অবনীর ওপর টেক্কা দিয়ে সুবিধা করতে পারবেন, এই বিশ্বাস কেমন করে পাচ্ছেন?

কালীকিংকরবাবু ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে বললেন।—তখন দেখে নেব, কে ন্যাশনালিস্ট? কংগ্রেস, না আমরা।

ইন্দ্র।—ধন্য আপনাদের দুঃসাহস। সেই শক্তিপরীক্ষার লগ্নটির অপেক্ষায় তৈরী হয়ে থাকুন। আমার আর কিছু বলবার নেই। সিতা বসুকে ডেকে এই চেকগুলি সঁপে দিন। এই দৌত্যের ভার তারই হাতে দিন। আমি উঠলাম।

সন্ত্রস্ত মক্ষিকার মত একটা ভয়াবহ মাকড়সার জাল ছিঁড়ে ইন্দ্রনাথ যেন উড়ে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে শুধু একটা কথা কানে ভেসে এল, যেই বলুক—বন্ধু অবনীনাথকে তাহ'লে আর বাঁচাতে পারলেন না ইন্দ্রবাবু।

ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে গুঁড়ো বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল। দিগ্বিদিক ঠাহর

হচ্ছিল না ইন্দ্রনাথের। অকারণে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে শুধু হন্ হন্ করে পথ ধরে হেঁটে চলেছিল। দৌড়তে পারলে বোধ হয় একটু সোয়াস্তি পেত। ভয় করছিল ইন্দ্রনাথের—জীবনের যা কখনো হয়নি। কলকাতার কপালে এই ব্ল্যাক-আউটের ভ্রূকুটি চিরকালের মত সত্য হয়ে থাক্, আর যেন সূর্য না ওঠে। ইন্দ্রনাথের বুকের ভেতরে শ্বাসবায়ু হঠাৎ শিউরে শীতল হয়ে যায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কে জানে কোন্ দুর্মুখ এই বার্তা কানে শুনিয়ে যাবে—অবনীনাথ খুন হয়েছে।

একটা ট্রাম চলে গেল। ভিজতে ভিজতে একটা জনাকীর্ণ পথে এসে পড়লো ইন্দ্র—পার্ক সার্কাস। একটা চলন্ত ট্রামে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ইন্দ্রনাথ। শুচিবাতিক মানুষের মত, যেন আজ বাংলাদেশের মাটীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাইছে সে। পার্ক সার্কাস থেকে এসপ্ল্যানেড, এসপ্ল্যানেড থেকে আবার শেয়ালদা—এক গন্তব্যহীন পরিক্রমায় শুধু পাক দিয়ে ইন্দ্রনাথ ঘুরতে লাগলো।

বিচিত্র এক অপরাধপুরীর মত দেখাচ্ছে কলকাতাকে। আলো-আঁধারী আবছায়ার মধ্যে মানুষগুলি ঘুর ঘুর করছে। শব্দ ছায়া স্পন্দন আলোড়ন—সবই কেমন সন্দেহজনক। তার মধ্যে কোন সদুদ্দেশ্যের ছন্দ নেই। মিথ্যা সত্য হয়ে উঠেছে—সত্য সর্বৈব মিথ্যা হয়ে গেছে। এই মোড়ে যাত্রী ওঠে না, স্টপের কাছে নিরন্নের বাসি লাস কুঁকড়ে পড়ে থাকে। পরের স্টপে মাতাল সৈনিকের বগলদাবা হয়ে নতুন বেশ্যা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে গাড়িতে ওঠে। পথের মোড়ে মোড়ে ক্লান্ত ঘরমুখো যাত্রীর দল বাসে উঠতে জায়গা পায় না—নাতির হাত ধরে কালীঘাটের বুড়ী পথের মাঝে দাঁড়িয়ে হতাশায় কাঁপতে থাকে। বাসের সংখ্যা কম—যাত্রী বেশী। এরই নাম পেট্রল রেশনিং। ওদিকে, প্রতি লম্পটের নিশাচর গাড়ি ট্যাঙ্কভর্তি পেট্রলের আবেগে চৌরঙ্গীর চারপাশে

চিতাবাঘের মত হুটোপুটি করে বেড়ায়। একদিকে আত্মম্ভর রাষ্ট্রের লঙ্গরখানায় দয়ালু খিচুড়ির ফাঁকি, আর একদিকে বার বিলিয়ার্ড বলরুম, হোটেল রেস্তোরাঁ ও কাফে—মাৎস্যান্নের নিত্য মহোৎসব।

সুতানুটি আজ সিটি অব্ ক্যালকাটা হয়ে গেছে। ইতিহাসের চিত্রগুপ্তকে ধন্যবাদ! ডাউনিং স্ট্রীটের গণতন্ত্রের হিরন্ময়েন পাত্রেণ ভারতের মসীলিপ্ত আত্মা আরো ভাল করে ঢাকা পড়ুক—কোথাও যেন আর ফাঁক না থাকে! দেশের সীমা ছাড়িয়ে শত যোজন দূরে যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ চম্কায়। তবু বাংলা দেশের খালে বিলে মড়া ভাসে। ভারতের বীর ফকির, বিংশ শতাব্দীর নরোত্তম গান্ধী মানবতার নামে প্রশ্ন করে—কেন এ যুদ্ধ? ভাগাড়ধর্মী সাম্রাজ্যবাদী চিলের চিৎকার উত্তর দেয়—We mean to hold our own! ভাড়াটে প্রেসের ফেরুপাল চীৎকার করে—জনযুদ্ধ মুক্তিযুক্ত গণযুদ্ধ। অদ্ভুত এই দেশ—বিদ্যুটে এর আইন। যেকোন চোর, যেকোন খুনী লাইসেন্সের আড়ালে মজুতদারী ফাটকা আর ভেজাল খাদ্যের ব্যবসা করে। ভণ্ড আর ঠুঁটো মন্ত্রিত্ব লাল ফিতে আর লেপাফার গদিতে বসে অসার গলাবাজির দাপট দেখায়। উৎকোচে বিক্রীত-বিবেক আমলা আর অফিসারের দল অবাধে লক্ষ মানুষের মঙ্গল নিলামে চড়িয়ে দেয়।

সব ব্ল্যাকআউটের অন্তরালে চরম অন্ধকারে দেখা যায় কারাকক্ষের লোহার গরাদ। তার পেছনে এক একটি বন্দী বেদনার্ত মূর্তি—চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রিয়তম কল্যাণসংঘ কংগ্রেসের অগ্নিহোত্রী নায়কের দল। এই গ্লানির পারাবারের অপর পারে এক একটি ক্ষমাময় মূর্তি যেন নিঃশব্দে শোকের প্রহর গুনছে। কে এরা? মস্কো চুংকিং লণ্ডন নিউইয়র্কের যেকোন পথের লোক মনে মনে স্বীকার করে নেবে—পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বমানবের মুক্তির সনদ প্রথম যারা লিখলো, এরা তারাই।

ট্রামের ঝাঁকুনি হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠলো, লালবাজারের মোড়। ট্রামটা আস্তে আস্তে মোড় ফিরছে। ধ্যান ছুটে গিয়ে স্বাভাবিক সম্বিৎ ফিরে এল ইন্দ্রনাথের। পথের পরিচয় বুঝতে পেরেই নেমে পড়লো—শেয়ালদার ট্রামে ফিরতে হবে। পথ নিরালা, রাত মন্দ হয়নি।

কাছেই একটা মোটরকার প্রভুর অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সাহেবী পোষাকপরা একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মোটরে উঠে স্টিয়ারিং ধরলো। স্টার্ট নিতে বেশী দেরি হয়নি, তবু সেই চকিত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে ইন্দ্র তাকে চিনে ফেললো—জয়ন্ত মজুমদার।

এত চুপি চুপি কেন? জয়ন্তের মাথার টুপিটা সাপের ফণার মত দোলে কেন? কার প্রাণের স্বপ্নে অলক্ষ্যে ছোবল দিয়ে এল জয়ন্ত মজুমদার?

সেই জুডাসের প্রেতাত্মা, ইতিহাসের পথের পাশে গুপ্তঘাতকের ছায়া আজও যেন একবার চকিতে দেখা দিয়ে চলে গেল। চরম ভাবে এদের চেনা হয়ে গেছে! দৌড়ে সরে এসে একটা চলন্ত ট্রামের ভেতর লাফিয়ে উঠে পড়লো ইন্দ্রনাথ। ব্ল্যাকআউট আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে।

শিশিরের চিঠি আসছে। অবনীর নামেই আসে। প্রথম দিকে চিঠিগুলি আকস্মিকভাবেই আসতো। চিঠি খুলতো অবনী। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে—চিঠি এসে পড়ে আছে দু'তিন দিন, তবু অবনীর সময় হয়নি। হঠাৎ কোন অবসরের ফাঁকে মনে পড়তো চিঠির কথা, অবনীই চিঠি খুলে পড়তো, সবাইকে শুনিয়ে দিত—শিশিরবাবু ভাল আছেন। কাজ নিয়ে বেশ মেতে আছেন।

কিন্তু-সে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। কাঁকুলিয়ার বাড়িটার মন উৎকর্ণ

হয়ে থাকে প্রতীক্ষায়। পর পর পাঁচটা দিন এমনিতে যদি কেটে যায়, তবে ভাবতে হয় সবাইকে – শিশিরের চিঠি আসা উচিত ছিল এতদিনে। অবনী ভাবে, পিসিমা ভাবেন—জোছু ও অরুণা ভাবে।

শিশিরের চিঠি আসছে নিয়মিত।

হলুদবাড়ি, ৫ই অগ্রহায়ণ : বেশ আছি অবনীবাবু। I feel like a conqueror—দৈনিক সাত-আটটি গ্রামের হৃদয় জয় করে ফিরছি। তারা গান শুনছে, জয়ধ্বনি করছে, আমার নাম দিয়েছে বাউল রাজা। বাঁচতে শেখ, বাঁচতে শেখ—দিনরাত মন্ত্র পড়ে দিচ্ছি তাদের কানে কানে। তারা মেতে যাচ্ছে। কখনো ভাবতে পারিনি অবনীবাবু, এই আধমরাদের নিঃশ্বাসে, এই উপবাসী মূর্তিগুলির হাড়ের অণুপরমাণুতে এতখানি প্রাণ লুকিয়েছিল। আমি যেন এক সুন্দর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছি। আমাকে বাধা দেবার শক্তি বোধ হয় কারও নেই। আমি নিজেকেই আর থামাতে পারবো কিনা জানি না। এইভাবে চলতে চলতে যদি একদিন ফুরিয়ে যাই অবনীবাবু, জীবনে সেটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হবে। কিন্তু আপনারা সুখী হবেন তো অবনীবাবু? কেন জানি মনে হয়, আপনি আমার এই সৌভাগ্য সমর্থন করবেন না। আপনি হয়তো ভাববেন, এটা এক অকর্মীসুলভ দুর্বলতা, ভাবালুতা ভীরুতা। পিসিমা বলবেন—ছেলেমানুষী দুরন্তপনা। আর জোছু ও অরুণা দেবী কি ভাববেন জানি না। কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোন্ পথ আছে আমার? আর ফিরে যাবার পথও কই? কোথায় ফিরে যাব? কি লাভ হ'বে? কোন্ কাজে আসবো?

কাল একবার মহকুমা শহরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, রেজিস্টারী অফিসের সামনে রোদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভিড় যেন নিঃশব্দে চিতার ওপর দাঁড়িয়ে পুড়ছে এই ভিড়টার চেহারা অদ্ভুত, ভয়াবহ, করুণ

যেন একটা আত্মহত্যার সম্মেলন। জমি বিলির উৎসব। সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার জন্যও মানুষ এভাবে ভিড় করতে পারে, আগে কখনো কল্পনা করতে পারিনি। গাঁয়ের লোকগুলি যেন পাগল হয়ে গেছে। জোত জমি অবাধে বেচে দিয়ে কতকগুলি কাগজের টাকা ট্যাকে গুঁজে পালিয়ে যাচ্ছে। বীভৎস এই উৎসব, মাতৃহত্যার মত একটা মূঢ়তা।

কিন্‌ছে কে? কলকাতার একটি চাঁই ব্যাঙ্কার কালীকিংকর বাঁড়ুজ্যেকে চেনেন কি? এই কে-ব্যানার্জি নামধেয় একটি বাণিজ্য জগতের জাম্বুবানের যত মর্কট দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে। কিনছে তারাই। এই জমিবেচা টাকা নিয়ে গেঁয়ো পাগলগুলি যাচ্ছে কোথায় জানেন?

কে-ব্যানার্জির ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিস আছে এখানে। ব্যাঙ্ক তো নয়, চালের ভাঁড়ার। ষাট টাকা মণ দরে ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। জমিবেচা অর্থের শেষ কড়িটা এখানে বিলিয়ে দিয়ে গেঁয়ো জীবগুলি কৃতার্থ হয়ে চলে যাচ্ছে—চাল নিয়ে যাচ্ছে। কেউ দশ সের, কেউ আধ মণ, আর যার ভাগ্য ভাল—সে তু' মণ। বিশ্বাস করছি অবনীবাবু, মানুষকে হত্যা করে তার হাড় দিয়ে পিরামিড তৈরী করার পালা আজও শেষ হয়নি। চোখের সামনে দেখছি, কে-ব্যানার্জির এস্টেট গড়ে উঠ্‌ছে। কত হাজার চাষীর চৌদ্দপুরুষের হাড়ে তৈরী জমি লুঠ হয়ে গেল।

এই পাপের চক্র কবে ভাঙবে অবনীবাবু? আমি কি সেদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবো?

আজ হলুদবাড়ি ছেড়ে গেলাম। রেল লাইন ডিঙিয়ে মাঠে মাঠে চলে যাব। বেশ সুন্দর মাঠটা—একেবারে ফাঁকা মনখোলা শূন্য উদাস। বাব্‌লার বন আছে মাঝে মাঝে, কিন্তু ছায়া নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। আর ছায়া চাই না জীবনে।

এরা রইল পড়ে—হলুদবাড়ির সাতশো ক্ষুধার্ত প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা মরবার আগে একবার জ্বলে উঠবে। সকাল সন্ধ্যা এই লাইন দিয়ে অন্তত: বিশটা মালগাড়ি যায়। তার মধ্যে কি চাল নেই? আটা নেই? কার জন্যে এই অন্নসম্ভার? হলুদবাড়ি আজ সাধ করে নিজেরই চিতাশয্যা রচনা করেছে। এই লাইনের ওপর তারা শুয়ে থাকবে। মালগাড়ির চলাচল বন্ধ করবে। আমি কি এদের মানা করতে পারি? পারি না।"

অবনী চিঠি পড়ে শোনায়। জোছু ও অরুণা চুপ করে শোনে। পিসিমা শান্তভাবে শুনতে শুনতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন।—ও কী কথা! না না, এসব ভাল নয়। ফিরে আসবে না, এসব ভাল কথা নয়। মাথা পাগলা ছেলে। ওকে লিখে দে অবু, চলে আসুক্। ফুরিয়ে যাবে কেন? ফুরিয়ে গেলেই হলো। এসব অভিমানের কথা।

মল্লিকের চক, ১১ই অগ্রহায়ণ: পথে আসতে একটা পোস্ট অফিসের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম অবনীবাবু। এখানেও একটা ভিড় দেখলাম। প্রায় সবাই বুড়ী ও বিধবা। শুনলাম এরা রোজই আসে। কেউ কেউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চার ক্রোশ দূরে থেকেও আসে। বুড়ীদের প্রাণের জোর অদ্ভুত। একদিন মাষকলাইয়ের খিচুড়ি খেয়ে পাঁচ দিন চলাফেরা করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। একটা কথা আছে না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ? আমি কথাটা উল্টিয়ে নিয়েছি, যতক্ষণ আশ ততক্ষণ শ্বাস। বুড়ীরা প্রবাসী ছেলের চিঠির আশায় আসে এখানে। রোজই আসে। ছেলেরা যুদ্ধে গেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি গো বুড়ীমা, ছেলে বুঝি টাকা পাঠালো? বুড়ী বললে—না বাবা, ছেলের টাকার জন্য আসিনি। ছেলের খবরের আশায় এসেছি। ভাল আছে, এইটুকু জানতে পারলেই বাঁচি।

হাঁ, এই আশায় বুড়ীরা বেঁচে আছে। এই আশার বাতাসটুকুই

বুড়ীদের ছেঁড়া বুকের কোটরে প্রাণ হয়ে ধুকপুক্ করছে। নইলে ও ছাই মাষকলাইয়ের খিচুড়ি কি এই মৃত্যুপথযাত্রিণীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

একটী কৈবর্তের ছেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে অনেক দূর এসেছে। এর নাম রামচন্দ্র। ভারী মিষ্টি গলা ছেলেটীর। ওকে একটা গান শিখিয়েছি, জীবনে এই প্রথম গান শেখালাম অবনীবাবু। রামচন্দ্র আমার প্রথম ছাত্র। রামচন্দ্রের গলায় গানটার যেন অন্য রকম অর্থ হয়ে যায়। শুনতে আমার কেমন ভয় করে। বাংলা দেশের মাটীর হৃদয়গহ্বর থেকে একটা প্রতিধ্বনি উঠছে, তার সঙ্গে একটা ক্ষীণ অভিশাপের গুঞ্জন। একটা অকাল বিদায়ের বেদনা সমস্ত অভিমান নিয়ে রামচন্দ্রের গানে শব্দময় হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র শুধু গুগ্‌লি খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু আর ক'দিন? ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, মৃত্যুর ঘুণ ধরে গেছে। দিঘির বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র আমাকে বিদায় দিয়ে বলেছে—আবার ফিরে এস বাবু। তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব।

বড় দমে যাচ্ছি অবনীবাবু। আমার ফেরবার পথ যেন একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যদিও ফিরতাম, কিন্তু রামচন্দ্রও যেন একটা বাধা দিয়ে গেল। যদি কোনদিন এই পথে ফিরতে যাই, তবু আমার প্রথম ছাত্রের সঙ্গে আর জীবনে দেখা হবে না। শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে রামচন্দ্র—পনের দিন, এক মাস, দু'মাস—তার বেশি নয়।

খুবই জানতে ইচ্ছে করছে—আপনারা কেমন আছেন? অবশ্য, আপনি কেমন আছেন, তা আমি এখান থেকেই কল্পনা করে নিতে পারি। আপনি তো আহিতাগ্নিকের মত, চারদিকের হোমধূমের মাঝখানে আপনি রয়েছেন। সবার মধ্যে আছেন বলেই আপনি আছেন। তাই আপনি বোধ হয় কোন দিন ফুরোবেন না, আপনি হলেন ভবিষ্যৎ!

কাজের মধ্যে আছি। তাই শ্রান্তিও আসে। কাজকে একরকম সেরে আনতে পারছি, কিন্তু শ্রান্তির মুহূর্তগুলি কেমন অকেজো হয়ে যাচ্ছে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—সেসময় মনটা ঘরমুখো হয়ে ওঠে। বালিগঞ্জ প্লেসের বাসার জন্য নয়, আপনার কাঁকুলিয়ার বাসার বাইরের ঘরটা। ইচ্ছে করে, এ সময় অরুণা দেবী এসে অর্ডার করেন—গান গাইতে হবে। ইচ্ছে করে, জোছু এসে বলুক্—একটা বাংলা গান। কিন্তু বহু দূরে সরে এসেছি অবনীবাবু। কাজের মধ্যে ভাল থাকি, কাজ না থাকলেই ফাঁকা লাগে।"

আমড়াতলি, ১১ই অগ্রহায়ণ : মল্লিকের চক ছেড়ে চলে এসেছি। এখান থেকে মস্ত একটা গর্ব কুড়িয়ে নিয়ে চললাম অবনীবাবু। না বললে কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারবেন না, কি সেই গর্ব।

এখানে একটি ডাচ মিশনারীদের সেবাকেন্দ্র আছে। এরা ছিল বলেই আমড়াতলির মানুষগুলি মানুষের মতই এখনো বেঁচে আছে। ডাচ পাদরীদের আশ্রমে নানাজাতির লোক দেখলাম—ক'জন যাভানীজ আছেন, একটি অ্যাফ্রিকান আছেন, আর দু'জন পালেস্তিনী আরব। এঁরা সবাই খৃস্টান। এঁরা প্রায় দু'বছর থেকে সারা গ্রামের জীবনকে শিখিয়ে পড়িয়ে সুস্থ করে রেখেছেন। এ গ্রামে কেউ অনশনে মারা যায়নি। কোন কুলবধূকে কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হতে হয়নি। কেন জানেন?

তাঁদের কাছেই প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি। তাঁরা খুবই বিনীতভাবে জানালেন—'আমাদের সামর্থ্য কম, কতটুকু আর করতে পারি। সমস্যা বড়ই জটিল। তবু, থ্যাঙ্ক গড, আমড়াতলিকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি।'

—কেমন করে পারলেন?

—ভারতের কংগ্রেসের 'আত্মরক্ষা স্কীমের' একটা কপি ভাগ্যক্রমে

আমরা পেয়েছিলাম। আমরা শুধু ঐ লাইনেই কাজ করে গেছি। সফল হয়েছি। এ এক অদ্ভুত স্কীম, এর তুলনা হয় না।

হাঁ অবনীবাবু, তাকিয়ে দেখলাম, আমড়াতলি সবুজ হয়ে আছে। আজ এতদিন পরে প্রথম চোখে পড়লো—ফুল ফুটে আছে, টকটকে গাঁদা ফুল চাষীদের ঘরের পাশে। ঐ ফুল ফুটতে পারতো সব গাঁয়ে। কিন্তু ফুটলো না কেন অবনীবাবু? আমড়াতলি বেঁচেছে, হলুদবাড়ি কি বাঁচতে পারতো না?

কিন্তু শুধু এই জন্যেই গর্ব নয়। ঐ যাভানীজ, অ্যাফ্রিকান আর আরব ভদ্রলোকেরা কি বললেন শুনবেন? তাঁরা বললেন—দেশের স্কুলে যখন ছাত্র ছিলেন তাঁরা, তখনই ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের নাম শুনেছিলেন। তাঁরাও নাকি ছাব্বিশে জানুয়ারি তারিখে আমাদের মত স্বাধীনতা দিবসের ব্রত পালন করতেন। মিছিল বার করতেন, প্রার্থনা করতেন, উপোস করতেন। ভেবে দেখুন অবনীবাবু, সুদূর কৃষ্ণ-আফ্রিকা যাভা আর পালেস্তিনের কোন্ নগণ্য জনপদের বুকে কংগ্রেসের মন্ত্রে ভরসার সাড়া জাগছে। কংগ্রেস তাদের ভবিষ্যতের দীপ। আমড়াতলিতে এসে আমি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, আনন্দ রাখতে পারছি না। কংগ্রেসের মর্যাদার সংকটে এক আন্তর্জাতিক প্রীতির ব্রিগেড এসে যেন অলক্ষ্যে এখানে কাজ করে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করেছি—ভারতের কংগ্রেসকে আপনারা সত্যিই ভালবাসেন?

তাঁরা উত্তর দিয়েছেন।—হাঁ মশাই, পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্র অবনত মূকমৌন মানুষের মুক্তির নেতা ভারতের কংগ্রেস। আমাদের কাছে একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের মুক্তি হলে সারা পৃথিবীর কলোনিবাসী ক্রীতদাস মানুষের মুক্তি হবে।

আমড়াতলি থেকে এই নূতন গর্ব হৃদয়ে ভরে নিয়ে চললাম। আজ ডাচ পাদরীদের সেবাকেন্দ্রে চা খেয়েছি। দুটো নতুন গান তৈরী করেছি। বিশ্বাস হচ্ছে, আবার আপনাদের দেখতে পাব। ফুরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। জোছু আর অরুণা দেবীকে বলবেন আমার কথা। বলবেন, তাদের গান শোনাতে পারছি না, এটা আমারই দুঃখ।"

অবনী চিঠিটাকে আগাগোড়া আবৃত্তির সুরে পড়ে যায়। একটা রক্তাভ উত্তেজনায় অবনীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জোছু ও অরুণা অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে চিঠিটার প্রতি বর্ণ শব্দ ও ধ্বনি অনুসরণ করতে থাকে।

চিঠি পড়া শেষ হয়। পিসিমা শুধু একবার পাশের ঘর থেকে প্রশ্ন করেন।—কি রে অবু, ছেলেটি ভাল আছে তো ?

অবনী উত্তর দেয়।—হাঁ।

জোছু ও অরুণা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে নেয়।

সুদামগঞ্জ, ১৭ই অগ্রহায়ণ—একটি শ্মশানের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছি অবনীবাবু। কেউ বেঁচে নেই। কিছু পালিয়েছে—বাকী সবাই মরেছে। জিরিয়ে নেবার জন্য একটা বটগাছের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু দাঁড়িয়ে থাকিনি, খুব প্রাণভরে হেসে নিয়েছি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একটা দৃশ্য দেখছিলাম—বেশ লাগছিল। দুটো লাস পড়ে ছিল পাশাপাশি। এক বৃদ্ধ মুসলমান, হাতের কাছে এখনো এঁটো একটা সান্কি পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় লাসটি কোন আধবয়সী হিন্দুর; পেটটা ঢোলের মত ফুলে উঠেছে। দেখে মনে হয়, এরা এ গাঁয়ের কেউ নয়। অন্য কোন দূর গাঁয়ের লোক—ভিক্ষে করতে করতে এতদূরে এসে পড়েছে। বটের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিতে শুয়েছে, আর শেষ হয়ে গেছে।

সম্প্রদায়-দরদীরা কোথায় ? সম্প্রদায়ের জন্য চাকরির পার্সেন্টেজ

নিয়ে যাঁরা ভেবে ভেবে রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন, কোথায় তাঁরা ? দাঙ্গায় কটা হিন্দু আর কটা মুসলমান মরে, সরকারী হিসাবে সেই সংখ্যাবিজ্ঞানের কত না নিষ্ঠা দেখেছিলাম। অনশনে কত মুসলমান মাঠে-ঘাটে কবর নিল, সে-হিসাব কই ? লজ্জা কেন ? লজ্জা সত্যিই কি আছে ?

সুদামগঞ্জ দেখতে বড় সুন্দর। মাটি একটু লাল্‌চে, কিন্তু খুব নরম, খুব ঠাণ্ডা। আলের ওপর শিশিরভেজা ঘাস চক্‌চক্ করে। ক্ষেতের ওপর কোন মানুষের সাড়া নেই—মাঝে মাঝে এক-একটা গরুর কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তবু বটের ঘনপাতার ছায়ার পাখির দল কলরব করে। এক-একটা ঝাঁক উড়ে যায় দক্ষিণের তালকুঞ্জের দিকে। ওদিক থেকে ফিঙের ঝাঁক উড়ে আসে।

আমারও ঘুম আসছে অবনীবাবু। আমার সব গান যেন হাঁপিয়ে পড়ছে। নাম সুদামগঞ্জ, কিন্তু গঞ্জ কই ? খালের ধারে একটা পুরনো বাজারের ধ্বংস দেখা যায়। চালা নেই, শুধু ভিটেগুলি পড়ে আছে। সাঁকোটা নেই, সাঁকোর খুঁটো কয়েকটা আছে। দুর্ভিক্ষের ঘুণে সব যেন কুরে কুরে খেয়ে দিয়ে গেছে।

বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে আমার। তা হোক, শুধু একটু আশ্রয় পেলে হতো। হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি দয়া করে একবার খোঁজ করবেন কি অবনীবাবু, আমার চাকর বিপিন কি-অবস্থায় আছে ? লোকটা বড় দুঃখী। বউ আর ছেলের জন্য সব সময় কাঁদছে, শেষে ক্ষেপে গিয়ে কোথাও চলে না যায়। আপনি ওকে একটু বোঝাবেন। আমি ওকে ভরসা দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, ভুল করেছি। ওর সব ভরসা বোধ হয় কেনিং থেকে আসতে আসতে পথেই শেষ হয়ে গেছে।

কোন সম্পদ নেই আমার, থাকলে আজ আপনার ওপর সঁপে দিয়ে

যেতাম। কিন্তু এই একটি দায় আছে, ঋণের দায়, তাই আপনার ওপর সঁপে দিয়ে গেলাম। বিপিন সুখী হলে, আমি সুখী হব—জানি না কেন এরকম ভাবছি। বিপিন তার গৃহ ফিরে পাবে, বউ ফিরে পাবে, ছেলে ফিরে পাবে—একটা ভগ্ন নীড় আবার জোড়া লেগে সজীব হয়ে উঠবে। ভাবতে আমার বড় ভাল লাগছে।

আমি শুধু চলতেই থাকবো অবনীবাবু। আমার বাধা নেই, বাঁধন নেই, নীড় নেই। নীড় বাঁধবার যোগ্যতা নেই। আমার শ্রান্তি চিরদিনই ফাঁকি হয়ে থাকবে। আমি শুধু সরে যেতে শিখেছি। কাছে পৌছতে শিখিনি। কাজের মধ্যে আমি নিজেকে ভুলে আছি, কিন্তু এই কাজ আমার আপন হয়েছে কি? আমার সন্দেহ হচ্ছে অবনীবাবু।

আপনি সুখী, আপনাকে হিংসে করতে আমার ভাল লাগে। বড় দেরি হয়ে গেছে, নইলে একবারে নতুন করে আরম্ভ করতে পারতাম। জীবনে কিছু চাইতে শিখিনি, পেতে শিখিনি। না-চাইতে যা আসে, তাও গ্রহণ করতে পারিনি। বোধ হয় গ্রহণ করার মত নয় বলেই।

কিন্তু আপনি জীবনে এত পেলেন কি করে? যা সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য, সেই ভালবাসার কোহিনুরটীও কি আপনার কাছে এমনিতে চলে এসেছে?

মনে হচ্ছে, আর আপনার সঙ্গে কোনদিনও দেখা হবে না। তাই বেহায়ার মত যা-খুশি তাই লিখে ফেলছি। বড় বেশী সাহস বেড়ে গেছে আমার। জানি, শাস্তি দিতে পারবেন না আপনি। আপনার কোন উত্তর আমার কানে পৌছবে না। আজ রাত্রে না পারি কাল ভোরে রওনা হয়ে যাব। খালের ওপারে গ্রামটার নামও জানি না। ঘাট আছে, কিন্তু কোন খেয়া নেই। কি করে পার হব জানি না।

আমি কি শেষে আপনার বিশ্বাসকে ফাঁকি দিলাম অবনীবাবু? আমার দুর্বলতায় আপনি লজ্জা পাবেন নিশ্চয়। কিন্তু আপনার কাছে যে

প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, তার মর্যাদা রাখবো। নিভে যাবার আগে আপনার বাণী একবার শেষবারের মত জ্বালিয়ে দেব—জ্বলেও যাব। ভাল লাগুক, খারাপ লাগুক—ইচ্ছে থাক্ আর না থাক্, আপনার ভরসা ব্যর্থ হতে দেব না।

এখানে আর বেশীক্ষণ টিঁকতে পারছি না। এ-গ্রামটার নিস্তব্ধতা ভয়ানক রকমের। একেবারে অবশ করে আনছে। তার চেয়ে ভাল, চলে যাই খালের কিনারা ধরে তিনকোপ জিয়নপুর আর শ্যামনগরের দিকে। একটা দুটো নয়, শুনেছি উনিশটা চালের আড়ত আছে সেখানে। যে-করেই হোক, ঐ চাল বের করতেই হবে। আড়তদারেরা লেঠেল বসিয়েছে—তা'ছাড়া থানা আছে কাছেই। কাজেই আর কিছু ভাবতে পারছি না। বোধ হয় শেষ চিঠি লিখলাম আপনাকে। আর কিছু লিখবার নেই।

শুধু অরুণা দেবীর কথা মনে পড়ছে। আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন তাঁকে। বলবেন তাঁকে, তিনিই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়। বলবেন তাঁকে, সুদামগঞ্জের বটতলায় আমি বসে আছি। জ্বর বাড়ছে। বটের বাতাসে শান্তি পাচ্ছি না। যখন সব ভুলে যাই, চোখ মুদে আসে, তখন শুধু মনে হয়, আমি একা নই। মনে হয়, আমার পাশে একটি অকৃপণ প্রীতির হৃদয় বসে আছে। অরুণা দেবীর আঁচলের বাতাসে আমার সব সন্তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছে। অরুণা দেবীকে বলবেন, তাঁকে আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু তিনি বোধ হয় আমায় চিনতে পারলেন না। ক্ষমাপ করেন যেন।”

চিঠি পড়া শেষ হলে অবনী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। পিসিমা পাশের ঘর থেকে বার বার বলতে থাকেন। —ওরে শিশিরকে ফিরে আসতে লিখে দে। বেঘোরে শেষ হয়ে যাবে ছেলেটা।

পিসিমার কথাগুলি অবনীর কানে যায় না বোধ হয়। একটু অস্থির-ভাবে পায়চারি করতে থাকে। লক্ষ্যহীন চোখের দৃষ্টিটা ক্রমেই নিবিড় হয়ে আসতে থাকে, যেন নিজের মনের উদ্বেল চিন্তার আবর্তগুলির খেলা দেখছে অবনী। মুখটা হঠাৎ রঙীন হয়ে ওঠে, বড় সুন্দর দেখায় অবনীকে।

সবচেয়ে সহজ ও সজীব দেখায় জোছুকে। চিঠিটা নেবার জন্য হাত পাতে অবনীর সামনে। —দাও, ওটা রেখে দিই।

মুক্ত ও নিশ্চিন্ত মানুষের মত জোছু চিঠিটা নিয়ে চলে যায়। এই অভিনয়ে তার আর কোন ভূমিকা নেই। শিশিরের চিঠির লেখার মধ্যে জ্যোৎস্নার নামটা ছোট হয়ে আসছিল অনেকদিন থেকেই। আজ সে খারিজ হয়ে গেছে একেবারে স্পষ্টভাবে। পেছনে টানবার মত আর কোন সংশয় নেই।

অরুণা বসেছিল স্তব্ধ হয়ে। মাথাটা একেবারে ঝুঁকে পড়েছিল, তাই মুখ দেখা যায় না।

অবনীরও সেদিকে খুব বেশী কৌতূহল ছিল না। অরুণা যদি মুখ ঢাকতে চায়, ঢাকুক। অবনী জোর করে অরুণার মুখ দেখতে চাইবে না। কি আর এমন অপূর্ব বস্তু দেখা যাবে? হয়তো চোখ দুটো ছলছল করছে, লজ্জায় শিউরে উঠছে, কিছু বলবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

পিসিমা আবার কি একটা কথা বললেন। অবনী উত্তর দিল —যাই পিসিমা।

যাবার আগে অরুণার সামনে এসে দাঁড়ালো অবনী। অরুণার মাথাটা যেন আরও ঝুঁকে পড়লো। অরুণা তখনো বুঝতে পারেনি যে অবনী হাসছে।

—এই বোকা মেয়ে!

অবনী মুহূর্তের মধ্যে অরুণার হাত দুটো ধরে এক টানে সোজা করে

ড় করিয়ে দিল। অরুণা আবার মাথা ঝোঁকাতে গিয়েও পারলো না—অবনীর কাঁধের ওপরেই মাথাটা আরামে লুটিয়ে রইল।

খুবই ছোট ছোট ঘটনা। কালো কলকাতার অস্বাভাবিক আলোড়নের মধ্যে বুদ্বুদের মত ফুটে উঠছে।

প্রথমেই ভাবতে হয় এবং ভয় পেতে হয়—বোস এণ্ড মজুমদার নামে একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান হঠাৎ কায়েম হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। প্রবীন গুরুদয়াল বসু এবং নবীন জয়ন্ত মজুমদারের প্রতিভা এক সাধনায় যুক্ত হয়েছে।

ভাবছিল এবং ভয় পাচ্ছিল সিতা। জয়ন্তের ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে। সবচেয়ে খুসী গুরুদয়ালবাবু। তিনি বোধ হয় এই ধরণেরই একটি মানুষের মত মানুষ খুঁজছিলেন—নীরব কর্মী, কঠোর, নির্ভীক, উন্নতিবাদী ও সুচতুর একটি মানুষ। তাঁর সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ পাহারা দেবার মত বিশ্বাসযোগ্য লোক জয়ন্ত মজুমদার ছাড়া আর কে আছে? জয়ন্ত কাজের লোক, পয়সা চেনে, পথ করে নিতে জানে। এই জয়ন্তের ওপর নির্ভর করা যায়। আজ যদি গুরুদয়ালবাবু হঠাৎ চোখ বোঁজেন, ডোভার লেনের বাড়ির একটি চৌকাঠের পালিশও মলিন হতে দেবে না জয়ন্ত। গুরুদয়ালবাবুর বিদেহী আত্মা সুরক্ষিত সম্পদের পরমাণুগুলির মধ্যে তাহ'লে অনন্তকালের মত আরামে ঝিমোতে পারবে। সেই সঙ্গে যদি তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ, সোনার হরিণের মত তাঁর মেয়ে সিতাও যদি একই প্রহরীর পাহারায় থাকে, তবে সত্যিই তিনি নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজতে পারেন। তাঁর সব কিছু অটুট রইল। এই সুস্বপ্নের মধ্যেই গুরুদয়ালবাবু এক রকম আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু সিতার এত ভয় কেন? বিছানায় শুতে গিয়ে, বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগে, সব সময় এই একটা কণ্টকাক্ত ভাবনা মনের মধ্যে যন্ত্রণা ছড়াতে থাকে। বালিশে মুখ গুঁজে অসহায়ের মত পড়ে থাকতে ভাল লাগে সিতার।

শিশির নামে সেই ভাবুক শিল্পী ছেলেটিকে সত্যিই কি সে ভালবাসে? স্পষ্টভাষী কোন সমালোচকের প্রশ্নের মত হঠাৎ কেউ যেন সিতার ভাবনাগুলিকে জিজ্ঞাসা করে বসে। তবে কেন এত দ্বিধা, এত বিচার, এত হতাশ্বাস? এ যে অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার মনোভাব! পাঁজি দেখে, পুরুত ডেকে, শাঁখ বাজিয়ে কোন এক আকস্মিক লগ্নে গ্রাম্য পিতা যার হাতে মেয়েকে সঁপে দিলেন, সেই তার পতি পরম গুরু। গেঁয়ো মেয়ে প্রতিবাদ করে না। কিন্তু তুমি সিতা বসু? তুমি গ্র্যাজুয়েট, আধুনিকা, জাগৃতি সংঘচারিকা, তোমার এত আত্মসংযম কেন? মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে এত বাধা কিসের?

সিতা কেঁদে ফেলে। গুরুদয়ালবাবুর স্নেহসিক্ত প্রতিটি চোখের দৃষ্টি, মুখের কথা, হাসি তৃপ্তি ও আবদারের ছবিটা চোখের সামনে মায়া-যবনিকার মত নেমে আসে। এ'কে অস্বীকার করার মত সামর্থ্য কই সিতার?

সিতার কান্না মনের ভেতরেই বাজতে থাকে—কিন্তু তুমি আমার দুঃখ বুঝলে না বাবা। তুমি শুধু এত ভালবেসেই আমাকে ব্যর্থ করে দিলে। তোমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পারছি। মুখ ফুটে কিছু বলছো না, কিন্তু কী প্রচণ্ড তোমার অনুরোধ! তুমি একবার খোঁজ করলে না, জয়ন্তকে আমি ভালবাসি কি না। তুমি ভেবে দেখলে না, আমার ভালবাসার জন পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা! তুমি চাইছ, আমি ডোভার লেনের বাড়ির পোষা সোনার হরিণ হয়ে চিরকাল তোমার কাছে

থাকি। তুমি শুধু একাই আমাকে ভালবাসতে চাও। যদি আজ জানতে পার যে শিশির আমায় ভালবাসে আর আমি শিশিরকে ভালবাসি, তুমি বোধ হয় সহ্য করতে পারবে না। না, তুমি নিশ্চয় জান, তোমার জয়ন্ত আমায় ভালবাসে না, আমিও জয়ন্তকে ঘৃণা করি। তাই বোধ হয় বেছে বেছে জয়ন্তকেই তোমার পছন্দ হয়েছে। বেশ তুমিই সুখী হও।

হাত মুখ ধুয়ে পাখার নিচে বই নিয়ে স্বস্থির হয়ে বসে সিতা। মনের সব প্রশ্ন-ভাবনা ও যন্ত্রণাগুলি যেন এতক্ষণ কাঁচা কাঠের আগুণের মত শুধু ধোঁয়া আর ধাঁধাঁ সৃষ্টি করছিল। এখন শুধু একটা গর্বের শিখা জ্বল্ জ্বল্ করছে, তারই ছায়া যেন পড়েছে সিতার মুখের ওপর। বোধ হয় ত্যাগের গর্ব। বিজয়িনীর মত একটা আত্মপ্রসন্নতা। এটা তার পরাজয় নয়। বিদ্রোহ সে করতে পারে, তবু স্বেচ্ছায় নিজেকেই আজ সে ভেঙে দিয়েছে। সুখী হোক্ গুরুদয়ালবাবু। আজও তাঁর ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিসে টেবিলের পাশে ছোট্ট একটা চেয়ার রয়েছে। বাইশ বছর আগে তৈরী হয়েছিল চেয়ার। সেই এতটুকু অপোগণ্ড শিশু সিতা এই চেয়ারে বসে থাকতো আর গুরুদয়ালবাবু কাজ করে যেতেন। নইলে, কাজের প্রেরণাই তিনি পেতেন না। যেন গুরুদয়ালবাবু চোখের ওপর আর বুকের কাছে আজ বাইশ বছরের প্রতি মুহূর্ত ধরে সিতা বড় হয়ে উঠেছে। এ কাহিনী সিতার অজানা নেই। সেই সুমহিম বাৎসল্যের ইতিহাসকে যেন অভিনন্দন জানালো সিতা। নিজের দিকটা দেখ্‌লো না।

বইটা শুধু এতক্ষণ কোলের ওপর খোলা পড়ে ছিল। একটি পাতাও পড়া হয়নি। পড়েও কোন লাভ হতো না। অনেকদিনের পড়া বই, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—শিশিরের দেওয়া উপহার। শুধু শিশিরের নামটা বার বার বড় হয়ে চোখে পড়ছে।

আবার ধীরে ধীরে মনের আকাশ মেদুর হয়ে আসে। জোর করে নিজেকে সহজ করে রাখতে চায় সিতা, কিন্তু সকল প্রয়াস বিফল হয়। সমস্ত চিন্তার ওপর একটা কাঁকরের ঝড় যেন ছিটকে এসে পড়ে। তার সব অভিযোগগুলি কল্পনায় শিশিরকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে থাকে। —তবু তোমায় ভুলতে পারি না কেন? শুধু তোমার কাছেই অহংকার করতে পারিনি, তাই কি তুমি অপমান করলে? তুমি আমায় কাঁদালে। তোমাকে যদি এমনি করে কাঁদাতে পারতাম, তা হলে আমার এই অকারণ অপমানের শোধ নেওয়া যেত। কিন্তু তুমি অদ্ভুত মানুষ। জানিনা কোন্ নিশির ডাক শুনতে পেয়েছে। অবনীবাবুর বোন বা যেই হোক সে, সুরশিল্পীর কানে এতই মধুর লাগলো সে-ডাক? কিন্তু তোমার তো চোখ ছিল। দেখতে পাওনি সিতাকে? দেখতে পাওনি, শুধু সিতার হাতটা ধরতে তুমি একটু দেরী করলে সে কত অস্থির হতো, রাগ করতো, অভদ্র হয়ে উঠতো। সেসব যে তোমারই জন্য। বুঝতে পারতে না? তুমি কি এতই গোবেচারা?

কিন্তু বেশ তো শিভাল্‌রি জ্ঞান দেখছি। আকাশকুসুম হোক বা সিতা বস্ত হোক—সুলভ হলে তোমার কাছে তার বোধ হয় কোন মূল্য নেই। অবনীবাবুর বোন জ্যোৎস্না কি এতই সুদুর্লভা যে তার মান রাখতে এক নিমেষে জীবনটাকে উল্টে পাল্টে দিলে। হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেলে—কোথায় গেলে জানি না।

কিন্তু তোমার হৃদয় নেই, একি বিশ্বাস করতে পারি? আজ তবু আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। জ্যোৎস্নার কথা ছেড়ে দিই। তার আগে? তুমি আমার জন্যে কেন এতটুকুও ত্যাগ স্বীকার করতে চাইলে না? লোকে বাঞ্ছিতের জন্য কত ঘুষ দেয়। তোমার আর কতটুকু করতে হতো? একটি দিনের জন্য যদি আমাদের বাড়িতে আসতে, বাবাকে

একটা প্রণাম করতে—তাই যথেষ্ট হতো। বাবা নিশ্চয় বিশ্বাস করতেন যে, তুমি টাকাকে শ্রদ্ধা কর। তাহলে সব কিছু তোমারই লাভ হতো শিশির। ডোভার লেনের বাড়িতে জয়ন্তর ছায়া পড়তো না কোনদিন।

এখন কোথায় আছ জানি না। কিন্তু এমন করে পালিয়ে গেলে কেন? যাবার আগে একটা খবরও দিলে না। যে-সিতাকে এত গান শুনিয়েছ, তার একটা অভিমানেরও মর্য্যাদা রাখলে না? ক্ষণিকের জন্যও কি নিজেকে অপরাধী ভেবেছিলে? তা যদি সত্য হতো, আর জানবার উপায় থাকতো, তবু আমি খুশী হতাম শিশির। বুঝতাম, তোমার হৃদয় আছে।

সব শূন্য করে দিয়ে যেতে, তাও ভাল ছিল। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে সরে পড়লে কেন? তোমার কাছে পরাজয়ের কথা বলছি না। কোথায় নাকি এক চাঁদের রাজ্য খুঁজে বের করেছ, জ্যোৎস্না নামে কোন্ একটা মেয়ের কাছে আমাকে হারিয়ে দিলে। এই পরাজয়ের অভিশাপ বোধ হয় আমাকে চিরকাল অসুখী করে রাখবে। তুমি নিজে যত খুসী আমায় তুচ্ছ কর, ঘৃণা কর—সব সইতে পারবো। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আমার ভালবাসার দুর্বলতাকে অন্ধকার বলে বিদ্রূপ করলে কেন? তোমার কাছে আমার কোন পরাজয় নেই। স্বামী কাকে বলে জানি না, সতীত্ব কাকে বলে বুঝি না। শুধু জানি, আমার জীবনে একটি পুরুষ আছে, যার দুটি বাহু দিয়ে ঘেরা ছোট্ট স্বর্গটির মধ্যে আমার সব লজ্জা নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে যায়। আর কোথাও নয়। তোমার চুমোয় ভেজা মুখ নিয়ে কতবার ঘরে ফিরেছি। তোয়ালে হাতে টবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তবু মুখ মুছতে হাত ওঠেনি। বাতিকের মত তোমার

আদরের চিহ্ন কতভাবে বাঁচিয়ে চলেছি। এ গল্প তোমার কাছে চিরদিন না-শোনা রয়ে গেল। নইলে সিতাকে বোধ হয় চিন্‌তে পারতে।

খুব ইচ্ছে করছে তোমায় একটীবারের মত কাছে পাই। একটা বোঝাপড়া করি তোমার সঙ্গে। এটাও বোধ হয় বাকি জীবনে দুরাশা হয়ে রইল। শুধু জোনাকী ও আলেয়ার একটা মিতালী দুদিনের জন্য সত্য হয়ে উঠেছিল। আলেয়া সরে গেছে, এবার জোনাকীও নিভে যাবে। তবু আজকের মত প্রার্থনা করে নিই—যেখানেই থাক, যেন ভাল থাক।

খোলা বইটা আবার বন্ধ করে তুলে রাখলে সিতা।

কণ্ট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়েছিল অবনী। বোরখা-ঢাকা একটি নারী-মূর্তি কাছে এসে দাঁড়িয়ে খানিকটা ইসারায় ও খানিকটা অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন বলছিলো, প্রথমে বুঝতে পারেনি অবনী।

বোর্‌খাবৃতা এইবার একটু গলার স্বর চড়িয়ে ডাকলো—আপনাকেই বলছিলাম বাবু।

অবনী—আমাকে ?

বোর্‌খাবৃতা—হাঁ। আমি মৈনুদ্দীনের বিবি।

অবনী—মৈনুদ্দীন কে ?

বোরখাবৃতা একটু ইতস্তত করে বললো—যাকে আপনারা বাঁকারাম বলে ডাকেন।

বাঁকারামকে মনে পড়ে গেল অবনীর। অনেকদিন তার দেখা নেই, আজকাল চাল নিতে আর আসে না। তবু বাঁকারামকে এত তাড়াতাড়ি অনেকেই ভুলে যেতে পারেনি। আজও লাইনের জনতা খোঁজখবর

করছিলো—কই, আমাদের বাঁকারাম আর আসে না কেন ? বাঁকারামও কি লড়াইয়ে চলে গেল।

বেশ ছিল বাঁকারাম। যেমন কাশতো, ঝগড়া করতো, তেমনি গল্পে রসিকতায় লাইনের উত্যক্ত মনের ওপর মাঝে মাঝে প্রসন্নতার হাওয়া ছড়িয়ে দিত। সেই বাঁকারামের বিবি কি জানি বলতে এসেছে আজ।

অবনী—হাঁ চিনেছি। মৈনুদ্দীন কোথায় ?

মৈনুদ্দীনের বিবি বোরখার ভেতর ফুঁপিয়ে উঠলো।—তার কলেরা হয়েছে।

বাঁকারামের পরিচিত লাইনের অনেকেই খবরটা শুনেই বিষণ্ণ মুখে আপ্‌শোষ করে উঠলো।—আহা !

এক বুড়ো হাত নেড়ে বললো।—কলেরা যখন, তখন আর উপায় নেই গো, আর কোন উপায় নেই। এখন ভগবান যদি রাখেন···।

ফাজিল গোছের চেহারা একটি ছোক্‌রা উত্তর দিল—আরে মোসাই, এর নাম লাটের কলেরা। ভগবান নিজেই টেঁসে যাবে যদি একবার ছুঁয়েছে। আমাদের বৈরাগীপাড়া তিন ঘণ্টায় সাফ হয়ে গেল মোসাই।

অবনী—তুমি কি বলতে চাইছ, বল।

মৈনুদ্দীনের বিবি—দাওয়াই চাই বাবু।

অবনী বললো—আচ্ছা চল।

মার্কেটের বাইরে এসে অবনী একবার থামলো। মৈনুদ্দীনের বিবি আবার ফোঁপাতে আরম্ভ করলো। —হরদম আপনার কথা বল্‌ছে বাবু। বলছে, যা লাইনে একটি কংগ্রেসী বাবু দাঁড়িয়ে আছে, তাকে গিয়ে খবর দে। তাই দৌড়ে এলাম। এখন আপনাদের দোয়া থাকলে ও বাঁচবে বাবু। একটি পয়সা নেই আমার। নারকেলডাঙ্গা

মিঞাদের বাড়ি বাঁদিগিরি করি, দু'টো খেতে পাই। কাল রাত্রে খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। দরগার ধুলো এনে বুকে মাথায় ছুঁইয়ে দিয়েছি। আমি আর এর বেশি কি করতে পারি বাবু?

অবনী—মৈনুদ্দীন থাকে কোথায়?

মৈনুদ্দীনের বিবি—দাস পাড়ায়।

অবনী—তোমরা দুজনে এখন ভিন্ন থাক?

মৈনুদ্দীনের বিবি একটু সংকোচ করে বললো—জী, আপনাকে বলতে দোষ নেই, আমি মৈনুদ্দীনের তাল্লাকী বিবি। হাঁ, ও আমাকে মেরেছে, খেতে দেয়নি, তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু রহম্ তো শেষ হয়ে যায় না বাবু। তাই খবর পেয়ে থাকতে পারলাম না।

অবনী হাসছিল। মৈনুদ্দিনের বিবি যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লো। —তা ওকে দোষ দিই না বাবু। রোগী মানুষ, নিজেই ভিক্ষেসিক্ষে করে খাচ্ছিল। আমাকে পুষবে কোথা থেকে।

অবনী—মৈনুদ্দীন আগে কি করতো?

মৈনুদ্দীনের বিবি।—দপ্তরীর কাজ করতো, অসুখ হবার পর থেকে হাত কাঁপে, কাজ করতে পারে না। তিন ভাই ছিল, তারাও লড়াইয়ে ভেগেছে। ওর দোষ নেই বাবু। আমার নসীবে বাঁদিগিরি ছিল।

দাসপাড়ায় মৈনুদ্দীনের ঘরের ঠিকানা আর রাস্তার পরিচয় ভাল করে জেনে নিয়ে অবনী বললো—তুমি এখন ঘরে গিয়ে মৈনুদ্দীনের কাছে বসো। আমি ওষুধ আর ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি। চিন্তা করো না, আমি নিশ্চয় যাব।

মৈনুদ্দীনের বিবির ছেঁড়া-নোংরা বোরখা-ঢাকা অবসন্ন মূর্তিটা আশ্বাসে সজীব হয়ে ব্যস্ত পায়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল। বেলা তখন দশটার কাছাকাছি। বাসায় পৌঁছতে সওয়া-দশটা। দশটা

টাকা হাতে নিয়ে আবার পথে এসে দাঁড়াতেই সাড়ে দশটা। একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো অবনী। আজ আবার অফিস কামাই হলো।

ইন্দু ডাক্তার বললেন—কী চাই আঃ অবনীবাবু। আপনি শুধু স্যালাইন যোগাড় করুন। তারপর খবর দেবেন, ইঞ্জেকশনটা সেরে দিয়ে আসবো।

এক এক করে যত ড্রাগিস্টের দোকান, ফার্মাসি আর মেডিক্যাল স্টোর চুঁড়ে হাঁপিয়ে পড়লো অবনী। একটা বেজে পার হয়ে গেল।

স্যালাইন আছে? প্রশ্ন শুনেই দোকানের লোকগুলি কেমন সন্দিগ্ধভাবে তাকায়, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।

কত দাম স্যালাইনের? তবু প্রশ্নটা যেন কারও কানে ঢোকে না। কখনো বা দোকানের ভেতরঘরের পর্দাটা হঠাৎ সরে গিয়ে এক জোড়া ধূর্ত চোখ ক্রেতার চেহারাটা একবার মুহূর্তের মধ্যে পরীক্ষা করে নিয়ে তখুনি আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

কি ব্যাপার মশাই, উত্তর দেন না কেন? কথাগুলি একটু জোর গলায় বলা মাত্র দোকানের মালিক বা কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করেন—না, নেই। চেঁচালেই স্যালাইন আসে না।

অবনী।—কি করলে আসবে?

—যদি অপেক্ষা করতে পারেন, আর টাকা ছাড়তে পারেন, তবে আনিয়ে দিতে পারি।

অবনী।—কোত্থেকে আনবেন?

—খোঁজ করতে হবে, কোন্ স্টকিস্টের কাছে আছে।

অবনী—এই সামান্য খবরটা দিতে এতক্ষণ খাবি খাচ্ছিলেন কেন? জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলে দিলেই তো চুকে যেত।

—খদ্দের বুঝে খবর দিই।

অবনী—ইঁদুরের মত আড়াল থেকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বুঝি খদ্দের চিনতে হয়?

—হাঙ্গামা করবেন না মশাই।

অবনী আর হাঙ্গামা না করে সত্যিই পথে নেমে পড়ে। একটা ছুটো করে প্রায় তেরটা দোকান দেখা হয়ে গেছে। তবু রহস্যটা ঠিক পরিষ্কার হয় না।

এই দোকানটার বাইরের বারান্দায় এক কোণে কয়েক বাক্স গেঞ্জি আর মোজার পসরা সাজিয়ে একটি নিরুৎসাহ চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে বসেছিল। ছেলেটি অবনীকে সমবেদনা জানালো। —সত্যি হাঙ্গামা করে কোন ফল হবে না দাদা। ধমক দিলে মাল বেরুবে না। কিছু ভাল মত হাতে গুঁজে দিন, এখনি মাল চলে আসবে।

অবনী।—কত দিতে হবে?

—সে অনেক, কোন ঠিক ঠিকানা নেই। দশ হতে পারে, বিশ হতে পারে, পঞ্চাশ চাইলেও না দিয়ে যাবেন কোথায়? স্যালাইনের ওপর ফাট্‌কা স্বরু হয়ে গেছে। ধরুন না, এই তো সবে পরশু সন্ধ্যা থেকে—যেই না কলেরাটা একটু ছড়িয়েছে, অমনি বেমালুম এঁটে দিলে রে বাবা। এখন যেখানেই যান, আর স্যালাইন নেই। তবে হাঁ, সবচেয়ে পিটে নিলে ক্লাইভ স্ট্রীটের বোস মজুমদার। কলকাতার অর্দ্ধেক স্যালাইনের স্টক ওদের ঘরে গিয়ে উঠেছে। যাই বলুন, এদের ব্রেন্‌কে থ্যাঙ্কস্ দিতে হয় দাদা। বোস মজুমদার যখন দুনো দরে সব দোকান থেকে মাল ছেঁকে নিয়ে সরে পড়েছে তখন সবারই ঘুম ভাঙলো। এখন আপনার সঙ্গে ছ্যাঁচোড়পনা করে আর কত স্থবিধে করতে পারবে? লুটে নিলে বোস মজুমদার। ব্রেন থাকলে সব হয় দাদা। আর ব্রেন না থাকলে এই গেঞ্জি আর মোজা—সারা ছুপুর ধুঁকছি। সাত সিকের বিক্রী আর দেড় সিকে লাভ।

জানবার অনেক বেশী জানা হয়ে গেল অবনীর। রহস্যটার মধ্যে আর জটিলতার লেশমাত্র নেই। স্যালাইন পাওয়া যাবে না—সোজাসুজি একটা ব্যাপার মিটে গেল।

অবনী ফেরবার আগে গেঞ্জীওয়ালা ছেলেটি একবার অনুতপ্তের মত বললো। —আমার কথায় দুঃখ পেলেন না তো দাদা? কলেরা কার হলো? আপনার নিজের লোক কারও নয়তো?

অবনী। —একথা তোমার মনে হলো কেন?

ছেলেটি হাসলো। —আমার কথায় দোষ নেবেন না দাদা। নিজের লোক হলে কি এতক্ষণ এখানে এদের সঙ্গে তর্ক করতেন? সর্বস্ব দিয়েও এদেরই দয়া মেগে মেগে জিনিসটি কিনতে হতো আপনাকে। সারাদিন বসে এই কাণ্ড দেখছি। আপনি আসার একটু আগে এক মহিলা এসেছিলেন। ঐ স্যাকরার কাছে চুড়ি বেচলেন, আমি এখানে বসে বসে দেখছি। তারপর এদেরই সাধাসাধি করে, কেঁদেকেটে, স্যালাইন আর ওষুধ নিয়ে গেছেন। পঞ্চাশটি টাকা ফুঁয়ে উড়ে গেল মহিলাটির। স্বামীর কলেরা হয়েছে—বেচারীর কি আর দরাদরি করার সময় আছে? তাই বলছিলাম…।

ছেলেটির কথাগুলি কশাঘাতের মত অবনীর অন্তরাত্মার ওপর দাগ বসিয়ে দিল, জ্বালা ধরিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে তার উদ্ধত মনুষ্যত্বের গর্বগুলি নিজেরই তুচ্ছতার লজ্জায় খর্ব হয়ে গেল। রোগীর মুখের মত অবনীর চেহারাটা ক্ষণে ক্ষণে বিশীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে পড়ছিল। না, এটা তার নিজের বিপদ নয়, নিজের লোকের বিপদ নয়। বাঁকারাম নামে এক হতভাগ্যের বিপদ—বাঁকারাম তার কেউ নয়। মনের গোপনে বহুদিনের লালিত একটা মোহ নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে পড়েছিল অবনীর। তার জাতি-প্রীতির গর্বিত মূর্তিটার গায়ে যেন এক আঁচড় দিয়ে ধরা পড়িয়ে দিল

ছেলেটা. ভেতরে রক্ত নেই। এমন নিষ্ঠুরভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো ছেলেটার ? যাক্, ছেলেটার লাভ না হোক্, নিজেরই লাভ হলো বোধ হয়।

বিকেল শেষ হতে চললো। রোদের ঝাঁঝ ঝিমিয়ে আসছে, পূর্বচর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। পথের ভিড় আরও ঘন ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই অবসরে ফুটপাথের ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে অবনী যেন তার জীবনবেদের বর্তিকাটিকে মনে মনে সাজিয়ে নিল। যেন আর কখনো ভুল না হয়।

সবার মধ্যে মিশে যেতে হবে, ব্যক্তিকে বিলীন করে নিতে হবে সমাজের মধ্যে। এই গোত্রহীন, ব্যক্তিহীন, শ্রেণীহীন, স্বার্থহীন সত্তা সংগ্রাম ও সেবা দিয়ে মানবতার পুণ্য সৃষ্টি করবে। এই অবাস্তব নরোত্তমবাদের ভুলটুকু আজ যেন ধরা পড়ে গেল। অবনী এতদিন যেন পথকেই লক্ষ্য ও লক্ষ্যকে পথ বলে বুঝেছিল।

আজ একটা নবোপলব্ধ সত্যকে মনে মনে আবৃত্তি করে নিল অবনী। —আমি অসম্পূর্ণ, আমি পঙ্গু, আমি ক্ষুদ্রচেতন মানুষ। সংগ্রাম ও সেবাই আমার পথ। এই পথেই এগিয়ে গিয়ে আমার পূর্ণতা আসবে, পঙ্গুত্ব ঘুচবে, চেতনা প্রসারিত হবে। সবার মধ্যে ব্যাপ্তি স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হবে আমার। নিরহংকার সেই সেবক আমিই 'আমি'। সেই আমার সিদ্ধি, আমার সমাজবাদ, আমার লক্ষ্য। সবার উপরে সেবা সত্য। সবার প্রথমে সংগ্রাম সত্য।

গেঞ্জিওয়ালা ছেলেটি এতক্ষণ উত্তর না পেয়ে বিস্মিতভাবে অবনীর হাবভাব লক্ষ্য করছিল। ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ মানুষের মত হঠাৎ উৎসাহে দীপ্ত হয়ে অবনী বললো।—না ভাই, তুমিই ঠিক বলেছ। আমার একটি চেনা লোকের কলেরা হয়েছে। নিজের কেউ নয়।

ইন্দু ডাক্তারের সঙ্গে আর কোন প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই। বাসু কবরেজকে সঙ্গী করে দাসপাড়ার বস্তির গলিঘুঁজি ভেদ করে যখন মৈনুদ্দীনের ঘরের কাছে পৌঁছলো অবনী, তখন সন্ধ্যো ঘনিয়ে এসেছে। মৈনুদ্দীনের ঘরের দরজার ঝাঁপ খোলা, একটি মেটে পিদিম জ্বলছে কুলুঙ্গির ওপর। ঘরের মেজে ভেদ করে একটা অতিক্ষীণ আর্তস্বর যেন থেকে থেকে ফুঁড়ে উঠছে—আল্লাহ্‌···রহমানের···রহিম।

মেজের ওপর উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল মৈনুদ্দীনের বিবি। বোর্‌খা নেই, কবরেজ আর অবনীকে হঠাৎ ঘরের ভেতর দেখতে পেয়ে তার শোকাহত রক্তশূন্য শীর্ণ মুখের ওপর ক্ষণিকের জন্য একটা প্রসন্নতার আভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

দেয়াল ঘেঁসে একটা চটের বিছানার ওপর মৈনুদ্দীনের শরীরটা শক্ত হয়ে বেঁকে কুঁকড়ে পড়েছিল। বাসু কবরেজ সামান্য একটু টেপাটিপি করেই হাত গুটিয়ে নিল।—শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

দাসপাড়ার গলির অন্ধকারে আবার পা বাড়িয়ে দেবার আগে আর একবার স্পষ্টভাবে শোনা গেল, মৈনুদ্দীনের বিবি ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ফরিয়াদ করছে—আল্লাহ্‌ রহমানের রহিম···।

জাগৃতি সংঘের সাধারণ অধিবেশন।

এটা একটা রহস্য, ইন্দ্রনাথ কেন এখনো সংঘের সঙ্গ ছাড়তে পারলো না। বুঝতে আর কি বাকি আছে তার? সংঘের জন্য কোন দরদ নেই ইন্দ্রনাথের। সাম্যবাদের বুলির ঘেরাটোপ দিয়ে সংঘের অন্তঃস্বরূপটা এতদিন ঢাকা পড়েছিল। তাই বুঝতে ও চিনতে একটু দেরী হয়েছে। ইন্দ্রনাথ জানে, সে একা নয়, আরও বহু উৎসাহী কর্মীর মনের দশা তারই মতন। কেউ তার চেয়ে আগেই বুঝে ফেলেছে, কেউ

কেউ বুঝতে আরম্ভ করেছে। দুর্ভাগ্য ও পণ্ডশ্রমের অভিশাপ নিয়ে কিছু নতুন নিরীহ ছেলেমেয়ে এসে সংঘের ভেতরে ঢুকছে। রুচি শিক্ষা ও চেহারা, সব দিক দিয়েই অপদার্থ—দলে দলে এই ধরণের ছেলেমেয়েগুলিই বেশী করে ঢুকছে। কিন্তু সমবেদনা হয় নিরীহদের জন্যই, ওদেরই জীবনের অনেক ক্ষতি ভ্রান্তি ও অপচয়ের ওপর সংঘনায়কদের ভবিষ্যতে মোটা চাকুরী ও মোড়লী নির্ভর করছে।

কিন্তু স্বয়ং প্রকাশবাবু এখনো ইন্দ্রনাথের কাছে একটি রহস্য। কারাগার নির্যাতন অজ্ঞাতবাস—রাজনীতির জন্য, দেশের কাজের জন্য, প্রকাশবাবু জীবনে একদিন কোন্ দুঃখ না বরণ করে নিয়েছিলেন? আদর্শের জন্য সর্বস্ব খুইয়ে যাঁরা পথে নেমে পড়েন, পথের ধূলোকে যাঁদের জীবনের শোণিতবিন্দু গৌরবে মহনীয় করে তোলে, প্রকাশবাবু তো সেই বিরল পথিকার মানুষের মধ্যে একজন। ইন্দ্রনাথের কাছে সে-ইতিহাসের কিছুই অজ্ঞাত নেই। এক মুহূর্তের সংশয়ে সেই শ্রদ্ধার বন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারে না। আজ প্রকাশবাবু প্রৌঢ় হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এই একটি পরিবর্তন ছাড়া আর এমন কি ঘটতে পারে, যার জন্য সেই চিরকালের প্রদীপ্ত প্রকাশবাবু একেবারে নিভে যেতে পারেন? সংসারে এমন কোন্ মারের ছলনা আছে, যা প্রকাশবাবুর মত কঠিন ব্যক্তিত্বকে পথ ভুল করিয়ে দিতে পারে?

প্রকাশবাবুকে চেনবার জন্যই যেন ইন্দ্রনাথ এখনো সংঘের আনাচে-কানাচে একরাশ সংশয় ও কৌতূহল নিয়ে ঘুরছে।

জাগৃতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনের আয়োজনটা চমক্ লাগিয়ে দেবার মতই। সভ্য, কর্মী, দরদী, দর্শক ও নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে টাউন হলের জঠর মুণ্ডাকীর্ণ। নানা প্রদেশের প্রতিনিধির দল এসেছেন। দেশী ও বিদেশী কয়েকটি প্রেসের সংবাদদাতা ও প্রতিনিধিরা আছেন। কয়েক

মাসের মধ্যেই জাগৃতি সংঘের কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে, আজকের অধিবেশনের উৎসাহ ও ভিড়টাই তার প্রমাণ। একে অস্বীকার করা যায় না। এত দেখেও যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা নিছক নিন্দুক ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা এখানে আসবেই বা কেন ?

কিন্তু হলের পেছনে কতকগুলি ছেলেকে দেখা যাচ্ছে—একটু বিমর্ষ, নিরুৎসাহ ও বোকা বোকা দৃষ্টি। জাগৃতি সংঘের কয়েকজন কর্মী বার বার ঘুরে এসে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে এই নিরুৎসাহ ছেলেগুলির আপাদ-মস্তক পরীক্ষা করে চলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি কর্মী সেখানে একটা টুল নিয়ে এসে রাখলো। একটি পুলিশ সার্জেন্ট বেল্টনিবদ্ধ রিভলভারটির ওপর একবার হাত বুলিয়ে, হেলমেটটা কোলের ওপর নামিয়ে টুলের ওপর শক্ত হয়ে বসলো। জাগৃতি সংঘের কর্মীরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে চলে গেল।

দেয়ালভরা পোস্টার সাজানো। সবচেয়ে বড় পোস্টারটা দেখবার মত—কয়েকটি গাঁয়ের মেয়ে বঁটি হাতে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টারের ছবির মর্ম নীচেই লেখা আছে—'চট্টগ্রামের চাষী মেয়েরা জাপানীদের রুখিবে।'

একদল শ্বেতাঙ্গ দর্শক বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে পোস্টারগুলিকে দেখছেল। —Are those knives sharp enough ? What a hoax ! Pooh ! কতগুলি অস্পষ্ট মন্তব্য বিদ্রূপ ও রসিকতা হঠাৎ উচ্চ হাসির হর্‌রা জাগিয়ে তুললো। নিকটেই কয়েকটি কর্মী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। মন্তব্যগুলি শুনে নিয়ে, ঢোঁক গিলে, আবার শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

পেছনের বিমর্ষ ভিড়টার ভেতর একটি ছেলে পাশের বন্ধুটিকেই বোধ

হয় বলছিল—যাই বল, এরাই কিন্তু বেশ জমিয়ে তুলেছে ভাই। নিন্দে করলে আর কি হবে?

উত্তর এল এক অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখ থেকে।—বাদ্‌লার দিনে বাদ্‌লা পোকারাই বেশ জমিয়ে তোলে ভাই। ওদেরই তখন বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলে বাদ্‌লা পোকারাই সত্য নয়। ঝড় আসুক ভায়া, তখন দেখবে কারা থাকে আর কারা উড়ে যায়।

আবার একটা হাসির হর্‌রা উঠলো। পুলিশ সার্জেন্ট ঘাড় ফেরালেন।—ইউ, হল্লা মৎ করো!

হল্লা সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল। সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

সভাপতি কার্যতালিকাটি হাতে তুলে ঘোষণা করলেন।—প্রথমে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কবিতা।

আবির্ভূত হলেন কবি রণজিৎ দে। মেঘনাদের মত গভীর স্বরে আবৃত্তি করলেন,—

অভিশপ্ত বুসিডো
 নিপ্পনী সূর্যের তেজ দৃঢ়.
য়ামাতো দামাশি
 শেষ কাশি কাশে।

কবি রণজিৎ হঠাৎ দুর্বার আবেগে কাঁপতে লাগলেন—

চূর্ণ কর, চূর্ণ কর
 গেস্তির স্বপন,
মিকাডোর ব্যাদিত রসনা
ভোঁতা ভোঁতা ভুরুর ছলনা।
তোল হাত, হাতিয়ার ধর

য়ামাতো গোকোরো
কাঁপে থর থর।

হাততালির শব্দ না থামতেই সভাপতি ঘোষণা করলেন।—দ্বিতীয়, ফ্যাসিস্তবিরোধী গান।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলালের ইঙ্গিত মতি চারটি মেয়ে উঠে এসে স্বর ধরলো।—

অশথ কেটে বসত করি
জাপানী কেটে আলতা পরি···

মঞ্চের ওপরেই উপবিষ্টদের মধ্যে কে একজন বাধা দিয়ে বললেন—জঘন্য!

ডাক্তার মুখার্জির মন্তব্য। সভাপতির দিকে তাকিয়ে তিনিই কথাটা বললেন। পাশে বসে সিতা বসু আস্তে আস্তে বললো।—থাক্ কাকাবাবু, আপনি কেন আর······।

গানটা শেষ হলে সভাপতি তবু ডাক্তার মুখার্জিকে তাঁর আপত্তি ব্যক্ত করবার সুযোগ দিলেন না। ডাক্তার মুখার্জি সভাপতিকে বললেন,—জাপানীদের কেটে আলতা পরার সখ কেন মশাই? এটা কোন্ ধরণের কম্যুনিজম? আমাদের বিবাদ জাপানের পররাজ্যলোভী শাসকদের কারসাজির সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ গরিব দুঃখী নিরীহ জাপানীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমার দেশের ছেলেমেয়েদের মনে এই ধরণের জাতিগত ঘৃণা ছড়াবার জন্য কার অর্ডার পেয়েছেন?

হলের শ্রোতার দল শুধু বুঝতে পারলো, ডায়াসের ওপর একটি ছোট-খাট বচসা বেঁধেছে। স্পষ্ট করে কিছু বোঝবার আগেই সবাই দেখলো, ডাক্তার মুখার্জি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

সভাপতি ঘোষণা করলেন।—তারপর, সোভিয়েট-সৌহার্দ্যের মিউজিক্।

জন-সাঙ্গীতিক নামে সম্প্রতি-পরিচিত কমরেড গণেশ চট্টোপাধ্যায় চাষাদের ঢঙে মাথায় গামছা বেঁধে, গলায় একটা মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে আসরে নামলেন। মৃদঙ্গের বাজনার সঙ্গে বোল আরম্ভ হলো।—

কিট্ কিট্ কিট্ ধাং ঝেঙ্কু
টিঁমোশেঙ্কু।
ধেক্ ধেক্ ধো ধো,
কিরিটি কিরিটি
প্রলিটারিয়াটি
দিমিদ্রাং দ্রিমি-ভুনিয়াং।
থো থো থো থোক্কু থোরে
রুশ্যা রে! রুশ্যা রে!

শ্রোতাদের সুরুচিবোধের সকল সংযম ও মাত্রার ওপর কমরেড গণেশ যেন বে-পরোয়া চাঁটি মেরে চলেছিল। হলভর্তি জনতার গাম্ভীর্যের বাঁধ আর অটুট থাকা সম্ভব ছিল না। হাসি হল্লা আর টিট্কারির সহস্র ফোয়ারা যেন হঠাৎ মুখর হয়ে কিছুক্ষণের জন্য সভার কাজ পণ্ড করে দিল।

হাসাহাসির ঝড়ের মধ্যে দর্শকদের এক একটা মন্তব্য জ্বালাভরা বিদ্যুতের মত ঠাট্টায় ঝল্সে উঠছিল।—'মলোটোভকে কেউ একটা তার করে দাও হে, এসে দেখে যাক্ রুশপ্রীতির ছিরি।'

'ডোবালে, সব ডোবালে, গনা রে, তোর মনে এতও ছিল!'

'ও কালামুখে আবার রুশিয়ার নাম কেন? তোরাও কম্যুনিস্ট গড়ের গুগ্লি বলে আমি হব শঙ্খ। ছোঃ।'

জাগৃতি সংঘের কর্মীরা বিচলিত হয়ে পড়ছিল। জয়ন্ত মজুমদারের মাথায় কশাক টুপি হেলে পড়ছিল। প্রকাশবাবু পার্থসারথির মত

কর্মীদের কানে কানে অভয়ডিণ্ডিম বাজিয়ে গেলেন।—Steady! বিদ্রূপ আর কুৎসা শুনে ঘাবড়ে যেও না। এর চেয়ে আরও অনেক বড় বড় সংকটের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের উপদ্রব তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে এন না। এখন বৃথা শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই। তৈরী হয়ে থাক, সিভিল ওয়ারের দিন ঘনিয়ে আসছে।

কিন্তু এদিকে দর্শকদের গ্যালারির একটা দিক খালি হয়ে গেছে। সভা শান্ত হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপনের পালা আরম্ভ হলো।

কমরেড হাবুল দত্তের প্রস্তাব: জনৈক ব্রিটিশ সৈনিক কোন্ এক ভারতীয় স্ত্রীলোকের মর্যাদা হানি করিয়াছে, এই সংবাদে যেসকল লোক উষ্মা প্রকাশ করিতেছে, এই সভা তাহাদিগকে পঞ্চম বাহিনী বলিয়া গণ্য করে। তাহারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধোদ্যোগ ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

...স্বরূপরাম এণ্ড কোম্পানির ইস্ক্রুপের কারখানার মাগ্যি ভাতা দাবি করিয়া স্ট্রাইক ঘটাইবার জন্য যে সকল ভূঁইফোড় মজদুরবন্ধু শ্রমিকদিগকে উস্কানি দিয়াছে, এই সভা তাহাদের নিন্দা করিতেছে।

...সভা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে যে, জাগৃতি সংঘের কর্মীদের চেষ্টায় স্ট্রাইক ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মজুরেরা কাজে যোগদান করিয়াছে।"

হাবুল দত্তের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে আরও একদল সভা ছেড়ে চলে গেল।

হাবুল দত্তের প্রস্তাবের মধ্যে নেহাৎ বেফাঁস যেন একটা ঠুঁটো নিষ্কর্মবাদের ইঙ্গিত ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটা চাপা দেবার জন্যই বোধ হয় জয়ন্ত মজুমদারের প্রস্তাব একটা জঙ্গী পাঁয়তাড়ার মত সহর্ষে দেখা দিল।

"এই সভা সর্ববিধ শান্তিবাদ, অর্থাৎ প্যাসিফিজ্‌মের নিন্দা করিতেছে। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস এতদিন 'সংগ্রামের' ছুতা করিয়া শুধু নিষ্ক্রিয়তার চর্চা করিয়াছে। তাই আমরা 'ওয়ার' করিতেছি। এই যুদ্ধ আমাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনিতেছে। পরিবারবন্ধন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সতীত্ব পতিত্ব মাতৃত্ব ভদ্রতা ইত্যাদি সব পেটি বুর্জোয়া সংস্কার অন্নাভাবের গুঁতায় গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। কী বিরাট পরিবর্তন! কী আনন্দ! এই পরিবর্তনের উপর আমাদের নতুন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। এই যুদ্ধের রুদ্ররূপ আমাদের জীবনে একটি পরম পরিণামের সন্দেশ আনিয়াছে।"

—প্রতিবাদ করা উচিত ইন্দ্রবাবু। কথাটা যারা বল্‌লো তারাও জাগৃতি সংঘের সভ্য। তারা জাগৃতি সংঘের পাঁকের মধ্যে থেকেও যেন নেই। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তারা বক্তৃতামঞ্চের পেছনে এক কোণে বসেছিল। ইন্দ্রনাথের মতই তারাও সংঘের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সব চুকিয়ে দিয়ে খসে পড়ার আগে তারা যেন শুধু সংঘের গায়ে ভাঙা ডালের মত ঝুল্‌ছে।

জয়ন্ত মজুমদারের বিচিত্র সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে ইন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে স্কুল-মাস্টার আশুবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে আপত্তি করে উঠলেন।— 'দুর্ভোগ ভোগা অর্থ পরিবর্তন নয় মশাই।'

মঞ্চের নীচে প্রথম সারির চেয়ার থেকে এক ভদ্রলোক পাল্টা প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রনাথ চিনতে পারলো—ইনিই অধ্যাপক সুকুমার মুস্তফী। মাথার টাক আর মার্ক্সবাদ, এই দু'টো জিনিসকেই অধ্যাপক সুকুমার একই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন।

অধ্যাপক সুকুমার আশুবাবুকে একটি ধমকে যেন দমিয়ে দিলেন।—কে বললে এটা পরিবর্তন নয়? লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট কনফেডারেশন

অব্ লেবারের গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী আদ্রিয়েভ মিলিমিরোরস্কির মত মার্ক্সবাদী স্কলার তাঁর আত্মজীবনীর একশো ছাপান্ন পৃষ্ঠায় কি লিখেছেন, প্রতিবাদ করার আগে মশাই সেটা একবার পড়ে এলেই ভাল করতেন।"

এরপর, বিনা বিসংবাদেই জয়ন্ত মজুমদারের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

কমরেড দিনেশ পুরকায়স্থের প্রস্তাব: "যুদ্ধজনিত এই পরিবর্তন ও ভাঙনের সুযোগে দেশের শাসনযন্ত্রটি যেন কংগ্রেসের মত কোন সংঘবদ্ধ ফ্যাসিস্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে গিয়া না পড়ে, তাহার জন্য এখনই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাগৃতি সংঘের সাম্যবাদী পন্থায় বিশ্বাসী সভ্যদিগকে একে একে নতুন চাকুরির পদগুলি অধিকার করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যত এমার্জেন্সী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের পোস্টগুলি ক্যাপচার করিয়া লইতে হইবে।"

প্রস্তাব সমর্থিত ও গৃহীত।

কমরেড পরিতোষ সরকারের প্রস্তাব: "কণ্ট্রোলের লাইনের ভিড়ে মুসলমান ভাইদিগের চাউল পাইতে বড়ই কষ্ট ও বিলম্ব হয়। এমন অভিযোগও শুনা যায় যে, দোকানের হিন্দু কর্মচারীরা বাছিয়া বাছিয়া মুসলমানদিগকেই মোটা চাউল দেয়, হিন্দুরা সরু চাউল পায়। পাকিস্থানী গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রচারক আবু মোর্তাজা মুসলমানদিগের জন্য ভিন্ন কণ্ট্রোলের দোকান ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, জাগৃতি সংঘ সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছে।"

প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত।

কমরেড তড়িৎ চট্টরাজের প্রস্তাব: "এই সভা প্রস্তাব করে যে, অবিলম্বে দেশের সর্বত্র লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আমাদের জাগৃতি সংঘকে লোকে বিশ্বাস করিয়া চাঁদা দিলে বন্যার্ত এবং

ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে পারি। অবশ্য উহা ফাসিস্ত-বিরোধী প্রথায় পরিচালনা করা হইবে। কিন্তু লঙ্গরখানাগুলির মারফৎ কতকগুলি পঞ্চমবাহিনী কর্মী সাজিয়া জনসাধারণের কানে জাতীয়তার মন্ত্র পড়িয়া দিতেছে। পঞ্চম বাহিনীকে জনতার সংস্পর্শে আসিতে এইরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত নহে।"

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত।

সভাপতি হাঁক দিলেন।—এইবার কমরেড ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব। প্রকাশবাবু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

ইন্দ্রনাথ আরম্ভ করলো।—"আমরা বিশ্বাস করি, এই যুদ্ধে হিটলারী জার্মানীর আক্রমণে সোভিয়েট রুশিয়া পরাজিত হলে সভ্যতার ক্ষতি হবে। মানুষের স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে।

ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ ও আমেরিকা আজ সোভিয়েট রুশের মিত্ররূপে নিজেকে ঘোষণা করেছে—চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ফাসিস্তির বিনাশের এই সংগ্রামে সোভিয়েট রুশিয়া বার বার ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সত্যিকারের সহযোদ্ধৃরূপে পেতে চাইছে। সোভিয়েট রুশিয়ার একমাত্র দাবি—দ্বিতীয় ফ্রণ্ট।

কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রণ্ট কি? সোভিয়েট ভূমির অকৃত্রিম সুহৃদ্ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে—সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর নাৎসী আক্রমণ থাক্‌তে থাক্‌তে অর্থাৎ সম-সময়ে যদি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জার্মানী-অভিযান আরম্ভ করে, তারই নাম দ্বিতীয় ফ্রণ্ট। এই 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট' আমরা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করবো।

কিন্তু নাৎসী-আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া যদি একা লড়াই করে শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারে, এবং তার পরে যদি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জার্মানী-অভিযান আরম্ভ করে, তার নাম

সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় ফ্রণ্ট'। সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আমরা সমর্থন করি না।

সুতরাং, সভা প্রস্তাব করে যে, স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খোলা পর্য্যন্ত আমরা এই যুদ্ধ সমর্থন করবো না।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবি নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করা হোক্। জাগৃতি সংঘের কর্মীরা দেশের সর্বত্র 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট দাবি'র মিছিল মিটিং ও প্রচার আরম্ভ করুক। আমরা ডেমোক্রেসির সদিচ্ছা যাচাই করে দেখতে চাই। সোভিয়েট রুশের শুভাশুভের উপর আমাদের সর্বস্ব যখন নির্ভর করছে, তখন আমাদের আর চুপ করে থাকলে চল্‌বে না। আজ থেকে 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট' আন্দোলন আমাদের সংঘের কর্মজীবনের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করুক্।"

একটা অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি তুলে প্রকাশবাবু ইন্দ্রনাথকে দেখছিলেন। জয়ন্ত মজুমদারের মত আরও কয়েকজন সংঘ-সারথি ব্যতিব্যস্ত হয়ে সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরছিল। উর্মিলা কাঞ্জিলাল প্রকাশবাবুর চাউনি থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে সভ্যদের মধ্যে একটা গোপন উৎসাহ ছড়িয়ে বেড়ালেন কিছুক্ষণ।

ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলো। সভাপতি হেসে হেসে রায় দিলেন—প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে এসেছিল। সঙ্গীরা ধিক্কার দিল।—এবার হলো তো ইন্দ্রবাবু! সংঘের রুশপ্রীতি পরীক্ষা করতে চাইছিলেন, দেখুন এইবার। প্রীতির পাল্লা কোন্ দিকে ঝুঁকে রয়েছে, এখনো বুঝতে বাকি আছে নাকি আপনার? এ পলিটিক্‌স্ কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অগম্য। না, কোথাও একটা গলদ আছে ইন্দ্রবাবু। কোন্ বঁধুয়ার যেন মান রক্ষা করে চলেছে আপনার জাগৃতি সংঘ। হাত

তুলে একটা প্রতিবাদও করতে চায় না, যদি বঁধুয়ার গায়ে আঁচড় লাগে নইলে মানুষ কখনো এত যুক্তিভ্রষ্ট কথা বলতে পারে? থাকুন আপনি আমাদের কিন্তু আজ থেকেই ইতি। আপনার জাগৃতি সংঘ আর পার্টি একটি বিশুদ্ধ প্রপঞ্চবাহিনী।

সত্যি সত্যি তারা চলে গেল। ইন্দ্রনাথের মনের ভেতরটা একটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। এই সঙ্গীদের ভাল করেই চেনে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ জানে তারা কি আশা করে এসেছিল, যাবার সময় কি হতাশ্বাস আর গঞ্জনা নিয়ে চলে গেল। যাক্, এরা চলে গেলে জাগৃতি সংঘের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বই কমবে না।

সভাপতি তখন জাগৃতি সংঘের এই ক'মাসের ফ্যাসিস্তবিরোধী ও জনরক্ষা কীর্তির একটা ফিরিস্তি পড়ে সভা শেষ করে আনছিলেন—এই ক'মাসেই জাগৃতি সংঘ তাদের কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রচারপত্রে সাতশো সই যোগাড় করেছে, ডাক্তার খোপ্ড়িওয়ালার চব্বিশটা ফটো বিক্রি করেছে, দক্ষিণ কলকাতায় পঁচিশটা স্লিট ট্রেঞ্চের ঘাস ছিঁড়ে পরিষ্কার করেছে।

বিপিন বললো।—ঐ দেখুন বাবু, ঐ সেই কেউটেনী।

অবনী দেখছিল, একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ট্রাম স্টপের কাছে কপট কান্নার সুরে চীৎকার করে ভিক্ষে করছে। মাঝে মাঝে শুকনো কাঁকড়ার মত বিকৃত একটা শিশুর শরীরকে এক হাতে তুলে ধরে যেন পথিকদের উদাস দয়াবৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছে।

বিপিন বললো।—ওরই নাম পুনি কেওটানী।

অবনী।—আর ঐ ছেলেটিই বুঝি…

বিপিনবাবু।—হ্যাঁ, ঐ আমার টুনা।

পুনি কেওটানী ভিক্ষে করছিল। টুনার এই জীর্ণ মানবীয় আকৃতিটাই পুনির উপজীবিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়, টুনার শরীরটা পুনির একটা ভিক্ষাপাত্র মাত্র—পথিকের হাতের কাছে তুলে ধরছে, চোখের সামনে ছুলিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা পায়ের কাছে মাটিতে পেতে দিচ্ছে। মহাজন পুনি টুনার গর্ভধারিণীকে টাকা ধার দিয়েছে—তার সুদ চাই। সুদ তুলে নিতে একটুও ক্রটি করছে না পুনি—কারবারের নিয়মে ক্ষমা বলে কোন জিনিস নেই।

টুনার দৌলতে সুদ মন্দ আদায় হয় না। টুনার চোপ্‌সানো মাথা কাঁপতে থাকে, কখনো হেঁচকি তোলে—মাঝে মাঝে গলনালী ভেদ করে একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ ছাড়ে। হঠাৎ কোন বিবেকবান পথিক দয়ার ঝোঁকে একটা ডবল পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সকাল-সন্ধ্যা পথে পথে আয়ুর এক-একটি মুহূর্ত উৎসর্গ করে টুনা যেন মাতৃঋণের সুদ শোধ করে। পুনি কৃতার্থ হয়।

অবনী বিপিনকে জিজ্ঞেসা করলো।—টুনার মা কই ?

বিপিন।—সেই খবরটাই তো পাচ্ছি না বাবু। আমি শুধু ওর গর্দানটা একবার বাগে পেতে চাই। পুনিকে দূষে আর কি হবে ? পুনির মত কেউটেনী ডাইনীর হাতে পেটের ছেলেকে যে-রাক্ষসী ছেড়ে দিয়ে গেছে, তাকে আমি একবার দেখে নেব বাবু। একবার পেইছি কি ওর মাথাটা ছেঁচে ছেঁচে···।

বিপিন কঠোর হয়ে উঠছিল। অবনী ধমক দিল।—চুপ কর।

কিন্তু অবনী কোন কর্তব্য খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পুনি কেওটানীর কীর্তি দেখছিল অবনী। বোধ হয় ঠিক এই চাক্ষুষ কীর্তিটা নয়, তার আড়ালে এক অমানুষিক অপমানের ইতিবৃত্তটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একটু মনস্ক হয়ে নিয়ে অবনী আবার জিজ্ঞেসা করলো।—বিপিন ?

বিপিন।—আজ্ঞে।

অবনী।—ছেলেকে চাও ?

বিপিন।—হ্যাঁ বাবু।

অবনী।—তাহ'লে পুনিকে ডাকি ?

বিপিন।—হ্যাঁ বাবু।

অবনী।—তুমি ছেলেকে নিয়ে চলে যেও, আমি পুনিকে টাকা দিয়ে দেব। কেমন ?

বিপিন।—না বাবু।

অবনী আশ্চর্য হয়ে তাকালো।—তার মানে ? ছেলেকে চাও না ?

অপরাধীর মত বিবর্ণ মুখে বিপিন উত্তর দিল।—না।

অবনী রাগ করে বললো।—আমাকে ভুগিয়ো না বিপিন। স্পষ্ট করে বল, তুমি কি চাও।

বিপিন।—পুনিকে বলে কয়ে টুনার মাকে একবার ডাকিয়ে দেন বাবু।

অবনী অপ্রস্তুতের মত প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি নিয়ে বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভীরু লম্পটের মত একটা নির্বাসিত লজ্জার ছায়া বিপিনের মুখের ওপর যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল। কি চায় বিপিন ? তার কথাবার্তার সমস্ত অর্থহীনতার আড়ালে কি যেন একটা আবেদন ছটফট করছে। অবনী হঠাৎ নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো।

হাত তুলে ইশারা করে পুনি কেওটানীকে ডাকলো অবনী। পুনি কিছুক্ষণ চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে অবনীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সশ্রদ্ধ ভয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে একটা প্রণামও জানালো।

পুনি বললো।—আপনি ডাকলেন বলেই এলাম। ঐ মুখপোড়া ডাকলে আসতাম না।

পুনি বিপিনের দিকে ভেংচিয়ে একটা ধিক্কার দিল। অবনী বললো।—তুমি আমাকে চেন ?

উৎসাহিতভাবে শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে পুনি উত্তর দিল।—আপনাকে চিনবো না বাবু? আপনার ছেলেদিগের সাথে আমাদের রোজই দেখা হয়।

বুঝতে দেরি হলো না অবনীর। কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য অবনী বললো।—এটা কিন্তু তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছ, ছেলেটাকে এভাবে……।

পুনি কেওটানীর কানে কথাগুলি বোধ হয় পৌঁছয়নি। তার মনের ভেতর যে-প্রসঙ্গটা সাড়া দিয়ে উঠেছে, তারই প্রতিধ্বনি করে পুনি বলে উঠলো।—কংগ্রেসের ছেলেরা বলছে, ভিক্ষে করো না। আমরাও বলেছি, না করবো না। কিন্তু খেতে তো হবে।

অবনী।—ভিক্ষে করেই বা ক'দিন খাওয়া জুটবে ?

পুনি।—তা জানি বাবু। ভিক্ষে করতে কি সাধ যায়! তাছাড়া আমার আবার কেউটেনীর মত রাগ। ভিক্ষে করা কি আমার মত লোকের মেজাজে সয় বাবু? ইচ্ছে করে ট্রেমের বাবুগুলোর নাকের ওপর থাবড়া মেরে চশমাগুলো নামিয়ে দিই। তাই হবে একদিন। তারপর গঙ্গায় ডুবে মরবো—ভবযন্ত্রণা চুকে যাবে।

পুনি অন্যমনস্ক হয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কি ভাবলো। অস্থিসার রুক্ষ মূর্তিটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। পুনি বললো।—তাই করবো বাবু, কংগ্রেসের ছেলেরা যা বলেছে। বড়লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করে লাভ নেই। ভিক্ষে দেবে না। মরণ লেখা আছে আমাদের কপালে। ওদের চালের ভাঁড়ারে হানা দিতে হবে, যতক্ষণ না মরি। তাই ভাল।

পুনি কেওটানীর কোলে বসে টুনা চিঁ চিঁ করে কেঁদে উঠলো। পুনি

বললো।—মর্ মর্, শীগগির মর্। রাক্ষুসে বাপের ঘরে জন্মেছিস্, মরলেই তোর শান্তি। আমারও হাড় জুড়োয়।

বিপিন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবনী পুনিকে বাধা দিয়ে বললো।—থাক্ ওসব কথা। তুমি টুনার মাকে একবার ডেকে দাও। ওদের ছেলে ওদের হাতে দিয়ে দাও, তোমারও হাড় জুড়োক্।

—আসুন বাবু। পুনির আহ্বানে অবনী ও বিপিন পুনিকে অনুসরণ করে গর্‌চা লেন পার হয়ে একটা গলির ভেতর গিয়ে ঢুকলো। মজুরদের একটা চা-তেলেভাজার দোকানের সামনে, রাস্তার ওপর জলের কলের কাছে তিনটি তরুণ বয়সের মেয়ে হাসাহাসি করছিল। প্রত্যেকের হাতে একটা কলাই-করা থালা। প্রত্যেকেরই পরণের শাড়িগুলির পরিচ্ছন্নতা ও বাহারের কোন অভাব নেই। ঠোঙায় ভরে তেলে-ভাজা হাতে নিয়ে একটি লোক কাছেই দাঁড়িয়েছিল। লোকটার চেহারায় রসিকতার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু বেশ রসস্থ ভাব—গোঁপ চুমড়ে ফিক ফিক করে হাসছে। একটা মেয়ে কল থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে লোকটার গায়ে ছিটিয়ে দিল।

হাসির সোর না থামতেই পুনি কেওটানী হাঁক দিল।—ও টুনার মা।

ওদের মধ্যে সেই মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো, যার মুখ এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

পুনি একটু কঠোরভাবে আবার ডাকলো।—এস এইখানে!

এগিয়ে আসছিল টুনার মা। কপালে একটা বড় টিপ, গালভরা পান—একটি পরিপাটি রঙ্গিনী মূর্তি। এই কি টুনার মা? অবনী একটু বিস্মিত হয়ে দেখছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত চেহারা, চটুল সুন্দর এই মেয়েটিই কি বিপিনের বর্ণনার নির্দয়া রাক্ষুসী? মেয়েটী এগিয়ে

আসছে, যেন ঘাতকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, সমস্ত চৈতন্য সম্মোহিত হয়ে আছে।

বিপিন অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিল। অবনী বাধা দিতে গিয়েই দেখলো, বিপিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে।—সব গেল, আমার সব গেল বাবু।

অবনী।—কি গেল?

বিপিন—দেখছেন না বাবু, ও মে বেশ্যে হয়ে গেছে। ও মরে গেছে।

অবনীর প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল, বিপিনের মত গোঁয়ার গেঁয়ো হঠাৎ গৃহত্যাগিনী পত্নীকে মুখোমুখি পেলে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে না বসে। বিপিনের মেজাজ দেখে তাই মনে হতো। একটা হিংস্র বিক্ষোভকে যেন অতিকষ্টে প্রতীক্ষিত একটি মুহূর্তের জন্য এতদিন মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল বিপিন। সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু বিপিনের সব পৌরুষ সেই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতায় বলির পশুর মত রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। সহ্য করার শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

পুনি কেওটানি একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল বিপিনের দিকে। বিপিনের ফুঁপিয়ে-কান্নার শব্দটা পুনিকে ধীরে ধীরে বিচলিত করে তুলছিল। পর মুহূর্তে টুনার মাকে লক্ষ্য করে পুনি কেওটানী খেঁকিয়ে উঠলো।—তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আজও হলো না বৌ। ঐ সব নষ্ট ছুঁড়িদের রঙ্গ দেখতে তুমি কেন গিয়েছ? যার জন্য কেঁদে কেঁদে মাথা কুটতে, সে এসেছে। ছেলে নিয়ে, সোয়ামিকে নিয়ে এইবার সুখ কর। কেওটানীকে আর গালমন্দ করো না।

বিপিনের দিকে তাকিয়ে পুনি কি বলতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। বোঝা যায় একটা ফাঁপরে পড়ে পুনি যেন সহজে কোন পথ করে নিতে পারছে না। একটু এগিয়ে এসে বিপিনের কাঁধে হাত দিয়ে

কতকটা সান্ত্বনাচ্ছলে যেন পুনি বলতে লাগলো।—ও কি? পুরুষ হয়ে এ আবার কোন্ ঢঙ তোমার? ওঠ, নিজের জিনিস নিজে বুঝে নিয়ে ঘরে যাও। পুনি কেওটানীকে আর গালমন্দ করো না।

টুনার মায়ের প্রথম হতভম্বতা দূর হয়ে গিয়ে বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। নির্বিকারভাবে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল টুনার মা। কপালের টিপ্‌টা চিকচিক করছিল। দু'বার পানের পিক ফেল্‌লো। সহুরে ঢঙে পরা শাড়ির আঁচলা নিয়ে বার বার একটা অনভ্যস্ত অস্বস্তিতে টানাটানি করলো। তারই দীক্ষাদাত্রী ভ্রষ্টজীবনের অভিভাবিকা পুনি কেওটানীর কথাগুলি হঠাৎ একটা অতিগূঢ় ইঙ্গিত নিয়ে টুনার মায়ের চোখে শুধু কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। অবুঝের মত দাঁড়িয়ে থাকলেও, প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছিল টুনার মা।

বোধ হয় ভুল করে একবার মুচ্‌কে হেসে ফেলেছিল টুনার মা। পুনি কেওটানী একটু আড়াল করে ভুরু কুঁচকে ইশারায় যেন একটা ধমক দিল। মাথায় কাপড় নেই, বেহায়ার মত আঁচলা নিয়ে লোফালুফি করছে, পা পিক্ ফেলছে। কী দজ্জাল গোমুখ্যু মেয়ে! পুনি কেওটানী হা নেড়ে আবার আরও স্পষ্টভাবে ইশারা করলো—ঘোম্‌টা দাও।

টুনার মা যেন জেদ করেই বিদ্রোহিনীর মত দাঁড়িয়ে রইল। কেওটানী এইবার মুখ খুলে স্পষ্ট ভাষায় অনুযোগ জানালো।—কি বৌ, ভিক্ষে করলেই কি ছোটলোক হয়ে যেতে হয়? দেখছো না, কে এসেছে। চোখের মাথা খেয়েছ না কি? বিপিনকে চিনতে পারছে না? আর এই স্বদেশী বাবুটি রয়েছেন, তবু তোমার।…

টুনার মার ঠেঁটা চেহারাটা ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে এল। সবই বুঝতে পারছে সে। পুনি কেওটানি নিজেই তার ষড়যন্ত্রের জালের গিঁটগুলি একে একে খুলে আলগা করে দিচ্ছে। আড়ালের একটা কাহিনীকে আড়ালেই

শেষ করে দিয়ে, ঘরের বৌয়ের সম্ভ্রমে সাজিয়ে পুনি কেওটানী আজ টুনার মাকে মুক্ত করে দিতে চায়।

পুনি অবনীর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে সোৎসাহে বলছিল।—এতদিন মেয়েটা কি কান্নাটাই কেঁদেছে বাবু! খেতে চায় না, ভিক্ষে করতে চায় না। ভিক্ষে করবে কি? লোক দেখলেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।

ঘটনাটা সহ্য হচ্ছিল না অবনীর। ক্ষুধাহত একটা সংসারের প্রাণ সব বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও কেমন ছলেবলে আবার সরল হবার চেষ্টা করছে! পুনি কেওটানীর কথার চিকিৎসাগুণে বিপিন একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। টুনার মাথাটা পুনি কেওটানীর কাঁধের ওপর হেলে পড়েছে—বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। টুনার মা হঠাৎ ঘোম্‌টা টেনে দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে সেই রঙ্গিনী মূর্তিটার সব চটুলতা মুছে গিয়ে গভীর বিষণ্ণতায় করুণ হয়ে উঠেছে। এক দুঃখিনী গ্রাম্য বধূর মূর্ত্তি।

টুনার মা ঘোম্‌টা আর একটু টেনে দিল, সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা যেন অদ্ভুত ভাবে বদ্‌লে গেল। অবনী দেখলো, টুনার মা কাঁদছে—দীর্ঘ অদর্শনের পর স্বামীকে দেখে সব গেঁয়ো মেয়ে যেভাবে আনন্দে ও অভিমানে কাঁদে।

অবনী বললো।—আমি চললাম বিপিন। এখানে পথে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করো না। আমার বাসায় এস তোমরা।

শোনা গেল, পুনি কেওটানি বল্‌ছে—হাঁ তাই ভাল। চল বৌ, ওঠ বিপিন…।

অবনী একটু বিরক্তভাবেই অরুণাকে বলছিল।—এসব ব্যাপার নিয়ে

আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই অরুণা। চিঠিতে শিশির বাবু অনুরোধ করেছে, তাই একটু খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিপিন সমস্যাকে যত সোজা ভেবেছিলাম, দেখছি মোটেই তা নয়। অন্ততঃ আমার বুদ্ধি কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

অরুণা।—সমস্যাটা কিসের ?

অরুণার প্রশ্নের উত্তরে সমস্যাটা ততক্ষণে সশরীরে বাইরের বারান্দায় এসে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুনি কেওট্‌নী ডাকছিল।—বাবু, আমরা এসেছি।

সমস্যাটাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছিল সবাই—অরুণা জোছু পিসিমা। পুনির আহ্বান শুনতে পেয়ে সবাই এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পুনি উত্তেজিতভাবে চীৎকার করছিল।—আপনি মীমাংসা করে দিন বাবু। এদের দু'জনারই মাথা খারাপ হয়েছে।

অরুণা জিজ্ঞেসা করলো।—কি হয়েছে ?

পুনি।—ছেলেকে নিতে চাইছে না মা। না ছেলের বাপ, না, ছেলের মা।

অরুণা টুনার মায়ের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।—কি গো, তুমি এরকম করছো কেন ? এইবার ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে নাও, বুড়ি আর কতদিন পুষবে ?

অরুণার কথায় টুনার মা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

পুনি টুনাকে কোল থেকে নামিয়ে বারান্দায় মেজের ওপর শুইয়ে দিল। পিসিমা ও জোছু একটা আর্তনাদ করে সরে এল।—ইস্, এ ছেলে কি বাঁচবে ?

অবনী ধৈর্য হারিয়ে বিপিনকে ধমক দিল।—তুমি স্টুপিড এতদিন ছেলের জন্য হাঁউমাউ করছিলে, এখন ছেলেকে নিতে চাইছ না কেন ?

বিপিন ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

পুনি কেওটানী বললো।—আপনি সাক্ষী থাকুন মা, এদের ছেলেকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি চল্লাম।

পুনি কেওটানী চলে যাচ্ছিল। অবনী ব্যস্ত হয়ে ডাকতে যাচ্ছিল। অরুণা বাধা দিয়ে বললো।—ওকে আবার কেন ?

অবনী।—ওর টাকা পাওনা আছে। তের টাকা ধার দিয়ে টুনাকে বন্ধক নিয়েছিল।

অরুণা।—ও-বুড়িকে দেখলে কেমন ভয় করে। যদি টাকা চাইতে আসে, তবে দিয়ে দেওয়া যাবে। ও চলে যাক্, ডেক না।

পুনি কেওটানী ততক্ষণ অনেক দূর চলে গিয়েছিল। অবনী সেই দিকে তাকিয়ে বিড় বড় করে বললো।—যেন পালিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। অদ্ভুত !

সবচেয়ে আগে আর্তনাদ করলেন পিসিমা, তাঁরই চোখে দৃশ্যটা সবার আগে ধরা পড়েছে। টুনার শরীরটা শুধু পড়েছিল মেজের ওপর। কিন্তু টুনা আর ছিল না। নিষ্প্রাণ টুনার শব মাত্র এক হাত জায়গার পবিত্রতাকে আবর্জনার মত কলঙ্কিত করে স্থির হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পিসিমা স্নান করতে চলে গেলেন। অরুণা অবনী আর জোছু—তিনটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মূর্তি চুপ করে ঘরের ভেতর গিয়ে বসে রইল।

আলো জ্বালবার পর অরুণা প্রথম কথা বললো।—ওরা সবাই চলে গেল নাকি ?

অবনী।—আমাকে আর ওসব প্রশ্ন করো না।

অরুণা।—কিন্তু শিশিরবাবু যে লিখলেন……।

অবনী।—চেষ্টা করে দেখ, আমাকে আর এর মধ্যে ডেক না।

অরুণা যেন একটু ঠাট্টা করলো।—তুমিও হাঁপিয়ে পড়ছো দেখছি।

অবনী।—তুমি তো তাজা আছ। আমার হাঁপানি একটু লাঘব করার চেষ্টা করতে পার কি ?

অরুণা উঠে গিয়ে একবার বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে এল।—না, ওরা যায়নি। দুজনে দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে দুকোণে বসে আছে।

অবনী।—থাক্, ওদের ব্যাপার নিয়ে আর······

অরুণা আশ্চর্য হলো। অবনী যেন এই ক্লিন্ন আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা পরিচ্ছন্ন নিঃশ্বাস খুঁজছে, দূরে সরে থাকতে চাইছে। সত্যিই কি হাঁপিয়ে পড়লো অবনী ?

অরুণা।—তুমি এরকম উপেক্ষা দেখাচ্ছ কেন ?

অবনী।—উপেক্ষা নয়, তোমাদের ওপর রাগ হচ্ছে।

অরুণা।—কেন ?

অবনী হাসলো।—তুমি জান, কত রকম কাজের দাবীতে আমি এমনিতেই পাগল হয়ে আছি। তার ওপর, দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব বিরহতত্ত্ব —এই সব হোম পলিটিক্সের মধ্যে মাথা ঘামাবার সুযোগ কই আমার ? তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে একটু হাল্কা করে দিতে পার অরুণা। তোমার উচিত ছিল···।

অরুণা।—হোম পলিটিক্সের ভার নেওয়া।

অবনী।—হ্যাঁ।

অরুণা।—তবে শিশিরবাবুকে চিঠি লিখে দাও, চলে আসুক্।

অবনী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। —শিশিরবাবুকে ? কেন ?

অরুণা গুছিয়ে কোন উত্তর দিতে পারলো না।

—কেন ? দ্বিতীয়বার অবনীর প্রশ্নে সচকিত হয়ে অরুণা উত্তর দিল। —ইন্দ্র কি আর এদিকে আসবে না ?

অবনী।—তুমি আরও গোলমাল করে দিচ্ছ। কথা এড়িয়ে যাচ্ছ।

অরুণা।—বিপিন আবার চলে না যায়।

অবনী। যাক্ চলে। তুমি বারবার ফাঁকি দিচ্ছ অরুণা।

অরুণা।—চলে গেলে কি করে হবে?

অবনী।—সৎকার সমিতিকে খবর দিয়ে দেব সকাল বেলা, মড়া তুলে নিয়ে যাবে।

অরুণা।—এর বেশি আর কিছু করবার নেই?

অবনী।—আর কি করবার আছে?

অরুণা।—থাক্ এসব কথা।

অবনী কাগজপত্র টেনে নিয়ে বসলো। অরুণা হেঁসেলে ঢুকবার আগে পিসিমার ঘরে উঁকি দিয়ে গেল—পিসিমা মালা জপছেন। পড়ার ঘরে উঁকি দিল—জোছু একটা খোলা বইয়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কোন সাড়া-শব্দ না করে অরুণা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কিকারণে যেন খুব খুশি দেখাচ্ছিল অরুণাকে। তার কল্পনার সীমানা ঘিরে কতগুলি কর্তব্য ভিড় করে আসছে। এই দায় তাকে তুলে নিতে হবে। অবনী অবনীর মত কাজে থাকুক—সেখানে এগিয়ে যাবার মত সামর্থ্য নেই তার। কিন্তু অরুণা অরুণার মত নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পারে। এই প্রেরণা তার অনুভব ছাপিয়ে যেন নেমে আসছে। শিশিরবাবু লিখেছেন—বিপিন তার বউ ফিরে পেলে সে খুশি হবে। কেন খুশি হবে শিশির? যাক্, এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বিপিনের ভাঙা ঘর জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শিশিরের অনুরোধ।

কতক্ষণ এভাবে আবিষ্টের মত বসেছিল, রাত কত গভীর হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেনি অরুণা। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অবনীর কাছে এসে বললো।—ওরা চলে গেল কি না, একবার দেখ তো?

অনিচ্ছা থাকলেও অরুণার সঙ্গেই আলো হাতে বাইরের দরজা খুলে অবনী এসে দাঁড়ালো। অবনী বললো।—ওরা চলে গেছে।

অরুণা বলে উঠলো।—না, ওরা যায়নি। বিপিন!

অরুণার ডাক শুনে বারান্দার এক কোণ থেকে ধড়ফড় করে একটা শায়িত মূর্তি উঠে বসলো। আলোটা তুলে ধরলো অবনী। টুনার মা লজ্জায় বিব্রত হয়ে ঘোম্‌টা টেনে দিল। তারই পাশে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল বিপিন। আর এক পাশে টুনার মায়ের আঁচলটা মাটিতে পাতা—তার ওপর টুনার শবটা যেন একটা সযত্ন আশ্রয়ে কুঁকড়ে রয়েছে।

বীভৎস! মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবনী ঘরে এসে ঢুকলো।

অরুণার মুখের ওপর একটা সুগভীর আনন্দের চাঞ্চল্য সুস্মিত হয়ে উঠেছিল। অরুণার ব্যস্ততা আরও বেড়ে গেল। অবনীর পেছু পেছু ঘরে ঢুকেই বললো—নাও, আর পড়তে হবে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়।

যুদ্ধ ইনফ্লেশন আর ঘুষঘোর আমলা—তিন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় মুনাফাবাজের কাছে সোনার ফেরদৌস হয়ে উঠলো কচুরিপানার বাংলা দেশ। বাঙালীর জীর্ণ মুণ্ডে যেন প্রচণ্ড এক জিজিয়া বসাবার ফরমান পেয়েছে তারা। সদরে, মফঃস্বলে, রাজধানীতে—খালের মুখে, মাঠের ওপর, গাছের তলায়—মৃত নিরন্নের মুণ্ডগুলি গুণতে পারলে এই অতিলোভী হিংসার একটা হিসাব দাঁড় করানো যেত।

তবু ব্যাঙ্কার কালীকিংকরবাবু নিদ্রার ব্যাঘাত অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়েছে। ঘুমের আবেশে যখন চোখের পাতা নরম হয়ে আনে,

তখনই হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসেন। ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকে অবসন্ন মস্তিষ্কটাকে চাঙ্গা করে তোলেন। মাঝ রাত্রে সুপ্তিশয়ান থেকেও হঠাৎ চমকে জেগে ওঠেন। চোখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিয়ে, টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপে দেরাজ থেকে ফাইল টেনে নিয়ে বসেন। অদৃশ্য রত্নপীঠের প্রহরী কোন যখের সমস্ত শঙ্কা নিষ্ঠা ও সংশয়ের দায় যেন হঠাৎ তাঁরই স্কন্ধে এসে চেপেছে। তাই প্রতি মুহূর্তে উদ্ব্যস্ত হয়ে থাকেন। হারাই হারাই সদা ভয় হয়—ঘুমিয়ে পড়লে যেন একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন কালীকিংকরবাবু। সেই সুষুপ্ত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা খণ্ডবিপ্লব হয়ে যেতে পারে। জেগে উঠেই হয়তো শুনবেন, আহিরীটোলার চালের ভাঁড়ার লুঠ হয়ে গেছে। অবনী নামে একটা কুৎসিত কালো ছায়া, তার পেছনে একটা কঙ্কালের পল্টন। ঘুষ অনুরোধ তোষামোদ ভীতি মৃত্যু তুচ্ছ করে তার চালের ভাঁড়ারের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে। দারোয়ানেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ফোন করলে পুলিশ আসে না, চিৎকার করে ডাকলে প্রতিবেশীরা কেউ সাড়া দিয়ে ছুটে আসে না। চালের ভাঁড়ার লুঠ হয়ে যায়। হায় হায়! বস্তা বস্তা সোনা যেন ছিঁড়েকুরে নিয়ে পালিয়ে যায় মেঠো ইঁদুরের দল। ফাইলের ওপরেই ঝিমোতে ঝিমোতে আবার চম্‌কে ওঠেন কালীকিংকর-বাবু। ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকতে থাকেন।

ছ' মাসে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার পিটেছেন। বাকি স্টকটাকে কোনমতে সেই চরম দরের দিনটা পর্যন্ত যদি বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে? উগ্র রকমের একটা আনন্দের জ্বালায় ছটফট করে ওঠেন কালীকিংকরবাবু। রেডি রেকনার খুলে পেন্সিল হাতে তখুনি কাগজের ওপর আঁকজোঁক সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়াতে পারে? পাঁচশো পার্সেণ্ট? ছ'শো? আটশো? হাজার পার্সেণ্ট হওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব? ভগবান

সকলকেই জীবনে ঠিক একটিবারের মত সত্যই সুযোগ দেন। যেমূর্খ সেই সুযোগ অবহেলা করলো, ইহকালের সুখের কপাটে বেড়ি পড়ে গেল তার। নইলে এই উনিশ বছর ধরে সুদ-চাটা ব্যাঙ্কারজীবনে শুধু দিনের পর দিন তাঁর শ্রম শক্তি মেধা বৃথা ক্ষয় হয়ে গেছে। পরধন পোদ্দারীর এই কীর্তিপথের শেষে শুধু একটা লালবাতির আলো অবধারিত পরিণামের মত এতদিন শিখায়িত হয়েছিল। তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কালীকিংকরবাবু। তিনি জানতেন—ব্যাঙ্ক ডুববে, নিজে দেউলে হবেন। এই তো সেদিন, গত বছর এপ্রিল মাসেই ব্যালেন্স সীটের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন কালীকিংকরবাবু। আজও সেকথা ভাল করেই তাঁর স্মরণে আছে। তাই আজ তাঁর সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে—ভগবান মাত্র একবার সুযোগ দেন, এবং সেই সুযোগ এসেছে।

এই ভাগবত বিধানের বিরুদ্ধেই অবনী নামে একটি ভুঁইফোঁড় জাতি-সেবক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। তাই কি বার বার কালীকিংকরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়?

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে গিয়ে প্রতিদিনের মত কালীকিংকরবাবু ভাবছিলেন, হিসেব করছিলেন, চিঠি লিখছিলেন। দারোয়ানের সংখ্যা আর কতই বা বাড়ানো যায়? একটা গোলমাল বাধলে তারাই বা কতটুকু করতে পারবে? মাঝখান থেকে বৃথা ভরসা দিয়ে সিতা কোত্থেকে আর একটা রগচটা লোক নিয়ে এল। চেকগুলো ফেলে রেখে তিরিক্ষে হয়ে চলে গেল ইন্দ্রনাথ। লোকটা নিশ্চয় এতক্ষণে অবনীনাথের কানে সব বৃত্তান্ত শুনিয়েছে। অবনীও এতক্ষণে বোধ হয় অহংকারে আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বেশ আছে স্বরূপরাম। তার ইস্কুপের কারখানায় অবনীর

চেলাচামুণ্ডারা স্ট্রাইক বাধাবার চেষ্টা করেছিল। সিতার জাগৃতি সংঘের ছোঁড়ারা নাকি লাল ঝাণ্ডা তুলিয়ে আর কুলির সর্দারগুলোকে বিনি পয়সায় তাড়ি খাইয়ে সিচুয়েশন বাগিয়ে ফেলেছে। অবনীর চেলাদের বদমাইসী ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ছোঁড়ারা বাহাদুর বটে। এর জন্য কত আর খরচ করেছে স্বরূপরাম ?

গুরুদয়ালবাবুও ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে গলাগলি হয়ে চুটিয়ে কারবার করছেন। বেশ আছে সবাই।

চা-পানের পর এই প্রশ্নটাই তাঁর চিন্তার ভেতর গুন্‌গুন্ করে ঘুরতে লাগলো। সবাই বেশ আছে। গুরুদয়াল আছে, স্বরূপরাম আছে। আর, আরও কত ভাগ্যবান রয়েছেন। কিন্তু শুধু তাঁরই বেলায় এই সঙ্কটের দুর্ভোগ কেন ?

চিন্তা করছিলেন কালীকিংকরবাবু। চিন্তায় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। হঠাৎ যেন এতদিনের একটা বদ্ধদৃষ্টি খুলে গেল কালীকিংকরবাবুর। বর্তমানের ভুলটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন—দেখে অনুতপ্ত হচ্ছেন। ভবিষ্যতের পথটাও সেই সঙ্গে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—দেখে খুশি হচ্ছেন।

জাগৃতি সংঘের ওপর হঠাৎ একটা মমতার আবেশে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন কালীকিংকরবাবু। এতদিন তাদের ভুল বুঝে কত কটূক্তি করেছেন, তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন—আজ নিজেকে সত্যই অপরাধী মনে করছিলেন তিনি। আজ তাঁর সেই সংশয়টি চরমভাবে ঘুচে গেছে। জাতীয়তা নামে কথাটার মধ্যে কোন জোর নেই, ভরসা নেই, প্রশ্রয় নেই। কংগ্রেস নামে প্রতিষ্ঠানটা আগে তবু একরকম ছিল। কিন্তু দিনে দিনে ওর মধ্যে বিষ ঢুকতে আরম্ভ করেছে। অবনীর মত লোকগুলিই ওর মধ্যে বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে। ওরা শুধু মুখে জাতীয়তার বুলি বলে, কিন্তু কাজের বেলায় চাষা ক্ষেপিয়ে জাতির জমিদারদের সায়েস্তা করতে

চায়। সুযোগ পেলেই জাতিসেবার নাম করে মজুর উস্কিয়ে জাতির কারখানা আর কারবারের ওপর উপদ্রব করতে আসে।

জাতি কথাটার ওপর ভয়ানক ঘৃণা বোধ করছিলেন কালীকিংকরবাবু। একটা আণ্ডিকেলে ছেঁদো বুলি। তার চেয়ে জন কথাটা ঢের সুন্দর, বেশ ছোট্টখাট্ট নতুন নামটি। বেশ প্রগ্রেসিভ। জাতীয়তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। অবনীর মত কংগ্রেসানুচর দুর্বৃত্তের মুখেও জাতীয়তার ধ্বনি। কংগ্রেসরথের লাগাম আর ভদ্রলোকের হাতে নেই—যত চাষা ভূষো আর জেলফেরত হাভাতে বেকার গ্র্যাজুয়েটের হাতে পড়ে এই কংগ্রেসটাই দেশে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

উদ্ধারের একটি মাত্র পথ আছে। স্বরূপরাম ও গুরুদয়ালবাবু যেভাবে উদ্ধার পেয়েছেন। কালীকিংকরবাবু ঠিক করলেন, তিনি জনতাবাদী হয়ে যাবেন, তিনি কম্যুনিস্ট হবেন। অবনীর জাতীয়তা থেকে বাঁচতে হলে জাগৃতি সংঘের জনতার সঙ্গে এক হয়ে না দাঁড়ালে আর উপায় নেই।

জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির নাম আজই বদ্‌লে দিতে হবে। আর দেরী করার সময় নেই। এবার থেকে নাম হবে জনবাণিজ্য সেবক সমিতি—কত শ্রুতিমধুর এই নতুন নাম! আজই সমিতির সভ্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করবেন কালীকিংকরবাবু। আজই তাঁরা একযোগে জাগৃতি সংঘের সদস্য হবেন।

জনবাণিজ্য সেবক সমিতি! কথাটা আবিষ্কার, না তাঁর অন্তরের একটা উপলব্ধি? নিজেকেই শতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন কালীকিংকরবাবু। আশ্চর্য, আজ শুধু ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তাঁর আহিরীটোলার গুদামের চাল আর কয়েকটি ঘণ্টা পরে জনতার খাদ্যে পরিণত হয়ে যাবে, অথচ সব কিছু তাঁরই রইল। নামের গুণ। আশ্চর্য।

একটা চিঠি লিখে শেষ করেই মুখ তুললেন কালীকিংকরবাবু। ঘরে ঢুকলো সিতা, সঙ্গে জয়ন্ত মজুমদার।

উপলব্ধি ও ঘটনার এই যোগাযোগ দেখে কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে ও আনন্দে শুধু অভিভূত হয়ে রইলেন কালীকিংকরবাবু। ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল।

সিতা বললো।—সেদিন আপনি নিশ্চয় আমার ওপর খুব রাগ করেছিলেন মেসো মশাই।

কালীকিংকরবাবু।—একটুও না।

সিতা।—আমারই ভুল হয়েছিল মেসোমশাই। ইন্দ্রনাথকে ডাকা উচিত হয়নি।

কালীকিংকরবাবু।—ঠেকে শেখা গেল। এই একটা লাভ। যাক্ অন্য একটা কাজের কথা ছিল।

একটু থেমে নিয়ে উৎফুল্লভাবে হাসতে হাসতে কালীকিংকরবাবু বললেন।—ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, যাঁর সঙ্গে এই কাজের কথাটা ছিল, যাঁর কাছে কিছুক্ষণ আগেই চিঠি লিখছিলাম, তিনি আজ নিজেই অভাবিত ভাবে এখানে উপস্থিত। আমার সৌভাগ্য দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

জয়ন্ত।—আমার কথা বলছেন?

কালীকিংকরবাবু।—হ্যাঁ।

জয়ন্ত।—বলুন।

কালীকিংকরবাবু।—জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির জাতীয়তা আজ থেকে বাতিল করে দেব, এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য চাই।

জয়ন্ত।—যথাসাধ্য করবো।

কালীকিংকরবাবু।—জাগৃতি সংঘের আইডিয়লজিকে আমরাও পালন করতে পারি কি না, সেই সুযোগ আমাদের দিতে হবে।

জয়ন্ত।—বলুন, কি করতে হবে।

কালীকিংকরবাবু।—আমরাও আপনাদের সংঘের সদস্য হব। দেশের লোকের জাতীয়তার স্বরূপ খুব চিনেছি। পেট ভরে গেছে আমাদের। ঐ ছেঁদো কথাটির ওপর আর আমাদের কোন শ্রদ্ধা বা আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত সস্মিত মুখে একবার সিতার দিকে তাকালো। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো—বাস্তবিক, কী আশ্চর্য যোগাযোগ! ওঁর কাছে আমি সবই শুনেছি। আপনার ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেও ওঁকে বলেছি, ঐ জাতীয়-ফাতীয় কথাগুলি বাদ দিলেই আমাদের সংঘে আপনারা বিনা বাধায় চলে আসতে পারেন। দেখছি, আপনি নিজেই আগে সেটা বুঝেছেন। আসুন আমাদের সংঘে। আপনাদের জনবাণিজ্য সমিতির ভেতর দিয়েই আমরা আর একটা ফ্রণ্ট খুল্‌বো।

কালীকিংকরবাবু চায়ের জন্য বয়গুলিকে ডাকাডাকি করছিলেন। অদ্ভুত রকমের একটা স্ফূর্তিতে তাঁর চিন্তাপীড়িত মনটা লঘু হয়ে উঠেছিল। এ রকম স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ বহুদিন পাননি তিনি—অথবা জীবনে এই প্রথম। হাস্যালাপের ফাঁকে ফাঁকে তবু এক একবার অন্যমনস্কের মত সিতার দিকে তাকাচ্ছিলেন, এটাও যেন একটি প্রশ্ন।

কালীকিংকরবাবু আশা করছিলেন, সিতাই কথাটা তুলবে এবং সেই কথার একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তিনি চূড়ান্তভাবে আশ্বস্ত হতে পারেন। তারপর সত্যই তিনি সুখী।

সিতা হয়তো ভুলে গেছে। অগত্যা কালীকিংকরবাবু নিজেই উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন।—আপনি নিশ্চয় জানেন জয়ন্তবাবু, অবনীনাথ নামে একটা ন্যাশনালিষ্ট একটা দল পাকিয়েছে।

ভূমিকা শুনেই জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলো—বুঝেছি, আর বলতে

হবে না আপনাকে। অবনীর কথা ভেবে আপনি মোটেই দুশ্চিন্ত হবেন না। জাগৃতি সংঘ রয়েছে কেন ?

তবু যেন একটা খট্‌কা রয়ে গেল। কালীকিংকরবাবু বললেন।—আমি বলছিলাম, এমন কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না, যাতে অবনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষের মধ্যে আদৌ আসতে না হয় ?

কিরকম যেন চিবিয়ে চিবিয়ে চোয়ালটা শক্ত করে কথাগুলি বলছিলেন কালীকিংকরবাবু।

জয়ন্ত বললো।—সংঘর্ষ হবেই, তার জন্য এখন থেকেই আমরা তৈরী হচ্ছি। তাই যেভাবে পারে, সংঘ আজ নিজেকে শক্তিশালী করছে। আপনাদের পেয়েও সংঘের শক্তি অনেকটা বাড়লো।

কালীকিংকরবাবু।—ধরুন, কতগুলি হাভাতে নিয়ে অবনী যদি একটা সত্যাগ্রহ করেই বসে, ঠিক তখন তার সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গেলে……।

জয়ন্ত হেসে ফেললো।—তা'হলে আপনি কি করতে চান বলুন ?

কালীকিংকরবাবু।—কিছু টাকাকড়ি দিয়ে যদি অবনীকে……।

জয়ন্ত।—কোন লাভ নেই। টাকা ও নেবে, গোলমাল করতেও ছাড়বে না। পঞ্চম বাহিনীদের স্বভাবই এই।

কালীকিংকরবাবু একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়লে।—তা'হলে কি কোন উপায় নেই ?

জয়ন্ত বিরক্তি চাপতে গিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে কালীকিংকরবাবুর কথাগুলি একটু ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনতে লাগলো।

কালীকিংকরবাবু।—মারধর করা বা ঐরকম সাংঘাতিক কিছু করতে বলছি না। শুধু তার এই বদ উৎসাহটা ভেঙে দেওয়া যেত,তা'হলেই…।

জয়ন্ত সেই রকমই গম্ভীর থেকে বললো।—এক কাজ করতে পারেন।

কালীকিংকরবাবু।—বলুন।

উত্তর দেবার আগে একবার থেমে গিয়ে জয়ন্ত সিতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

সিতা বললো।—আমার পরামর্শ শুনে ইন্দ্রবাবুর মারফৎ টাকা দিতে গিয়ে মেসোমশাই অনর্থক একবার নাকাল হয়েছিলেন। তুমি আবার সেইরকম একটা কিছু করতে বলো না। যা বলবে, তাতে যেন কাজ হয়।

কিছুক্ষণের মত হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল জয়ন্ত। সিতার কথাগুলিকে যেন সে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। জয়ন্তের মুখের গাম্ভীর্যের ওপর সিতার কথাগুলি থেকে একটা নির্বিকার নিষ্ঠুরতার আঁচ লেগে ধীরে ধীরে গভীর বিষণ্ণতার কালি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। সিতাকে যেন জীবনে এই প্রথম ভয়ের চক্ষে দেখলো জয়ন্ত। কালীকিংকরবাবু উৎসুক ভাবে তেমনি তাকিয়ে আছেন। জয়ন্তর হঠাৎ গা-বমি করে উঠলো। রুমালটা জলে ভিজিয়ে ঘাড় আর মুখের ওপর আস্তে আস্তে দু'চারবার বুলিয়ে নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে নিল জয়ন্ত।

সিতা ব্যস্ত হয়ে যেন আগ্রহে ছটফট করতে লাগলো—বল, বল। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

কালীকিংকরবাবু।—বলুন জয়ন্তবাবু।

জয়ন্ত।—অবনী যে একটি ব্যাঙ্কে কেরানিগিরি করে, সে খবর আপনি জানতেন?

কালীকিংকরবাবু।—না।

জয়ন্ত।—কাবেরী ব্যাঙ্কে কাজ করে অবনী।

কালীকিংকরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—কাবেরী ব্যাঙ্কে? আমার বেয়াই জগৎ ভট্টচাযের কাবেরী ব্যাঙ্কে?

জয়ন্ত।—জগৎ ভট্টচায আপনার বেয়াই হন, সে খবর অবশ্য জানতাম না।

কালীকিংকরবাবু।—তা'হলে আজই আমি জগৎবাবুকে গিয়ে একবার····· ।

জয়ন্ত।—জগৎবাবুকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন যে, না-জেনে কী ভয়ানক জীব তিনি মাইনে দিয়ে পুষে রেখেছেন।

কালীকিংকরবাবুর যেন তর সইছিল না।—আজই আমি নিজে গিয়ে জগৎবাবুকে তাতিয়ে দিয়ে আসছি। আজই যেন ঐ বিভীষণটাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেন। চিরকাল এই ধরণের একটা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমরা লড়ে আসছি জয়ন্তবাবু। দুধ দিয়ে যাকেই পুষি, সেই কালসাপ হয়ে যায়—আমার চব্বিশ বছরের কারবারী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বড় দুঃখে বলছি।

জয়ন্ত।—আমি এইবার উঠবো কালীকিংকরবাবু।

কালীকিংকরবাবু বিদায়-অভ্যর্থনা সরবরাহ করতে গেট পর্যন্ত এলেন।

অন্যমনস্কের মতই গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে বসে রইল জয়ন্ত। সিতা এল অনেকক্ষণ পরে। সিতাকে আহ্বান করতে বা সিতার ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারেনি জয়ন্ত। নিজের মনে সোজা চলে এসে গাড়িতে উঠেছে। একটা প্রকাণ্ড ওলটপালট হয়ে গেল বলতে হবে। সিতাই আজ জয়ন্তকে অনুসরণ করে পেছু পেছু হেঁটে এসে গাড়ীতে বসলো। এই বোধ হয় প্রথম।

গাড়িটা ডোভার লেনের কাছাকাছি পৌঁছলো। সিতা তখনো মনের ভেতর একটা সংশয় বিস্ময় ও অপমানের জ্বালার সঙ্গে লড়ছিল। জয়ন্ত একটা কথা বলা মাত্র এই অপমানের পাল্টা আঘাত দিতে হবে—সেই সুযোগটীর জন্যই যেন ধৈর্য ধরে নিজেকে সামলে রেখেছিল সিতা। নিজের এইটুকু সংযমও যেন অপমানের মত পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল তার কাছে। ছায়া জয়ন্ত হঠাৎ কঠিনকায় একটি

ব্যক্তি হয়ে উঠলো আজ। জয়ন্তকে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও আজ তাকে ভাবতে হচ্ছে, কোনদিন যার জন্য মুহূর্তেকও দ্বিধা করতে হয়নি।

শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত চুপ করেই রইল। এভাবে জয়ন্তকে কখনো দেখেনি সিতা, এই ধরণের শক্ত সোজা আপন-মনা জয়ন্তের সঙ্গে মেলামেশার রীতি কোনদিনও তার অভ্যাসে নেই। সিতার মনের যত উষ্মা আর মুখরতা ধৈর্যের চূড়ান্তে উঠেও হঠাৎ একটা সশঙ্ক সংকোচে একেবারে নীচে নেমে গেল।

যেন এই উদ্‌ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সিতা বলে উঠলো।—অবনীনাথের বাড়াবাড়ি এইবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

জয়ন্ত যেন প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যই ছোট একটা উত্তর দিয়ে সেরে দিল।—হুঁ।

সিতা আরও বিব্রত হয়ে উঠলো।—তুমি কি অন্য কোন কাজের কথা ভাবছো ?

জয়ন্ত।—কেন জিজ্ঞেসা করছো ?

সিতা।—তোমাকে খুবই অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে সীটের ওপর একটু কাৎ হয়ে বসে স্টীয়ারিং ধরে রইল। সিতার মুখের দিকে তাকাবার কোন চেষ্টা না করেই প্রশ্ন করলো।—আচ্ছা, অবনীর বাড়াবাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য তুমি হঠাৎ এত উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন ?

সিতা আশ্চর্য্য হলো।—এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করছো কেন ? তুমিও কি উৎসাহী নও ?

জয়ন্ত।—ঠিক যে-কারণে অবনীকে আমি সায়েস্তা করতে চাই, তুমিও কি সেই কারণে চাইছ ?

সিতা।—নিশ্চয়; সংঘে থাকবো অথচ সংঘের নীতি মেনে চলবো না—অন্তত আমার মধ্যে সে ভণ্ডামি পাবে না।

সিতার চোখে পড়লো, জয়ন্তর ঠোঁটের ওপর কুটিল একটা হাসি ধীরে ধীরে দীর্ঘায়ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিব্রত হয়ে সিতা বললো।—তুমি বোধ হয় আমার কথাটা বিশ্বাস করলে না। আজ বার বার তুমি আমায় অপমান করছো। আমি ভেবে পাচ্ছি না, আজ হঠাৎ কোথা থেকে তোমার এত সাহস······।

জয়ন্ত চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সিতার দিকে। জয়ন্তর চোখের কঠোর দৃষ্টিটা সেই মুহূর্তে সিতার সব মুখরতাকে যেন গলা টিপে শান্ত করে দিল।

সিতা শান্ত ভাবে আবার প্রশ্ন করলো।—বল, কি বলছিলে?

জয়ন্ত।—অবনীর ওপর তোমার নিজের একটা আক্রোশ আছে। জাগৃতি সংঘের নীতির সঙ্গে এই আক্রোশের কোন সম্পর্ক নেই।

সিতা।—আমার নিজের আক্রোশ? কেন? এর কোন মানে হয় না।

জয়ন্ত।—অবনী জাগৃতি সংঘের কতটুকু ক্ষতি করেছে, জাগৃতি সংঘ সে-খবর রাখে। এ ছাড়াও অবনী যেন তোমার বিশেষ একটা ক্ষতি করেছে, তার জন্যই তুমি অবনীকে ঠাণ্ডা করে দিতে চাও।

সিতার কথার প্রাচুর্য্য সেই নিমেষে ফুরিয়ে গেল। জয়ন্তর কথাগুলি নির্লজ্জ কৌন্সুলীর জেরার মত সিতার মনের চারদিকে একটা শক্ত বেড়ার বাঁধ দিয়ে ঘিরে ধরছিল। কথার ফাঁকে পালিয়ে যাবার কোন পথ ছিল না। সিতার স্তব্ধতার ওপর আর একটা আঘাত দিয়ে জয়ন্ত বললো।—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি সিতা। তোমাকে যেন আজ ঠিক চিনতে পারছি। শত্রুকে কিভাবে শেষ করতে হয়, সে-কৌশল আমিও জানি। তবু, তুমি যেন আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ।

—কিসে তোমায় ছাড়িয়ে গেলাম ? তোমায় সাহস মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে জয়ন্ত !

ধারালো ছুরির নিক্কনের মতই সিতা প্রতিবাদ করে উঠলো।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উত্তর দিল।—নির্মমতায়।

সিতার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। জয়ন্ত তখনো শান্তভাবেই বলে যাচ্ছিল।—তবু তোমার প্রশংসা না করে পারি না। শিশিরের জন্য তুমি সব করতে পার। অবনী শিশিরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই আজ অবনীকে ঠাণ্ডা করছো। কাল আর কাউকে ঠিক এমনিভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না জানি।

সিতা দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।—চুপ কর জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—আমার সবচেয়ে আশঙ্কা কি হচ্ছে জান ? শেষ পর্যন্ত ঐ শিশিরকেই ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য তৈরী হবে তুমি। সেদিন তোমার নির্মমতা আবার কী বিচিত্ররূপে দেখা দেবে জানি না।

সিতা।—আমার ওপর বড় বেশী রাগ করছো জয়ন্ত। এত বিদ্রূপ আমি সইতে পারবো না। তোমাকে চিরদিনই······

জয়ন্ত।—আমাকে চিরদিনই তুচ্ছ আর ভয় করে এসেছ।

সিতা।—আর তুমি ?

জয়ন্ত।—আমি তোমায় ভালবেসে এসেছি, তা তুমিও জান। পৃথিবীতে কোন পুরুষ বোধ হয় এভাবে ভালবাসতে পারে না। যাক্ ওসব কথা।

সিতা চোখ মুছে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালো।—কিন্তু আর তোমায় ভয় করবো না জয়ন্ত।

হঠাৎ গাড়ির ব্রেক দিল জয়ন্ত। গাড়ি থেকে নেমে পড়ার আগে

সিতা জিজ্ঞাসুভাবে জয়ন্তর দিকে একবার তাকালো। জয়ন্ত বললো।- কিছু মনে করো না সিতা। একটা সত্য কথা বলবো আজ।

সিতা।—বল।

জয়ন্ত।—আমার কিন্তু ভয় করছে।

প্রকাশবাবুর ঘরের দরজার কড়া নাড়বার জন্য হাতটা তুলেই ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত নামিয়ে নিল।

স্কুল মাস্টার আশুবাবু কৌতূহলী হয়ে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি ?

দুটী অভিযাত্রী আবিষ্কারকের মত এক রহস্যে পরিকীর্ণ গুপ্ত গুহার মুখে যেন উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু। আবার শুনতে পাওয়া গেল, ঘরের ভেতর কে যেন আকুল হয়ে বলছে—তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জান রুমি ?

প্রকাশবাবুর গলার স্বর। অত্যদ্ভুত এক প্রণয়নম্রতায় কথাগুলি যেন লুটিয়ে পড়ছিল। শোনা গেল, প্রকাশবাবু আবার বলছেন —তোমাকে দেখে আমার সব সময় লা পাসিয়োনারার কথা মনে পড়ে রুমি।

—কেন লজ্জা দিচ্ছ আমায়। উত্তর দিতে গিয়ে ঊর্মিলা কাঞ্জিলালের কথা আর হাসিটা অনুরাগের আবেগে যেন একটা রুমালের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে লাগলো।

প্রকাশবাবু—এইবার আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা—কর।

প্রকাশবাবু—কিন্তু আমি একা কি করে পারবো ?

উর্মিলা—ভেবে দেখ।

প্রকাশবাবু—না, আর ভাববার কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখেছি, আমার জীবনে তোমাকে আসতেই হবে রুমি।

উর্মিলা—মাপ করো প্রকাশ, এত সাহস আমার নেই। উর্মিলার কণ্ঠস্বর থেকে একটা সন্ত্রস্ত চাঞ্চল্যের আভাস বদ্ধঘরের বুক ভেদ করে দরজার বাইরেও যেন ছটফট করে পালিয়ে আসছিল। খুবই করুণ হয়ে শোনাচ্ছিল কথাগুলি।

প্রকাশবাবু—তোমার সাহস নেই? আমি বিশ্বাস করতে পারি না উর্মিলা। তোমারই সাহসের প্রেরণায় আমাদের সংঘের প্রাণ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। সবার আগে এগিয়ে চলেছ তুমি, পেছনে পার্টি আর সংঘ। তোমারই ওপর পার্টির শত শত ছেলেমেয়ের জীবনের আদর্শ নির্ভর করছে। আমাদের নতুন সংসারের মডেল তোমার মধ্যে প্রথম সার্থক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ থেমে গেলেন প্রকাশবাবু। উর্মিলা কাঞ্জিলালও যেন নিঝুম হয়ে রয়েছে। এই নিঃশব্দতাকে সহ্য করার ধৈর্য রাখতে পারছিল না ইন্দ্রনাথ। কড়া নাড়বার জন্য আবার হাত তুলতেই প্রকাশবাবুর গলার শব্দ চমকে দিল ইন্দ্রনাথকে।—ছি ছি, তুমিও মুষড়ে পড়ছো উর্মিলা। আর কেউ নয়, তুমি! তোমাকে আমি এতদিন যেভাবে ভালবেসে, শ্রদ্ধা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে……।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল একটু শান্তভাবেই জবাব দিল—না, মুষড়ে পড়ছি না।

প্রকাশবাবু—এত ভাবনাই বা হচ্ছে কেন তোমার?

উর্মিলা—না ভেবে যে পারছি না প্রকাশ। সেই ভদ্রলোকটির কথা কি তুমিও একটু ভেবে দেখছো না?

প্রকাশবাবু—কাঞ্চিলাল মশাইয়ের কথা বলছো ?

উর্মিলা—হ্যাঁ।

প্রকাশবাবু—তোমার মত নারীর জীবনে ভদ্রলোক কতটুকু গৌরব এনে দিতে পেরেছে উর্মিলা ?

উর্মিলার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যেন সায় দিল।—বোধ হয় কিছুই নয়।

প্রকাশবাবু—তবে ? তবে এত দ্বিধা কেন উর্মিলা ?

উর্মিলা—শক্তিতে কুলোচ্ছে না প্রকাশ। কিসের দ্বিধা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রকাশবাবু—আশ্চর্য হচ্ছি উর্মিলা। তোমার মত মেয়ে একটা জীর্ণ কন্‌ভেনশনকে দূরে ঠেলে দিতে পারছে না, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল ?

উর্মিলা—ওটা সমাজেরই কনভেনশন নয় কি ?

প্রকাশ—মন্ত্রপড়া গাঁটছড়া আর সাতপাক মানে বিয়ে নয়। তুমি বিয়ে করেছিলে, একটা পুরুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে, নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্য নয়।

উর্মিলা যেন নিজেকেই সান্তনা দিয়ে বলে উঠলো।—না, নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয় নয়।

প্রকাশবাবুর উৎসাহিত গলার স্বর হঠাৎ যেন প্রমত্ত গোখুরার মত উর্মিলার সংকোচ ও সংশয়কে চারদিক থেকে পাক দিয়ে জড়িয়ে অবশ করে ফেলবার চেষ্টা করলো।—কাঞ্চিলাল মশাই তোমার স্বামী, আজ একথা বললে একটা মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আলো আর অন্ধকারের মত তোমরা দুজনে ভিন্ন। তিনি কেরানী, তাঁর জীবনের কাম্য হলো পেন্সন। তুমি জাগৃতি সংঘের অগ্রনায়িকা, তোমার কাম্য মুক্তি।

ঊর্মিলা—আমার কোন ক্ষতি হবে না তো প্রকাশ ?

প্রকাশবাবু—ক্ষতি ? তুমি আমি নতুন করে ভালবাসার ইতিহাস তৈরি করবো ঊর্মিলা। আমাদের দুজনার হৃদয় এক হয়ে পার্টির হৃদয় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি জানতাম তুমি আমাকে এখনো······।

প্রকাশবাবু তাঁর আবেগ একটু সংযত করলেন। ঊর্মিলা হেসে ফেলে বললো—কি বলছিলে থাম্‌লে কেন ?

প্রকাশবাবু—যদি জানতাম তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি, তবে···।

কথার মাঝখানেই ঊর্মিলা উত্তর দিল।—ভালবাসতে পেরেছি প্রকাশ। তোমাকে যেদিন দেখেছি, সেদিনই আমার বারবার থেইলমানের কথা মনে পড়ছিল।

প্রকাশবাবু ডাকলেন।—রুমি ?

ঊর্মিলা—কি প্রকাশ ?

প্রকাশবাবু—এতদিন জীবনকে একটা বঞ্চিতের তপস্যার মত শুধু ভুগে ভুগে টেনে নিয়ে এসেছি ঊর্মিলা। আজ মনে হচ্ছে, সব শূন্যতা কানায় কানায় ভরে গেল। জীবনের আকাশে প্রথম রামধনুর মত তোমায় আমি পেলাম ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা—এত তাড়াতাড়ি সংঘকে সব কথা জানিয়ে দিও না প্রকাশ।

প্রকাশবাবু আপত্তি করে উঠলেন—আবার সংকোচ কেন ? এ শুনে সমস্ত সংঘ কত খুশী হবে অনুমান করতে পার ? তোমার আমার বিয়ের কথা ঘোষণা করে কালই আমার পার্টির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবো।

দরজার কড়া কর্কশ শব্দে বাজতে লাগলো। দরজা খুলে দিয়েই প্রকাশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন—কি খবর ইন্দ্র ?

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু ঘরের ভেতর গিয়ে বসতেই উর্মিলা কাঞ্জিলাল বললো—আমি উঠি এবার প্রকাশবাবু। আপনারা আলাপ করুন।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল ব্যস্তভাবে চলে গেল।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে প্রকাশবাবু বললেন—তুমি বড় ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ ইন্দ্রনাথ। সংঘের কাজে একটু গা লাগিয়ে কিছু কর এবার। নইলে……।

ইন্দ্রনাথ—সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি।

প্রকাশবাবু চেহারাটাকে একটু কঠোর করে নিয়ে বললেন—কথাটা কি আন্তরিকভাবে বলছো?

ইন্দ্রনাথ—হ্যাঁ।

প্রকাশবাবু—বেশ। এর পর আর কি বলবার আছে?

ইন্দ্রনাথ— আপনাকে চেনবার জন্যই এতদিন ছিলাম, চেনা হয়ে গেল।

প্রকাশবাবু উত্তপ্ত হলেন—কি বলছো?

ইন্দ্রনাথ—সুন্দর একটি আশ্রম তৈরি করেছেন প্রকাশবাবু। আশ্রম চালনার বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বও খুব ভাল করে জানেন আপনি।

প্রকাশবাবুর রুষ্ট দৃষ্টিটা শতমুখী হয়ে ইন্দ্রনাথকে বিদ্ধ করে যেন তার উদ্ধত শোণিতের আস্বাদ নেবার চেষ্টা করছিল।

ইন্দ্রনাথ তবু নির্বিকারভাবেই বলে চললো।—আপনাকে আমি চিনেছি প্রকাশবাবু, এইবার আপনিও নিজেকে চিন্‌তে শিখুন।

প্রকাশবাবু—এই তত্ত্ব তুমি আজ আমায় শেখাতে এসেছ?

ইন্দ্রনাথ—স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

প্রকাশবাবু—কি?

ইন্দ্রনাথ—একবার হাতড়ে দেখুন, শিরদাঁড়াটি আছে কি না?

প্রকাশবাবু—তুমি এবার উঠতে পার ইন্দ্র।

ইন্দ্র—জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট করেছেন, অনেক আঘাত নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু তার ফলে আপনার মনুষ্যত্ব বলিষ্ঠ হয়নি প্রকাশবাবু। ভেতরে যে এতখানি ক্ষয় হয়ে গেছেন এতটা বুঝে উঠতে পারিনি। উর্মিলা কান্তিলালকে বিয়ে করবেন, সেটা দোষের কিছু নয়। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এ রকম ব্যতিক্রম চলে আসছে। কিন্তু পাপটা কোথায় হলো জানেন? পাপ হলো ঐ ছুতোগুলি—পলিটিক্স, প্রগ্রেস ও আদর্শের ছুতো।

আশুবাবু অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ উসখুস করে বললেন—উঠুন ইন্দ্রবাবু।

প্রকাশবাবু—আমি তো বার বার বলছি. উঠুন আপনারা। যে তত্ত্ব আপনাদের বুদ্ধির ধাতে সইবে না, তা নিয়ে বৃথা কথা খরচ করবেন না।

আশুবাবু উষ্মা বোধ করলেন—তত্ত্বটা যে আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে পারলেন না মশাই। তা হলে নয় একবার বুঝতে চেষ্টা করতাম।

প্রকাশবাবু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ঠোঁট কুঞ্চিত করলেন—নানা দেশের সাম্যবাদী পার্টির ইতিহাসের পাতাগুলি একবার উল্টে দেখবেন।

ইন্দ্রনাথ হেসে ফেললো। আশুবাবু শান্তভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন—একটা পাতা সামনেই খোলা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। দেখছি টালির নালার জল, আপনি বলছেন ব্রহ্মাকমণ্ডলু নিঃসৃত বারিধারা।

প্রকাশবাবু—এর অর্থ আপনার দৃষ্টিটা নোংরা হয়ে গেছে; যা দেখছেন তা-ই নোংরা মনে হচ্ছে।

আশুবাবু—কিন্তু মশাইরা যে একেবারে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। নইলে দেখতে পেতেন যে, আপনাদের কম্যুনিস্ট পার্টির পার্টিত্ব হয়তো আছে, কিন্তু কম্যুনিজম নেই।

প্রকাশবাবু—কি বললেন ? কি নেই ?

আশুবাবু—কম্যুনিজ্‌ম্ নেই। যেমন জার্মান সিলভারে জার্মানত্ব আছে, কিন্তু সিলভারত্ব নেই। আরও উপমা যদি শুনতে চান তবে বলি…

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবুর সৌজন্যহীন বিদ্রূপ প্রশ্ন আর উত্তরের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েও চেষ্টা করে যেন নিজেকে একটু সংযত করলেন প্রকাশবাবু। একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বললেন—কি এমন ব্যাপার হলো যে তুমিও আজ নিঃসংকোচে আমায় অপমান করছো ইন্দ্রনাথ ?

ইন্দ্রনাথের মনের ভেতরটা হঠাৎ বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। তারই আবাল্য শ্রদ্ধায় লালিত একটা মূর্তি যেন তারই হাতের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে অভিমানে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রকাশবাবু তেমনি নিষ্প্রভ চোখে শঙ্কাতুর দৃষ্টি দিয়ে ইন্দ্রনাথকে দেখছিল। আশুবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন।

ইন্দ্রনাথ বললো।—আপনাকে অপমান করলাম প্রকাশবাবু, এটা আমার জীবনের প্রথম শাস্তি। একদিন আপনার আদেশ নিঃসংশয়ে মেনে চলেছি। কিন্তু আপনি ফুরিয়ে গেছেন, কাজেই আমার একটা ভরসাই ফুরিয়ে গেছে। আপনি থেমে গেছেন, আপনি শ্রান্ত। আপনি নিরুপদ্রব জীবন খুঁজছেন। পলিটিক্স করার শক্তি যোগ্যতা আর উৎসাহ নেই আপনার। কিন্তু পলিটিক্সের অভিমান আপনার অভ্যাসে মিশে আছে। তাই এমন একটি পলিটিক্স খুঁজছিলেন, যার মধ্যে কাজ নেই, ত্যাগ নেই, সংগ্রাম নেই। আপনার এই ব্যর্থতাকে মনভোলানো সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন জাগৃতি সংঘ নামে সংঘটি গড়ে তুলেছেন।

ইন্দ্রনাথের অভিযোগের আবর্তের মধ্যে যেন অসহায়ের মত ভাসছিলেন প্রকাশবাবু। কোন সাড়া দিচ্ছিলেন না।

ইন্দ্রনাথ বললো—সব চেয়ে দুঃখের বিষয় কি হলো জানেন প্রকাশ-বাবু? কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনারা পার্টিকে একটা বাবাজীর আখ্ড়া করে ফেললেন। ধর্মের ভড়ং দিয়ে আখ্ড়ার ব্যবসাটা বড় পুরনো হয়ে গেছে। পলিটিক্সের ভড়ং থাকলে আখ্ড়ার ব্যবসা আজকাল বেশ তাড়াতাড়ি জমে ওঠে। দুর্ভাগ্য আপনার, শেষে এই ব্যবসা ধরলেন। এখন এই গলদকে ঢাকবার জন্য একে একে শুধু নতুন ফাঁকির আশ্রয় নিতে হবে। এইভাবে কোথায় গিয়ে শেষে ঠেকবেন কে জানে। আমার শেষ অনুরোধ প্রকাশবাবু, এই আখ্ড়াই প্যাটার্নটি ভেঙে ফেলুন। নইলে একটা নষ্টামির আশ্রয় হয়ে উঠবে আপনার পার্টি আর সংঘ।

প্রকাশবাবু হঠাৎ তাঁর মৌনতা ভেঙে একটু ক্লান্তভাবেই বললেন।—অনেকদূর এগিয়ে গেছি, আর ফেরা যায় না।

সূক্ষ্ম একটা আশাভরা ইঙ্গিতের নিশানা পেয়ে যেন ইন্দ্রনাথ আগ্রহে বলে উঠলো—কেন ফেরা যাবে না প্রকাশবাবু? নিশ্চয় ফেরা যাবে। আপনি শুধু একবার··· ···।

প্রকাশবাবু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সপ্রতিভভাবে বললেন—কী আবোল তাবোল বকছো? আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললো—চলুন আশুবাবু।

ঘর ছেড়ে প্রকাশবাবুর বাসার বাইরে পথের ওপর পৌঁছে আশুবাবু প্রথম কথা বললেন—কোন্ দিকে যাবেন ইন্দ্রবাবু?

অন্যমনস্কভাবেই ইন্দ্র উত্তর দিল—যাবার আর কোন পথ নেই।

আশুবাবু সন্দিগ্ধভাবে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রচ্ছন্ন কোন বেদনার জ্বালায় যেন ইন্দ্রনাথের মুখটা পুড়ে যাচ্ছে। কোন প্রিয় আত্মীয়ের চিতাবহ্নি নিভিয়ে যেন এই মাত্র চলে আসছে ইন্দ্রনাথ। সেই শোকের আগুনের আঁচ লেগে মুখটা কালো হয়ে আছে।

আশুবাবু আস্তে আস্তে ডাকলেন—শুনছেন ইন্দ্রবাবু? আপনি অবনীনাথের সঙ্গে একবার দেখা করুন।

ইন্দ্রনাথ—সেখানে যাবার সামর্থ্য নেই আশুবাবু।

আশুবাবু যেন একটু অনুযোগ করলেন—কেন ছেলেমানুষি করছেন ইন্দ্রবাবু? পুরনো কথা নিয়ে মন ভার করে রাখবেন না। মন খারাপ করবেন না।

সাদাসিধে শান্তদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসুভাবে এগিয়ে এলেন—এটাই কি আটাশ নম্বর?

আশুবাবু—কাকে খুঁজছেন আপনি?

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—অটাম স্কুল অব পলিটিক্সের অফিস কি এইটা?

আশুবাবু উত্তর দিলেন—না, এটা প্রকাশ সরকারের বাসা।

আগন্তুক ভদ্রলোক উৎফুল্লভাবে বললেন—হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজছিলাম। তিনি হলেন ঐ স্কুলের অধ্যক্ষ।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু দু'জনেই বিস্মিতভাবে ভদ্রলোকের কথাগুলির মর্মার্থ বুঝবার চেষ্টা করছিল। ভদ্রলোক নিজে থেকেই একটু হৃদ্যতার স্বরে বললেন—আমার স্ত্রীও এই স্কুলের টীচার।

ভদ্রলোকের আলাপের রীতির মধ্যে একটা মফঃস্বলসুলভ সঙ্গপ্রিয়তার আভাষ ছিল। ইন্দ্রনাথ তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেসা করলো—আপনার নাম?

ভদ্রলোক—দ্বিজেন্দ্র কাঞ্জিলাল।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটা বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দ্বিজেন কাঞ্জিলাল তখন আলাপের সূত্রটাকে ভাল করে ধরে কথা বিস্তার করে চলেছিলেন।—

আমি আসছি পাবনা থেকে। পাবনা আমার বাড়ি নয়, চাকরির জন্যই সেখানে থাকি।

আশুবাবু—আর আপনার স্ত্রী ?

দ্বিজেনবাবু—উনি আছেন কলকাতায়, এই স্কুলে টীচারী করেন।

ইন্দ্রনাথ—আপনি কল্‌কাতায় হঠাৎ··· ।

দ্বিজেনবাবু—হ্যাঁ, হঠাৎ চলে এসেছি ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ; মেয়েটির গলায় একটা টিউমারের মত হয়েছে, অপারেশন করাতে হবে। বড় বিব্রত বোধ করছি মশাই। বাপ করবে চাকরি, মা করবে চাকরি—উদরান্নের দাবি মেটাতে গিয়ে আমরা দু'জনাই উদ্বাস্ত, এ দিকে মেয়েটার অবস্থা কাহিল। তারপর, উনি পড়ে রয়েছেন বিদেশে। হাঁ আপনারা ওঁর নাম শুনে থাকতে পারেন··· ।

দ্বিজেনবাবু একটু সতর্কভাবে গলার স্বর নামিয়ে বললেন—উনি দেশের কাজে জেল খেটেছেন একবার, ওঁর নাম ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল। নাম শুনেছেন বোধ হয় ?

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—হাঁ শুনেছি।

দ্বিজেনবাবু কৃতার্থভাবে বললেন—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে বড় উপকৃত হলাম মশাই। এবার আসি। দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, শুনেই তো মেয়ের মা আঁৎকে উঠবেন। কতদিক সামলাই বলুন ! সংসারধর্ম সত্যিই এক ল্যাঠা। বড় বিব্রত বোধ করছি মশাই।

নমস্কার জানিয়ে দ্বিজেনবাবু প্রকাশবাবুর বাসার ভেতর ঢুকলেন। আশুবাবু সেইদিকে তাকিয়ে যেন একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন।—আর সহ্য হচ্ছে না ইন্দ্রবাবু। চলুন, আর এখানে নয়।

ইন্দ্রনাথ বললো।—ভদ্রলোককে ডেকে বরং বলে দিন যে, ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল মারা গেছেন।

আশুবাবু।—থাক্ ওসব কথা, শীগ্‌গির চলুন এখান থেকে, মাথা ঘুরছে আমার।

পিসিমা মালা জপছিলেন। অরুণা এসে বললো।—শিশিরবাবুকে চলে আসতে খবর পাঠালাম পিসিমা।

পিসিমা খুশী হয়ে সমর্থন জানালেন।—ভাল করেছ। জ্বর-জ্বালা নিয়ে কোথায় যে পড়ে রয়েছে, আহা! বড় ভাল ছেলেটি।

অরুণা।—ইন্দ্রকেও চিঠি দিলাম, যেন একবার দেখা করতে আসে।

পিসিমা নিরুত্তর রইলেন! পিসিমা ইন্দ্রকে চেনেন না।

অরুণা যেন মনে মনে বিচিত্র এক দৌত্যের দায় তুলে নিয়েছে। কদিন থেকে অরুণার আচরণ একটা নতুন উৎসাহে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। বিপিন ও টুনার মা, দুজনে মিলে যেদিন অরুণাকে প্রণাম করে শান্তভাবে চলে গেল, সেইদিনই যেন অরুণার চিন্তায় রশ্মিময় এক পরিকল্পনার দীপালি জ্বলে উঠলো। টুনার মা'কে এক কৌটা সিঁদুর উপহার দিয়েছে অরুণা। অবনী সে-খবর জানে না। জানবার জন্য বোধ হয় অবনীর কোন ইচ্ছাও নেই। হোম পলিটিক্সে মাথা ঘামাবার সময় নেই অবনীনাথের—রাগ করে বললেও এই অভিযোগের ইঙ্গিতটি বুঝতে দেরি হয়নি অরুণার। সময় নেই, না সামর্থ্য নেই? কথাটা মনে পড়তেও বার বার হেসে ফেলেছিল অরুণা। মায়া হচ্ছিল অবনীনাথের জন্য। নিরন্নদের জন্য ভাতের দাবির লড়াইয়ের ভাবনা নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে ভদ্রলোক। এই ধ্যানে মজে থাকুন তিনি। প্রণয়-বিরহ-মিলন—চিত্তলীলার এই ধাঁধার ভেতর টেনে এনে ভদ্রলোককে নাকাল করে লাভ নেই। তার সামর্থ্য নেই। যা-কিছু করতে হবে, সব

অরুণাকেই করতে হবে। নতুন এক সাধনার পর্ব যেন কুড়িয়ে পেয়েছে অরুণা।

পিসিমার কাছ থেকে সরে এসে অবনীর কাছে দাঁড়ালো অরুণা। —ইন্দ্রকে আসতে লিখে দিলাম।

অবনী আশ্চর্য হয়ে বললো।—কেন ?

অরুণা।—জোছু বড় ভাবিয়ে তুলেছে।

অবনী আরও আশ্চর্য হলো।—কি ভাবিয়ে তুলেছে জোছু ?

অবনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে গেল অরুণা। অরুণার বোধ হয় সিদ্ধান্তটিই তৈরী ছিল, প্রমাণগুলি ছিল না।

অরুণার দ্বিধা দেখে অবনী একটু স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেসা করলো। —কিসে প্রমাণ পেলে ?

অরুণার উত্তরটা তেমনি অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।—দেখেই বোঝা যায়।

অবনী।—তুমি ভুল বুঝেছো।

অরুণা জোর করে বললো।—না, আমি ঠিকই বলছি।

অবনী চুপ করে রইল। অরুণার কথাগুলি একটানা আবেগে তার গোপন পরিকল্পনার কিছুটা আভাষ যেন ধরিয়ে দিয়ে গেল।—ইন্দ্রকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করাই ভাল। আমার বিশ্বাস, ইন্দ্র আমাদের সবার ওপর একটা অভিমান নিয়েই দূরে সরে রয়েছে। ইন্দ্র জোছুকে ভালবাসে, একথা জেনেও আমরা সবাই চুপ করে রইলাম—এতে ইন্দ্রকে সত্যিই অপমান করা হয়েছে।

অবনী।—আমি তোমাকে জোছুর কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তুমি বলছো, জোছু ভাবিয়ে তুলেছে। কি করে বুঝলে ?

অরুণা একটু সংকুচিতভাবে জবাব দিল।—জোছুকে দেখে আমার তাই মনে হয়।

অবনী।—কি মনে হয়?

অরুণা।—ইন্দ্রকে অপমান করা হয়েছে, জোছু যেন এই ঘটনাটাকে চুপ করে সহ্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখে বুঝতে পারি, সহ্য করতে পারছে না।

অবনী।—তোমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে।

অরুণা।—কিন্তু মিথ্যে হলে কি করে চলবে?

অরুণার কথায় একটা হতাশার আক্ষেপ লুকিয়েছিল। অবনী হেসে ফেললো।—তাই বল! জোছু কিছুই ভাবিয়ে তোলেনি, কিন্তু তোমার ইচ্ছে জোছু ভেবে ভেবে সবাইকে ভাবিয়ে তুলুক। তাই নয় কি?

অরুণা অপ্রস্তুত হয়ে বললো।—এ আবার কিরকম কথা হলো?

অবনী অন্যদিকে তাকিয়ে একটু শান্তভাবেই বললো।—শুধু ইন্দ্রনাথের জন্যই জোছু তোমাদের ভাবিয়ে তুলুক, এটাই বোধ হয় তুমি চাইছ।

অরুণা সশঙ্কভাবে যেন অবনীর কথাগুলিকে দেখছিল। মুখটা বিনা কারণে ক্রমেই করুণ হয়ে উঠছিল।

অবনী বললো।—ইন্দ্রকে ডাকিয়ে তুমি সমস্যাটাকে সরলভাবে মিটিয়ে দিতে চাও, এই তো?

অরুণার চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকম স্থৈর্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল। অবনীর কথাগুলি এক-একটি লোষ্ট্রাঘাতের মত তার মনের গহনে যেন তরঙ্গ-ক্ষোভ জাগিয়ে তুলছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অরুণা।

অবনী।—তুমি আশা করছো, ইন্দ্র এলে একটি দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে।

আর একটু উৎসাহের প্রেরণা ভরে দিয়ে কথাগুলি বললো অবনী। কিন্তু কথাগুলি থেকে আলোর বদলে শুধু একটা জ্বালা এসে অরুণার মনের ওপর যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

মুখ ঘুরিয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিস্ময়ে ও সমবেদনায় বিচলিত হয়ে উঠলো অবনী।—একি? তুমি মুষড়ে পড়ছো কেন? আমি তো তোমায় কোন বাধা দিচ্ছি না অরুণা! যা ভাল বোঝ, তাই করবে, এর মধ্যে এত অভিমান করার কি আছে?

অরুণার চোখের সুমুখ থেকে একটা শাস্তির ভ্রূকুটি যেন মিথ্যা ভয় দেখিয়ে এতক্ষণে সরে গেল। দুর্লক্ষ্য একটা দুর্বলতা নিজেরই সংশয়ের বিষে অন্ধ হয়ে অবনীর কথাগুলিকে চিনতে পারছিল না এতক্ষণ। কী লজ্জাকর দুর্ব্বলতা!

অরুণা বেশ সুস্থভাবেই বললো।—এর মধ্যে আমাকে টেনে আন্‌ছো কেন? আমি মুক্তি পাব, একথার কোন অর্থ হয় না।

অবনী।—আজ আমার কথাগুলি তুমি কিছুতেই বুঝতে পারছো না অরুণা।

উত্তর দিতে গিয়ে অবনীর কথার সুরটা যেন সূক্ষ্ম একটা ধিক্কার দিয়ে হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

প্রসঙ্গটা এইখানে এসে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়লো। অগ্রসর হবার আর কোনো পথ সহসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অরুণাই বললো।—শিশিরবাবুকে খবর পাঠালাম, যেন পত্রপাঠ চলে আসেন।

অবনী চম্‌কে উঠে প্রশ্ন করলো।—কেন?

অরুণা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল।—জ্বর হয়ে পড়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

অবনী।—জ্বর সেরে গেলে আবার নিজের কাজে চলে যাবেন তো?

অরুণা ।—এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি করে দেব ?

অবনী ।—সেই কথা তাঁকে লেখা হয়েছে নিশ্চয় ?

অরুণা ।—না ।

অবনী ।—তাহ'লে বল, জ্বরের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে লেখনি। শুধু ফিরে আসার জন্যেই লিখেছি ।

মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়েছিল অরুণা। অবনীর কথাগুলি যেন দুর্বোধ্য একটি তূণীরের মত, এক একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সুতীক্ষ্ণ শরের মত মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছে।

অবনী ।—ইন্দ্রনাথকে কেন আসতে লিখেছ, তা বুঝতে পারছি। জোছু তাতে যদি খুশী হয়, আমি খুশী হব। কিন্তু শিশিরবাবু ফিরে আসবেন কেন ?

ক্রমেই যেন নিঝুম হয়ে পড়ছিল অরুণা। অরুণার কাছে এগিয়ে এসে তেমনি শান্ত স্বরে অবনী বললো ।—কথা বলছো না যে অরুণা ?

অরুণা অবনীর হাতটা দুহাতে আবেগে ধরে কথা বলবার জন্য মুখ তুললো। চোখ দুটো চকচক্ করছিল অরুণার ।—তুমি আজ আমাকে কোন কথার উত্তর দিতে দিচ্ছ না কেন অবন্ ? কি ভাবছো তুমি ?

অরুণাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের ওপর চুমো দিতেই ঠোঁট ভিজে গেল অবনীর ।—ছি ছি, তুমি কাঁদছো অরুণা ?

অরুণা ।—আমি আবার চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, কাউকেই আসতে হবে না।

অবনীর চোখের দৃষ্টি কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল ।—এরই মধ্যে হার ছেড়ে দিলে ?

অরুণা ।—হ্যাঁ, আমার সে শক্তি নেই ।

অবনী ।—খুব আছে ।

অরুণা ।—আবার তুমি আমার সব ভুল করিয়ে দিও না।

অবনী।—কোন ভুল হবে না তোমার। তুমি ভাল ভেবে যা করবে, তাই ঠিক। শুধু আমাকে এর মধ্যে ডেক না। যাও, জোছুকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

—ইন্দ্রকে একবার দেখা করে যেতে চিঠি দিলাম জোছু।

কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেও অরুণার কথাটা শুনতে পেল না জোছু। খোলা বইটা কোলের ওপর পড়েছিল; কিন্তু বইয়ের পাতার বাইরে, বহুদূরে, উদাস চিন্তায় আচ্ছন্ন কোন জগতে জোছুর মন বোধ হয় তখন একাকী পথের পর পথ পার হয়ে চলেছিল। অরুণা জোছুর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে হেসে ফেললো।—এত ভাবনা ভাল দেখায় না জোছু।

চম্‌কে অরুণার দিকে তাকিয়ে জোছু বইটার ওপর আবার মনস্থ হবার চেষ্টা করলো। বইটা কেড়ে নিয়ে অরুণা বললো।—ইন্দ্রকে একবার দেখা করে যাবার জন্য চিঠি দিলাম।

জোছু বোধ হয় বিরক্তি চাপতে গিয়েই বললো।—বইটা দাও।

অরুণা।—আগে আমার কথার উত্তর দাও।

জোছু।—তুমি অনর্থক আমার ওপর উপদ্রব করছো বৌদি।

অরুণা।—উপদ্রব ?

জোছু।—হ্যাঁ।

অরুণা বিমর্ষ হয়ে বললো।—ইন্দ্র দূরে সরে থাক্‌লেই কি তোমার ভাল হবে ?

জোছু।—আমার ভালর কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন ?

অরুণা।—হ্যাঁ, এটা তোমারই ভাল মন্দের প্রশ্ন।

জোছু।—ভুল হচ্ছে বৌদি।

অরুণা—বেশ, তাহলে ইন্দ্রকে আসতে বারণ করে দিই। কিন্তু খুবই অশোভন ব্যাপার করলে জোছু।

অরুণার সতর্কতা সত্ত্বেও তার উত্তরের মধ্যে একটা তিক্ততা ফুটে উঠলো।

জোছু চুপ করে রইল। অরুণা যেন জোছুর মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য একটা লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিল। সেই অশোভন সত্যের কাহিনীটাই সেখানে কঠোরভাবে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

অরুণা বললো।—শিশির বাবুকে আসতে লিখেছি।

জোছু উৎসাহিত ভাবেই প্রত্যুত্তর দিল।—আরও আগেই লেখা উচিত ছিল বৌদি।

খুবই নির্লজ্জ হয়ে জোছুর কথাগুলি অরুণার কানে বাজলো। বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না অরুণা। সেই সন্দেহের সত্যটাকে চরম ভাবে যাচাই করবার জন্যই যেন অরুণা আবার বললো।—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, শিশিরবাবু আসবেন না। তুমি যদি অনুরোধ করে লেখ, তবেই আসতে পারেন।

জোছু হেসে ফেলে বললো।—তুমি জেনে শুনে একটা ভয়ানক রকমের উল্টো কথা বললে বৌদি। এটা উচিত হলো না তোমার।

জোছুর প্রতিবাদটা স্পষ্টতায় উদ্ধত হয়েই শোনায়। অরুণা যেন পাশে দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্ন-ছায়ার মত সংকোচে ছোট হয়ে পড়ছে। অনেক সাহস ও ভরসায় একটা অভিযানের নেশা নিয়ে এগিয়ে চলেছিল অরুণা। কিন্তু পদে পদে ব্যর্থ হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এর জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না অরুণা। তাই ক্ষণে ক্ষণে সামান্য এক একটা বাধায় অসহায় হয়ে পড়তে হয়। কোথায় যেন দুরন্ত একটা ভুল তাকে দুর্বল করে রেখেছে। তাই পথটা এত কুটিল ও অবুঝ মনে হয়।

অরুণার মৌনতায় একটু বিচলিত হয়ে পড়লো জোছু।—ভুল বুঝে আমার ওপর রাগ করো না বৌদি।

অরুণা।—হ্যাঁ, আমারই শুধু ভুল হচ্ছে। তুমিও একথা বলছো, তোমার দাদাও তাই বলে।

নিতান্ত অর্থহীন অভিমানের মত শোনালো কথাগুলি।

চলে যাচ্ছিল অরুণা। জোছু শুধু একবার বললো।—এসব নিয়ে দাদার সঙ্গে কোন আলোচনা করো না বৌদি।

মনের ভেতর এক বোঝা অস্বস্তি নিয়ে চলে গেল অরুণা। কোন উত্তর দিল না। আজ এতক্ষণ সে যেন দ্বার থেকে দ্বারে শুধু পরাভব কুড়িয়ে ফিরেছে। পরের জন্য লড়তে গিয়েই তো এই পরাভব।

এঘর থেকে ওঘরে বৃথা অনেকক্ষণ কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল অরুণা। আলমারিটাকে নতুন করে সাজিয়ে, আল্‌নাগুলিকে সরিয়ে, সিন্দুক খুলে বাসনগুলিকে রৌদ্রে দিয়ে, একটা ছেঁড়া সোয়েটারের উল খুলে—তবু কাজ ফুরোচ্ছিল না। নিতান্ত নিরাস্বাদ কতগুলি কাজ।

অবনীর আলোয়ানটা তুলে নিয়ে রোদে মেলতে গিয়ে আত্মাপরাধের একটা চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে দুঃখে ও লজ্জায় অরুণার মনের ভেতরটা কেঁদে উঠলো হঠাৎ। আলোয়ানের পাড়ের কাছে এক জায়গায় অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে, তবু রিপু করতে ভুলে গেছে অরুণা। অরুণা জানে, লোকটিও তেমনি মানুষ, কস্মিন্‌কালেও স্মরণ করিয়ে দেবে না, বা কোন অসুবিধার কথা মুখ ফুটে বলবে না। তেষ্টা পেলে এক গেলাস জল চাইবার মত উদ্যমটুকু পর্যন্ত হারিয়ে বসে আছে ভদ্রলোক। অরুণাকেই নিজে থেকে অবনীর যত অভাষিত ও অযাচিত দাবি মন দিয়ে বুঝে নিতে হয়। অবনী যেন তার প্রতিটি নিশ্বাসের হিসাব অরুণার ওপর ছেড়ে

দিয়ে বসে আছে। ভালবেসে সব দিয়ে দিয়েছে অবনী, তাই না অবনী আজ এত ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত।

জীবনে ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সুখী হয়েছে অরুণা। এমন অকৃপণ ভাগ্য ক'জনের হয়? ভালবাসা দুরূহ হয়ে থাকবে, বিচ্ছেদটাই শুধু নিয়তি হয়ে দাঁড়াবে—জীবনে এর চেয়ে বড় অভিশাপ কল্পনা করতে পারে না অরুণা। জোছুর কথা মনে পড়লে তাই এত বিচলিত হয়ে পড়তে হয় তাকে। ইন্দ্রনাথের জন্য মমতা হয়। বিপিনের কথা ভেবে তাই এত খুশী হয় অরুণা। বিপিন তার সংসারের বীভৎস ভগ্নস্তূপ থেকে হারানো হৃদয়কে আবার উদ্ধার করে ফিরে গেছে। বিপিন আর টুনার মা যেন ভালবাসাকে সকল অক্ষমা ও অবনতি থেকে ঊর্ধ্বে তুলে জয়ী হয়ে চলে গেছে। সুখী হোক ওরা।

এই সাহসেই ভর করে সাগ্রহে এগিয়ে গিয়েছিল অরুণা। জীবনে মিলনই শুধু নিয়তি হয়ে উঠুক্। তবুও, এই সুন্দর সাধনার আয়োজন আরম্ভেই কেন যেন একটি আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেতে বসেছে। জোছু একটু ভেবেও দেখলো না, কার স্বার্থের জন্য অরুণা এই ঝঞ্ঝাট সইছে?

অনেকক্ষণ ধরে টুকিটাকি নানা কাজের অস্থিরতার মধ্যে মনের ভেতর এই ব্যর্থতার ক্ষোভটুকু যেন ছেঁকে ফেলতে চেষ্টা করছিল অরুণা। পরের প্রেমের হিসাব মিলাতে গিয়ে নাকাল হবার আর কোন দরকার নেই তার! সে শক্তি তার নেই। কিন্তু ইন্দ্রের কাছে চিঠি চলে গেছে। জোছুর কথা লেখা হয়েছে চিঠিতে। নিশ্চয় আসবে ইন্দ্র। বেচারা ইন্দ্র জানে না যে পাথরের ফুলের মত হয়ে গেছে জোছু, বাতাসের দোলা এসে গায়ে লাগ্‌লেও আর সাড়া দিতে পারবে না। স্রোতের গতি ফেরাতে গিয়ে নেহাৎ মূর্খের মত একটা আবর্ত তৈরী করে তুললো অরুণা। শিশিরবাবুও হয়তো আসবেন। তারপর? এসেই বা কি

লাভ হবে তাঁর? কোন উত্তর খুঁজে পায় না অরুণা। যেন ঠাঁই না করেই হঠাৎ দুটি নিরীহ মানুষকে নিমন্ত্রণ করে বসেছে অরুণা।

আবছা একটা শঙ্কায় বুকের ভেতরটা শিউরে উঠতে লাগলো অরুণার। সামর্থ্য নেই, অথচ প্রচুর উপচারের সমারোহে ভরা এক ব্রত যেন মানত করে বসে আছে সে। উতলা বাতাসের মত ভাবনাগুলি শুধু অরুণার মনের ওপর ধূলোবালি আর খড়কুটো উড়িয়ে এনে পথের শেষ দাগটুকুও ঢেকে ফেলছিল। কাজ ভুলে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অরুণা।

এই আনমনা আবেশের মধ্যেই একটা কথা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো অরুণা—এত কি ভাবছো বৌদি?

কাছে এগিয়ে এসে কথাটা বলেই ব্যস্তভাবে চলে গেল জোছু।

দুঃসহ লজ্জায় যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছিল অরুণা। আজ প্রত্যেকটি ঘটনা বার বার তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাইছে। কেউ কিছু ভাবছে না। অবনী নয়, জোছু নয়। সব ভাবনা একান্ত ভাবে তারই নিজস্ব বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যে তার নিজেরই জন্য ভাবনা জোছুর কথাটা যেন আকাশবাণীর মত গোপন চেতনার একটা মুখচোরা সত্যকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়ে গেল।

একটা ভীরু সংশয় ঠাণ্ডা নিশ্বাসের মত অরুণার মনের ভেতর শেষ আলোর দর্প টুকু নিভিয়ে আনছিল। হয়তো জোছু আবার ঘুরে এসে আরও স্পষ্ট করে বলে যাবে—তোমারও নিশ্চয় কোন স্বার্থ আছে বৌদি তাই তোমার এত ভাবনা অভিমান আর হতাশা। নিজের জন্যই তোমার এই পরাভবের দুঃখ।

যেন বাতাস হাতড়ে হাতড়ে অবসন্নের মত ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো অরুণা। যার কাছে লুটিয়ে পড়তে সব চেয়ে ভাল লাগবে, চিরকাল

ভাল লেগে এসেছে—অরুণা যেন তারই খোঁজ করে ফিরছে। কিন্তু অবনী ঘরের ভেতর ছিল না। কলতলার দিক থেকে একটা সাড়া পেয়ে এগিয়ে গিয়ে অরুণা দেখ্‌লো, অবনী বেশ নিবিষ্ট মনে সাবান দিয়ে কতগুলি রুমাল আর তোয়ালে কাচ্‌ছে।

চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছিল অরুণার। এ দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা সহ্য করার মত ধৈর্য্য তার ছিল না। সমস্ত ভুলের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিটাও এইভাবে তৈরী হয়ে ছিল, স্বপ্নেও অনুমান করতে পারেনি অরুণা।

অবনীর হাত থেকে সাবানটা কেড়ে নিয়ে অরুণা ধমক দিল।—শীগ্‌গির ওঠ বলছি।

অবনীকে কোন প্রতিবাদ করার অবকাশ না দিয়েই অরুণা আবার বললো।—কোন কথা শুনতে চাই না। ওঠ তুমি। অফিসের বেলা হয়ে গেছে, খেয়াল আছে কিছু ?

অবনী একটু অপ্রস্তুতের মত বললো।—হ্যাঁ, সে খবরটা তোমাকে এখনো বলা হয়নি।

অরুণা।—কিসের খবর ?

অবনী।—অফিসের।

অরুণা।—কি ?

অবনী।—চাকরির পাট চুকে গেছে। কালকেই অফিসে গিয়ে দেখলাম, বিদায়পত্র এবং এক মাসের দক্ষিণা তৈরী হয়ে আছে। ব্যাঙ্কের বড়কর্তা দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে আমার মত কেজো কেরাণীকে ছাড়িয়ে দিতে হলো।

অবনীর হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল অরুণা।

অবনী ঠাট্টার সুরে বললো।—এ কি ? খবরটা শুনে যে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লে !

অরুণার চোখদুটো ছল্‌ছল্‌ করছিল।—সবাই মিলে তোমার এত ক্ষতি করছে কেন অবন্? এমন কি দোষ করেছ তুমি?

অবনী।—সবাই মিলে আমার ক্ষতি করছে, কে বললে? মাত্র এক জনের নাম জানতে পেরেছি, ব্যাঙ্কের কর্তা জগৎ ভট্‌চায। কিন্তু এছাড়া আর কে?

অবনীর হাতের ওপর চোখ দুটো ঘসে নিয়ে অরুণা বললো।—না, আর কেউ নয়। ষাট্, আর কেউ তোমার ক্ষতি করবে না অবন্? কেউ ক্ষতি করতে পারবেও না।

—কি শুনলাম রে অবু, চাকরির পাট চুকে গেছে?

পিসিমার গলার স্বরে চম্‌কে উঠে মাথার কাপড় টেনে অরুণা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। জপের মালা হাতে নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন পিসিমা।

অবনী আপসোসের সুরে উত্তর দিল।—হ্যাঁ পিসিমা। বিনা দোষে ছাড়িয়ে দিলে।

পিসিমার চোখ থেকে সংশয়ের ছায়াটা তখনো সরে যায়নি।—বিনা দোষে কি কারও চাকরি যায় আবু? নতুন কথা শোনাচ্ছিস্ আমাকে?

পিসিমার কথাগুলি থেকে প্রচ্ছন্ন একটা গঞ্জনা উপ্‌চে পড়ছিল। আশ্চর্য হচ্ছিল অবনী। পিসিমা উপদেশ দিলেন।—দোষ করে থাকিস্ তো মাপ চেয়ে আবার চাকরিটা ঠিক করে নে অবু। বড়লোকের কাছে মাপ চাইতে কোন লজ্জা নেই। লজ্জা করলে চলবে কেন?

অবীন হেসে জবাব দিল।—সত্যিই আমি কোন দোষ করিনি পিসিমা

—বুঝলাম না বাপু। পিসিমা যেন রাগ করেই কথাটা বলে চলে গেলেন।

সাইরেন বেজে উঠলো। সারাদিনের যত দুঃসংকেতের ভরা যেন পূর্ণ

হয়ে উঠলো এতক্ষণে। অবনীর হাত ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো অরুণা।

অবনী বল্লো।—তোমার গা'টা কেমন গরম মনে হচ্ছে, জ্বর হয়নি তো ?

অরুণা।—হোক্ গে, আমার কাছে বসো তুমি। তোমার কোলে মাথা রেখে শোব।

বাইরের রাস্তায় পথিকের দৌড়দৌড়ি আর এ-আর-পি কর্মীদের হুইসিলের শব্দ থেমে গেছে, ত্রস্ত ঝড়ের বিলাপের মত দূরে ও নিকটে সাইরেনগুলি একটানা বেজে বেজে থেমে গেল। চল্লিশ কোটি শৃঙ্খলিত মনুষ্যত্বের সকল দুর্দশাকে টিটকারী দিয়ে, সাইরেনের কাতরানি ছাপিয়ে আকাশে ও মাটিতে বিস্ফোরকের নির্লজ্জ উল্লাস মধ্যদিনের কলকাতার দাস্যসুখী আত্মার সাড়া কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিল।

বোমা অনশন আর একশো অর্ডিন্যান্সের শাসন—পাঁচ হাজার বছরের সভ্য মানবতার আধার ভারতের সত্যাগ্রহী সত্তা অপমানের আঘাতে রক্তক্লিন্ন হয়ে উঠেছে। যেন মৃত্যুর হিক্কা উঠছে চারদিকে। শুনলে ভয় পেতে হয়, দেখলে শেষ ভরসার নিশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে আসে, ভাবলে ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ভারতের অক্ষয় বটের শিকড়ে যেন আগুন লাগলো এতদিনে। রাজ্যলিপ্সার এই কালদাহে পৃথিবীর শেষ ছায়াটির স্নিগ্ধতা যেন পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে।

শুধু অবনা নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে মাঝে মাঝে এই অপমানের শোক সকল আশাবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে দেয়।

এই শ্মশানসন্ধ্যার অবসাদের বাতাসে পরমাণুর সংগীতের মত তবু যেন একটি অশোক মন্ত্র সকল হতাশা ছাপিয়ে জেগে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর

উদ্‌ভ্রান্ত মনুষ্যত্বকে প্রেমে মৈত্রীতে শান্তিতে ও সুস্থশৌর্য্যে সুন্দর করার আয়োজনে, নতুন সংঘারামের প্রার্থনার মত ভারতের কংগ্রেসের বাণী।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ নিঝুম প্রাণ সে-বাণীর ছোঁয়ায় বিজয়বন্ত মশালের মত দ্যুতিমান হয়ে ওঠে।

তা'রা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পথের দিশা দেখায় তা'রা। তা'রা কানে কানে মন্ত্র পড়ে যায়। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মনুষ্যত্ব চাই, সবার আগে চাই স্বাধীনতা। মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে উদ্ধার চাই। অন্যায়ের প্রতিরোধ চাই, জুলুমের প্রতিকার চাই। নির্ভীক হও, প্রতিজ্ঞা কর, দাবি কর, লড়তে শেখ। করবো, না হয় মরবো।

—পরাধীনতার বিভীষিকা, হঠ্ যাও হিন্দুস্থানসে! নিরন্নদের আড্ডায় প্রতি সন্ধ্যায় দৈবীমূর্তির মত এই সংকল্পের বাণী নিয়ে কারা যেন আসে, একেবারে আপন হয়ে গা-ঘেঁসে বসে। ক্ষণিকের জন্য এক দুর্মদ জীবনের নেশা নিরন্নদের শীর্ণ পরমায়ুর বৃন্তে ঝড়ের মাতন জাগিয়ে চলে যায়। নিরন্নেরা বলে—যখন ডাক দিবেন, তখনই আমরা তৈরী আছি বাবু। আর কিসের ডর? দুষমনের চেহারাটা একবার দেখিয়ে দেবেন। তারপর দেখে নেব আমরা।

আর একজন উৎসাহে সমর্থন জানায়—একেবারে ঘিরে নিয়ে পড়ে থাকবো।

তৃতীয় আর একজন বলে—এখানে মিছা মরতে পড়ে আছি, না হয় ওখানেই মরবো। যা আছে অদেষ্টে!

একটি বৃদ্ধ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে।—বেঁচে থাক্ কংগ্রেস। এই ধাক্কাটা একবার সামলে উঠি বাবু, বাকী যেকটা দিন বাঁচি কংগ্রেসের কথা মেনে চলবো। বেঁচে থাক্ কংগ্রেস।

লঙ্গরখানায় অন্নার্থীদের পংক্তিতে বসে খিচুড়ি খেতে খেতে কয়েকটি

গ্রাম্য গৃহস্থ যুবক করুণভাবে পরিবেষক ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্মী ছেলেরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।—কি ? আর চাই ?

একটি গৃহস্থ যুবক ম্লানভাবে হেসে জবাব দেয়।—আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম বাবু মশাই। একদিন কত স্বদেশী বাবুদের নিজে হাতে পাত পেড়ে মাছ ভাত খাইয়েছি বাবু। আর আজ দেখুন, ভিখিরী হয়ে পাত পেতে বসেছি।

কর্মী ছেলেরা বলে।—কে বলে আপনারা ভিখিরী ? আমাদের সহরে দুদিনের জন্য অতিথি হয়েছেন আপনারা। গাঁয়ে ফিরে যান, বাঁচতে চেষ্টা করুন। কংগ্রেসের অনুরোধ মনে রাখবেন।

পার্কে বসে একটি ছাত্রদের জটলা রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বলে।—একটা কথা ছিল।

সন্দিগ্ধ ছাত্রেরা বলে।—বলুন।

ভদ্রলোক—আপনারা নিশ্চয় সম্প্রতি ফাসিস্তবাদকে ঘৃণা করতে শিখেছেন ?

ছাত্রেরা।—একশো বার ঘৃণা করবো, তাতে দোষ কি আছে মশাই ?

ভদ্রলোক।—তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাসিস্তবিরোধী প্রতিষ্ঠান ভারতের কংগ্রেসের কথা নিশ্চয় ভুলে যান নি ?

ছাত্রেরা আগন্তুক ভদ্রলোকের কথায় কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের গলার স্বরটা যেন হঠাৎ আবেগে গভীর হয়ে ওঠে।—আজ নয়, সাত বছর আগের ইতিহাস একবার স্মরণ করুন। ফাসিস্তির আক্রমণে স্পেনের জনতন্ত্রের সেই দুঃখময় মুহূর্তের কথা মনে করুন। বার্সিলোনার পথে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সেবার নৈবেদ্য নিয়ে কংগ্রেসের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ছুটে চলেছে। পথের দুপাশে স্পেনের নরনারী ভারতের জাতীয় পতাকাকে নমস্কার জানাচ্ছে, পুষ্পবৃষ্টি করছে।

স্মরণ করুন, মুক্তিকাম চীনের সাধনা। উত্তর চুংকিংয়ের প্রতি গিরিবত্মে অষ্টম রুট আর্মির দেশভক্ত সন্তানেরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছে তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ভারতের কংগ্রেসের মেডিক্যাল মিশন। আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রীড়িতের সান্ত্বনা, আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সুহৃদ্। নয় কি?

ভদ্রলোক একটু চুপ করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।—তবু, আমাদের কংগ্রেসকে অপমান করার জন্য চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে ভাই। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসের মর্যাদা রাখবেন আপনারা, কংগ্রেসকে ভুলবেন না, ভুল বুঝবেন না। আপনারা মহৎ হলে কংগ্রেস মহৎ হবে। কংগ্রেস মহৎ হলে আপনারা মহৎ হবেন। আপনারাই কংগ্রেস। কংগ্রেস কোন পার্টি নয়, দল নয়, আশ্রম নয়। কংগ্রেস মানুষের ইতিহাসের ইঙ্গিত পথ ও পরিণাম।

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চলে যান। ছাত্রেরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। চটুল তর্কের নেশা বিস্বাদ মনে হয়। নতুন একটি গর্ব গৌরব ও বিশ্বাসের বাণী তাদের মন জুড়ে সুরে সুরে সরব হয়ে উঠতে থাকে।

অধ্যাপকদের ক্লাবে যুদ্ধতত্ত্বের অর্থভেদ করতে বিতণ্ডার ঝড় ওঠে। গণতন্ত্রের যুদ্ধ না সাম্যের যুদ্ধ? কে বেশী ভয়ংকর, সাম্রাজ্যবাদ না ফাসিস্তবাদ? সাম্রাজ্যবাদীরা ফাসিস্ত হতে চায়, না ফাসিস্তরা সাম্রাজ্যবাদী হতে চায়?

নিতান্ত অপরিচিত ও অনাহূত একটি অতিথিবেশী মূর্তি সকলকে বিস্মিত করে উত্তর দেয়—এই দুটিই সত্য, দুই-ই সমান। এই যুদ্ধের সকল অনর্থের মূলে ঐ পুরাতন ও নূতন লিপ্সার দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন ওঠে, এই যুদ্ধের বীভৎস ভ্রূকুটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন্ দেশ

মানুষের সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ করছে? সত্যি করে আদর্শের জন্য লড়ছে কে? কাদের শৌর্যে ও ত্যাগে অস্ত্রসর্বস্বতার দম্ভ খর্ব হতে চলেছে?

অনাহূত অতিথি করযোড়ে আবেদন করেন—তা হলে বলতে হয়, আমাদের ভারতের কংগ্রেস। সারা পৃথিবীর বিবেকের প্রতীকের মত আমাদের কংগ্রেস। সর্বমানবের সুখ শান্তি ও মুক্তির একমাত্র নিষ্কলুষ আদর্শের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, কত দুঃখের পরীক্ষায় কত মহৎ হয়ে উঠেছে আমাদের কংগ্রেস! কংগ্রেসকে ভুলবেন না আপনারা।

বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের আসরে কথায় কথায় রাজনীতি এসে পড়ে। কোন সুবেশিনী খদ্দরের নিন্দে করেন। কোন অতিশিক্ষিতা আন্তরিক-ভাবেই জাতীয়তা জিনিসটা বরদাস্ত করতে না পেরে বলেন—জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাব। একটা গোঁড়ামি। এর থেকেই শেষে ফাসিস্তবাদ পেয়ে বসে।

খদ্দরপরা একটি অচেনা মেয়ে শান্তভাবে জবাব দেয়।—ঠিক কথা। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটু আপনার ভেবে দেখা উচিত। পরাধীনের জাতীয়তা আর স্বাধীনের জাতীয়তা কি গুণেধর্মে একই ব্যাপার? পরাধীনের জাতীয়তা শত গোঁড়ামি সত্ত্বেও একটা ঐতিহাসিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে যায়। স্বাধীন শক্তিমানের জাতীয়তার গোঁড়ামিতেই শুধু আশঙ্কা—সেইখানেই ফাসিস্তবাদের হাওয়া।

সকলে মিলে সাগ্রহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকে—আপনার নাম? কি করেন আপনি? কোথায় থাকেন?

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়—আমি কংগ্রেসের কাজ করি। আজ উঠি, আবার দেখা হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসকে ভুলবেন না কখনো। বিশ্বের সভ্যতায় আধুনিক ভারতের সব চেয়ে

গৌরবের সৃষ্টি আমাদের কংগ্রেস। এই সত্য আমি দু'চোখে দেখতে পাই, আমি তাই বিশ্বাস করি। সেই আনন্দে সবার কাছে কংগ্রেসের কথা বলি। যতটুকু সাধ্য তাই করি।

সারা ভারতের অদৃষ্টের আকাশে প্রতিদিন নিয়মিত সূর্য উঠে ডুবে যায়। পরাধীন জীবনের অভিশাপ প্রতিদিনের দাহনে বীভৎসতর হতে থাকে। লক্ষ নিরুপায় নরনারী ও শিশুর পরিত্রাহি আর্তনাদের সম্মুখে অন্ন বস্ত্র ভেষজ নির্মম অবজ্ঞায় দূরে সরে যেতে থাকে। সরকারকে থার্জনা দিতে কোন ভুল করেনি তারা। তবু তারা রইল না। মারী আর মৃত্যু পালা করে তাদের নিশ্বাস লুটে নিয়ে যায়। নিরীহ প্রজাধর্মের শেষ স্বাক্ষর শুধু অস্থি হয়ে ছড়িয়ে থাকে বাংলাদেশের ক্ষেতে মাঠে আর রাজপথে।

এই অসহায় ধ্বংসের অভিনয়ে আর এক দফা পরিহাসের মত হিরোহিতোর দূতেরা পাখা ঝাপ্টে আকাশপথে উড়ে আসে। দাসত্বে জীর্ণ কয়েক শত দুর্ভাগার জীবনকে অবাধে ছিন্ন ভিন্ন করে চলে যায়।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত দেশের হাজার হাজার সংগ্রামী সত্যাগ্রহীর বিবেক এই যাতনাময় পরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে তিমির রাত্রির তারার মত ফুটে ওঠে। সকল কলুষের আক্রমণ থেকে কংগ্রেসের বাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শহরে গাঁয়ে গঞ্জে হাটে, প্রতি জনতার একেবারে হৃদয়ের কাছে গিয়ে তারা কংগ্রেসের ধর্মযুদ্ধের বাণী শুনিয়ে বেড়ায়। যে শোনে সেই নিঃশঙ্ক হয়ে ওঠে। ভারতের মুক্তি না হলে মানুষের মুক্তি হবে না, সবার ওপরে এই সত্যকে তারা মনে প্রাণে অনুভব করে। আটলাণ্টিক সনদের কপট শব্দতূর্যের আশ্বাস নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যায়।

কাজের নেশায় পেয়েছে অবনীকে, বাইরে ঘুরে ঘুরে দিন ফুরিয়ে

যায়। এদিকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে ভয় পায় অরুণা। একটা দৈন্যের ছায়া যেন নিঃশব্দে মুখ গুঁজে বসে আছে। জোছুর পড়ার বই বন্ধ। পিসিমা অস্বস্তিতে ছটফট্ করেন। শিশিরের চিঠি আর আসে না। ইন্দ্র কোন উত্তর দেয়নি।

প্রতি বছরের মত ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রভাত কোটী কোটী ভারত-বাসীর মুক্তিসংকল্পের পুণ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভোরে উঠেই অবনী বের হয়ে যায়। ফিরে আসে অনেক বেলা করে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বুক দুরদুর করতে থাকে। দুঃসহ একটা প্রদাহে যেন অবনীর মুখটা ঝল্‌সে গেছে। কোন বছরের এই শুভ দিনটিতে অবনীকে এতটা অস্বাভাবিক দেখেনি অরুণা।

একটু সহজ হবার জন্যই অরুণা মুখে হাসি টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে। —স্বাধীনতা দিবসের উৎসব কেমন হলো এ বছর ?

অবনী—ভালই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অবনী আবার বললো—কিন্তু আমাদের মিছিল ফিরে এসেছে, পার্কে ঢুকতে পারেনি।

অরুণা—কেন ?

অবনী—পার্কের গেট বন্ধ ছিল। ভেতরে পুলিশ আর কম্যুনিস্টরা বসেছিল।

অরুণা ম্লানমুখে বললো—তা হ'লে কি এ বছর সংকল্প পড়লে না তোমরা ?

অবনী—পড়েছি। আশু মাস্টারের বাড়িতে আমাদের অনুষ্ঠান সেরেছি।

অরুণা বিস্মিত হয়ে বললো—আশু মাস্টার ? তিনি তো শুনেছি ……।

অবনী—না, তিনি তা' নন। তিনি নিজে থেকে এসে আমাদের মিছিলকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আশুবাবুর প্রসঙ্গে অবনীর মুখের চেহারাটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠছিল। খুশির আবেগে যেন আপন মনেই বলছিল অবনী।—আশুবাবু একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। আশ্চর্য।

অরুণা বলতে যাচ্ছিল—ইন্দ্রকে দেখতে পেলে না?

তবু মুখ ফুটে বলতে পারলো না অরুণা। উৎফুল্ল অবনীর মুখের হাসিটুকু আজকের দিনে যেন সযত্ন আয়াসে বাঁচিয়ে রাখতে চায় অরুণা!

কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর দিকে তাকিয়ে আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ে অরুণা। অবনীর চোখ দুটো যেন অতি নিকটে একটা নির্লজ্জ অপকীর্তির ছবির দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল। যেমানুষ ঘৃণা করতে জানে না, কখনও কাউকে ঘৃণা করেনি, তার দৃষ্টিতে এই আবিলতার ছোঁয়া লাগে কেন? কি সেই লাঞ্ছনা?

অরুণা বললো—কি ভাবছো?

—না, কিছু নয়।

অবনী আবার স্বচ্ছন্দে উত্তর দেয়। খোঁজ করে—জোছু কোথায়? পিসিমা কি করছেন?

—এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন তোমরা? হেসে হেসে কথাটা আরম্ভ করলেও অবনী শেষ পর্য্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। একটা পালকের চামর দিয়ে দেয়ালের ফটো আর ছবির কাঁচের ধূলো পরিষ্কার করছিল অরুণা। অবনীর প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলে, একটু স্থির হয়ে অবনীর দিকে একবার তাকালো মাত্র।

অবনী আবার বললো।—বিশেষ করে তুমিই দেখছি সবার ওপর টেক্কা দিয়ে রোগা হয়ে চলেছ।

অরুণা চকিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার কাজে মন দেয়। তবু অবনীর দেখতে ভুল হয়নি, কাজের ছলে অরুণা যেন তার মুখের ওপর থেকে নিবিড় লজ্জার একটা শিহুর আড়াল করে নিল। অবনী মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, অরুণার কানের দুল কাঁপছে, যেন তার আরক্ত কপোলের কিছুটা নেশার ছোঁয়া এসে লেগেছে দুলের ওপর—সেই সঙ্গে এক সংগোপনের বার্তা ফুটে উঠেছে ইশারা দিয়ে।

অবনী ডাকলো।—অরুণা।

অরুণা।—কি ?

অবনী।—উত্তর দিচ্ছ না কেন অরুণা ?

অরুণা যেন সহজ হবার ছল করে উত্তর দিল।—কি বলবো বল ? শুধু আমিই কি রোগা হয়েছি ? দেখছো না, পিসিমা কেমন শুকিয়ে গেছেন, আর জোছুও কত কাহিল হয়ে পড়েছে ? আর মশাই নিজে কি হয়েছেন, আয়নাতে একবার দেখে নিন্।

অবনী হাসলো।—আমরা তো অভাবে রোগা হচ্ছি।

অরুণা।—আর আমি বুঝি…… ।

অবনী।—তুমি বোধ হয় ভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছ অরুণা।

অরুণা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অরুণা একটু আক্ষেপের সুরে বললো।—কিন্তু পিসিমা সত্যি বড় মুষড়ে পড়েছেন !

ক্ষণিকের জন্য অবনীর মনের প্রসন্নতা মুছে গেল। অসহায়ের মত তাকিয়েছিল অবনী। কাতর আবেদনের মত নিজের অজ্ঞাত সারেই অবনীর অসহায়তা যেন হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল।—

পিসিমার যেন কোন কষ্ট না হয় অরুণা, তা'হ'লে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

কাজ থামিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে একটু অনুযোগের সুরেই অরুণা বললো।—তার জন্যে তুমি চিন্তা করো না।

অবনী বললো।—কিন্তু, কিন্তু চিন্তা না করে যে পারছি না। চিন্তা করবার জন্যই যে এখনও পৃথিবীর সবার মধ্যে তোমাদেরই শুধু বেছে রেখেছি। সবার মতই যদি তোমাদের ভাবতে পারতাম, তবে তো কথাই ছিল না। অনশনে বাঁকারামের মত কত প্রাণ শেষ হয়ে গেল, সেদুঃখ বেশ ত সয়ে যাচ্ছি। তাই ব'লে কি তোমরাও একে একে।·····কিন্তু এ শাস্তি যে আমি সইতে পারবো না। এত শক্তি আমার নেই। এত দম্ভও আমার নেই। মোট কথা আমি সইতে পারবো না অরুণা বাঁকারামের প্রাণের জন্য স্যালাইনের দাম দিতে দ্বিধা করেছি। তাই কি তুমি বলতে চাও, তোমরাও একে একে রোগা হয়ে, শুকিয়ে আর কাহিল হয়ে, আমার চোখের ওপর শেষ হয়ে যাবে? তুমি বলতে চাও, তোমাদের বাঁচবার জন্য চুরি ডাকাতি করবো না? মনে করেছ, কোন দাম দিতে দ্বিধা করবো আমি?

একটা স্বপ্নে-দেখা আতঙ্কের দিকে তাকিয়ে যেন প্রলাপ বকে চলেছিল অবনী। চোখ দুটো উত্তেজনায় অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে উঠেছিল। অরুণা ভয় পেয়ে এগিয়ে এসে অবনীর মুখ চেপে ধরলো।—ছি ছি, বড় জ্বালাচ্ছো অবন্। ভাল কথা বলতে বলতে আবার কিসব আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে! এ-সব কথা যে এখন আমার শুনতে নেই, তুমি কি বুঝছো না কিছু?

উত্তেজনার ভাবটা কেটে গিয়ে একটু আশ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবনী লজ্জিত হয়ে পড়লো।—ব্যাপার এমন কিছু নয় অরুণা।

আমারই ওপর পরীক্ষাটা যেন একটু কঠোর হয়ে দেখা দিল। তাই বলছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে অবনী বলে—দেশের লোককে ভালবাসি, জীবনে মরণে ও সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সমান হয়ে থাকতে একটা আনন্দ আছে। কংগ্রেসের দুটো কথার সম্মান যদি রাখতে পারি, একটা তৃপ্তি পাই। এর চেয়ে বড় কথা কখনও বলিনি। ধরো, মিথ্যে করেই বলেছি। এর চেয়ে অনেক বড় মিথ্যে বলে কত লোক সেরে যায়। কিন্তু আমাকে সারতে দিচ্ছে না।

অরুণা—মিছিমিছি বড় বেশি ভাবছো তুমি।

অবনী—ভাবতে চাইনি, তবু ভাববার সুযোগ চলে এল। ভাবতে পারিনি, এই ক্ষুধাহত মৃত্যুর অভিশাপ ফুটপাত থেকে আমার ঘরেও এসে ঢুকবে। এভাবে ভাগ্য মেলাতে চাইনি তাদের সঙ্গে। তবু তাই হতে চললো। সবার সঙ্গে এবার আমরা সত্যি সত্যি সমান হতে চললাম অরুণা। শুধু এইটুকু দুঃখ হচ্ছে, এ'কে সৌভাগ্য বলে মেনে নেবার মত শক্তি পাচ্ছি না।

অবনী উঠে ঘরের ভেতর একবার পায়চারি করে নিল। এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে যেন মনের সব ভার দূরে সরিয়ে দিল।—চাকরি একটা করতেই হবে। পেয়েও যাব বোধ হয়। শুধু ভয় হচ্ছে, এরই মধ্যে যদি……।

অবনীর কথায় অরুণা একটু উৎফুল্ল হয়ে আবার হাতের কাজ খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর আর একটা মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করবার জন্য এগিয়ে এলো।

অবনী বলছিলো—জোছুই ঠিক বুঝেছে।

অরুণা—কি ?

অবনী—জোছু বুঝেছে যে, আমি বোধ হয় তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তাই আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে জোছু।

অরুণা রাগ করে—ব্যবস্থা করলেই হলো! পাঁচশো মাইল দূরে কোন্ বিভূঁয়ে মাস্টারনীগিরি না করলেও চলবে। তুমি যেন জোছুর কথায় রাজি হয়ো না।

অবনী—রাজি হয়ে গেছি। ওর কাজের চিঠি এসে গেছে। শুধু তাই নয়, আজই রওনা হতে হবে।

স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অরুণা একটু অভিমান করেই বলে উঠলো—জোছু আমাকে কিছু বললে না কেন?

অবনী—আর ওর ওপর বৃথা রাগ করো না। তোমাকে বোঝাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে জোছু।

একটা হতাশ্বাসের কুয়াশার ভেতর যেন পথ খুঁজে খুঁজে এলোমেলো ভাবে অরুণা উত্তর দিল।—কিন্তু আমি যে ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি একবার আসবার জন্য আবার চিঠি দিয়েছি। জোছু চাকরি নিয়ে মোরাদাবাদ চলে যেতে চাইছে, সেকথাও লিখেছি। এইবার ইন্দ্র না এসে পারবে না। না, জোছুর যাওয়া হতে পারে না। জোছু চলে গেলে।......

মাত্রাহীন তিক্ততায় অসংযত হয়ে অবনীর আপত্তি বেজে উঠলো—তুমি জেদ করে বার বার একটা ভুল করে চলেছ অরুণা। ইন্দ্র আসবে না।

অবনীর ধমকে পরাভব মেনে নিয়েই অবসন্নের মত অরুণা বললো—সত্যি আসবে না ইন্দ্র?

অবনী—না। আসবার হলে তোমাকে দুবার চিঠি লিখতে হতো না। তুমি বার বার ইন্দ্রকে চিঠি লিখে আমাদের অপমান করবার সুযোগ দিয়েছ।

অবনীর দুচোখে যেন একটা নিষ্কম্প দৃষ্টি জ্বলছিল। ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়ালো অবনী! অরুণা একেবারে চুপ করে গেল। একটু শান্ত হবার পর অবনী বললো—ইন্দ্র তো এখন আর দেশের মানুষ নয়, সে এখন পার্টির মানুষ। তোমাদের কোন চিঠির ভাষা সে আজ বুঝতে পারবে না। সে-ভাষা ভুলে গেছে ইন্দ্র। ইন্দ্রের যে কি ভয়ংকর উন্নতি হয়েছে অরুণা, সেটা জান না বলেই তুমি ভুল করে তাকে আসতে লিখেছ।

অরুণা—সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু এতে কি লাভ হবে তার?

অবনী—তোমাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করলে ইন্দ্রের নতুন মনুষ্যত্ব লাভ হবে। পার্টির গৌরব হয়ে উঠবে ইন্দ্র। সে কি কম লাভ?

কথা বলতে বলতে অবনী চাদরটা কাঁধে তুললো, কতগুলি কাগজপত্র পকেটে নিল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অরুণা ডাক দিয়ে বললো—পয়সা-টয়সা না নিয়েই যে চললে?

অবনী—দরকার নেই। ট্রামে চড়া ছেড়ে দিয়েছি, আজকাল হাঁটতেই ভাল লাগে।

অবনীর যুক্তিতে কর্ণপাত করার কোন দরকার ছিল না অরুণার। কৌটা থেকে একটা টাকা বের করে অবনীর পকেটে ফেলে দিয়ে ফিরে এল অরুণা।

ধীরে ধীরে জোছুর ঘরে এসে দাঁড়ালো অরুণা। একটা স্যুটকেসে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখছিল জোছু। জোছু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেও হেসে জিজ্ঞাসা করলো—কি বৌদি?

মেজের ওপর একটা ছেঁড়া চিঠির স্তূপের দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্তভাবে অরুণা আর্তনাদ করে উঠলো—এ কি করেছ জোছু! এ যে ইন্দ্রনাথের চিঠি!

জোছু—যা উচিত, তাই করেছি। বড় পুরনো হয়ে গেছে চিঠিগুলি।

অরুণা।—এই কি উচিত ছিল?

জোছু—ইন্দ্রদা যদি তোমাদের সবাইকে অপমান করতে পারে, তবে আমিও তাকে একটু অপমান করতে পারি না কি?

অরুণা—কিছুই বুঝতে পারছি না জোছু।

জোছু হেসে ফেলে অরুণাকে হাত ধরে বসালো।—তুমি আমাকে কেন বুঝতে পার না বৌদি?

অরুণা।—তোমার কাছে ইন্দ্র এতটা মিথ্যে হয়ে গেছে, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল?

জোছু—বেহায়ার মত একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না তো বৌদি?

অরুণা—না।

জোছু—শিশিরবাবু যখন ছিলেন, তখন আমার সত্যিই ভুল হয়েছিল। অনেকদিন আগেই ইন্দ্রদাকে আমি অপমান করে দিয়েছি বৌদি।

দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে যাচ্ছিল জোছু। অরুণা জোছুর হাতটা সান্ত্বনার ছলে চেপে ধরলো, কিন্তু বলবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর জোছু অরুণার হাত ছাড়িয়ে আবার বইগুলি গোছাতে আরম্ভ করলো। অরুণা তখনো গম্ভীর হয়ে আছে দেখে জোছু হেসে হেসে বললো—আমি বেশ আছি বৌদি, বেশ থাকবোও। আর কোন ভুল আমার মধ্যে নেই। সব দিক থেকে ছাড়া পেয়ে গেছি।

অরুণা তবু চুপ করেছিল। জোছু বললো—তোমাদেরও ছেড়ে চললাম।

অরুণার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। জোছুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললো—তুমি আমার ওপর রাগ করলে না তো জোছু।

প্রচ্ছন্ন মার্জনার মত একটা অস্পষ্ট স্বরের সঙ্গে কথাগুলি যেন জড়িয়েছিল। জোছু এসে অরুণাকে হাত ধরে টেনে ওঠালো—এবার আমি সত্যিই রাগ করবো বৌদি। ওঠ, একটু সাহায্য কর আমাকে। শাড়িগুলি ভাঁজ করি এস।

দুপুর পর্যন্ত সারা বাড়ির হৃদয়টা ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে যেন ভিন্ন ভিন্ন অভিমানে গুমরে রইল। জোছুর বাক্স গোছানো তখনো সারা হয়নি। কি-ই বা এত গোছাবার আছে? বাড়ি-ভরা শব্দের মূর্ছা তাই মাঝে মাঝে খুটখাট করে চমকে ওঠে। পাখি যেন সুযোগ বুঝে চুপিসাড়ে পায়ের শিকলি ঠুকরে ভাঙছে। অন্য ঘরে বসে অরুণা শুনতে পায়। শব্দটা বড় অকৃতজ্ঞ হয়ে অরুণার কানে এসে বিঁধতে থাকে।

মালা জপেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না পিসিমা। থেকে থেকে এক একবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন।

সেলাই নিয়ে বসেছিল অরুণা। হেঁসেলের কাজ দিন দিন যত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অন্য কাজের পরিধি বেড়ে গেছে তত। আজকাল শিল-নোড়ার শব্দ ক্বচিৎ শোনা যায়, কয়লা ভাঙার শব্দ মাঝে মাঝে হয়—উনুনের ধোঁয়া শুধু একটি বেলা দেখা দিয়ে চলে যায়। তাই কল তলায় জলের শব্দটা এত প্রচণ্ড হয়ে বাজে, সারা গৃহস্থালির রিক্ততাকে যেন ধরা পড়িয়ে দেয়।

তাই দিন দিন তকতকে ঝরঝরে হয়ে উঠছে বাড়িটা। দরজা জানালার পর্দাগুলি এত পরিষ্কার কোনদিন ছিল না, আজকাল দুদিন

অন্তর সাবান-কাচা করে অরুণা। ঘরের মেজে চক্‌চক্‌ করে—প্রতিদিনই ঘষামাজা হয়। বাড়িটার চক্ষুলজ্জা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে একটা নিদারুণ দৈন্যকে ভাল করে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

সেলাই শেষ করে আবার কাজ খুঁজছিল অরুণা। অবনী ফিরলো, হাতে একটা পোঁটলা, নানা রকম ফল বাঁধা।

ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে ডাকলো অবনী।—আপনার জন্য ফল এনেছি পিসিমা!

পিসিমা এসে সামনে দাঁড়ালেন। একটু শুষ্কভাবে হেসে বললেন।—এসব কি ছেলেমানুষি করছিস অবু? এত ফল কি হবে?

অবনী—এত আবার কি দেখলেন পিসিমা? সামান্য ক'টা ফল, কি-ই বা দাম! নানা কাজে ভুলে যাই, নইলে রোজই আনতে পারি।

পিসিমা—না না অবু, না রে বাবা, এসব কিছু আমার চাই না।

পিসিমা যেন সন্দিগ্ধভাবে কথাগুলি শেষ করে, একটু শঙ্কিত হয়ে, ফলগুলির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চলে গেলেন।

পরক্ষণেই একটু উত্তেজিতভাবে ফিরে এলেন পিসিমা।—জোছুকে নাকি চাকরি করতে পাঠাচ্ছিস্‌ অবু?

অবনী।—হ্যাঁ পিসিমা।

পিসিমা—একা যাবে জোছু?

অবনী।—হ্যাঁ।

পিসিমা।—তা হবে না, আমি সঙ্গে যাব।

অবনী।—এখনি কেন যেতে চাইছেন পিসিমা? প্রথম চাকরি, নতুন জায়গা—জোছু একটু সুস্থ হয়ে বসুক, তারপর না হয় যেদিন খুশী আপনাকে পাঠিয়ে দিতে……।

পিসিমা।—এই কাঁচা বয়সের মেয়েকে কোন্ আক্কেলে একা বিদেশে ছেড়ে দিচ্ছিস্ অবু ?

পিসিমার উষ্মায় অপ্রতিভ হয়ে পড়লো অবনী। পিসিমাকে বোঝাবার মত কোন যুক্তি আর স্মরণে আসছিল না, তাই বিস্মিত হলেও চুপ করে রইল।

পিসিমা তখুনি স্বর নরম করে বললেন।—আমার আর কিসের দুঃখ বল্ ? দিব্যি সুখে রয়েছি আমি। আমার জন্যে কি-না করছিস্ তোরা। আমার কোন্ দুঃখটা ! কিন্তু জোছুকে একা যেতে দিতে মন মান্‌ছে না আমার।

স্পষ্ট করে উত্তর দিতে গিয়েই একটু কঠোর হয়ে শোনালো অবনীর কথাগুলি।—না পিসিমা, এখন আপনি যাবেন না।

পিসিমা।—কেন ?

অবনী।—এখন গেলে দু'জনেই দুজনকে নিয়ে অসুবিধায় পড়বেন। নতুন জায়গা, জোছু গিয়েই তো সব জানাবে। তারপর সুবিধে বুঝে আপনারও সেখানে চলে যেতে কতক্ষণ ? একটু বুঝে দেখুন পিসিমা।

পিসিমা।—সব বুঝেছি অবু। আমি জোছুর সঙ্গে যাব।

মুহূর্তের মধ্যে পিসিমার এত রুষ্ট দৃঢ়তার স্বর গলে গিয়ে ছেলেমানুষী আব্‌দারের মত কাতরতায় তরল হয়ে উঠলো।

অবনী তবু বললো।—না, এখন হয় না পিসিমা।

পিসিমা নিঃশব্দে অন্য ঘরে চলে গেলেন। ফলের পৌটলাটা সস্তা ঘুষের মত ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল মেজের ওপর। অবনী ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে পড়ছিল। সত্যিই কি পিসিমা সব বুঝে ফেললেন ? সবাই বুঝেছে, ক্ষুধার প্রেত এই সংসারের গলা টিপে ধরতে এগিয়ে আসছে। বাঁচতে হলে চলে যেতে হবেই, তাছাড়া পথ নেই।

ফলের পোঁটলাটা তুলে রেখে অরুণা বল্‌লো।—ওঠ এখন, এখন ভাব্‌বার সময় নয়। স্নান সেরে এস।

সমস্ত বাড়িটাকে আরও নিঝুম করে দিয়ে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে ঘুমিয়ে রইল অবনী। বার বার ওঠাতে এসে অরুণা ফিরে গেছে। জাগাবার জন্য গায়ে ঠেলা দিতে হাত তুলেও একটা মমতার সংকোচে হাত গুটিয়ে নিয়েছে অরুণা। কিন্তু বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসছে, সন্ধ্যা নাম্‌তে দেরি নেই, তারপরেই জোছুকে ট্রেন ধরতে হবে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই জেগে উঠে বসলো অবনী। অরুণা বললো।—জোছুর যাবার সময় হলো।

অবনী।—হ্যাঁ, মনে আছে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল অরুণা। অবনীর চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে রয়েছে; এই আহত অসহায় দৃষ্টির ছোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন নিজেকে একটু কঠিন করে অরুণা সরে পড়ছিল।

অবনী ডাকলো।—আমাকেও কি স্টেশনে যেতে হবে?

অরুণা।—এর মানে? তুমি না গেলে কে যাবে?

অবনী নির্বোধের মত তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করলো।—শেষ পর্যন্ত জোছুকে আবার আমার পাল্লায় পড়ে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে না হয়।

অরুণা একটু কড়া করে উত্তর দিতে গিয়েও পারলো না। সান্ত্বনার সুরে বললো।—এরকম করছো কেন তুমি? কিছু হবে না, কিছু ভেব না।

অবনী তবু চুপ করে বসেছিল। অরুণা এইবার অনুযোগ করে বললো।—তুমি এভাবে লুকিয়ে রয়েছ কেন? ওঠ, জোছুর সঙ্গে দুটো কথা বল। আর সময় নেই।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

অবনী ফুর্তির সঙ্গে একটা লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো। —জোছু, কি করছিস্? তৈরী হয়ে নে, আর সময় নেই।

জোছু এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। অবনী যেন অন্যদিকে তাকিয়ে অনুমানে জোছুর ছায়াটাকে দেখে নিল।

আল্না থেকে খপ করে আলোয়ানটা তুলে নিয়ে অবনী বললো।—এটা সঙ্গে রাখ্ জোছু, মোরাদাবাদে যা শীত!

অরুণার ইশারা চোখে পড়তেই কোন আপত্তি না করে আলোয়ানটা হাতে তুলে নিল জোছু।

অরুণা বললো।—এইবার রওনা হয়ে যাও। আর দেরি করো না।

নিথর অভিমানের মূর্তির মত পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। জোছু প্রণাম করতেই সংক্ষেপে আশীর্বাদ সারলেন—ভাল থেক।

জোছু ডাকলো।—দাদা।

অবনী।—কি?

জোছু।—সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাচ্ছি দাদা।

অবনী।—তা কি আর করবি বল্? আগে প্রাণটা বাঁচাতে হবে তো? যেরকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে···।

কান্নার চেয়েও করুণ হয়ে জোছুর মুখের হাসিটা যেন অনুযোগ করলো—তুমি তাই বিশ্বাস করলে তো দাদা?

জোছুর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে, নিজের রূঢ়তায় লাঞ্ছিত হয়ে অবনী করুণভাবে চেঁচিয়ে উঠলো।—বিরক্ত করিস্ না। আমি কিছু বিশ্বাস টিশ্বাস করি না, তোর কাছে ফিলসফি শুনতে চাই না আমি। চল্ আর সময় নেই।

গুরুদয়ালবাবুর আহ্বান শুনতে পেয়ে সিতা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।—কি বাবা?

গুরুদয়ালবাবু তাঁর মনের ভেতর একটা উত্তেজনাকে যেন কঠিন শাসনে সংযত করে রাখছিলেন। তাই শ্রান্ত মানুষের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে—একটু নিষ্প্রভ অথচ শান্ত।

গুরুদয়ালবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন।—তোর সেই পারুলদি হঠাৎ একটা চিঠি লিখে ফেলেছে আমাকে।

সহসা একটা আঘাত পেয়ে যেন সিতা চম্‌কে উঠলো।—পারুলদির চিঠি?

গুরুদয়ালবাবু।—হ্যাঁ।

মাথাধরার ওষুধের একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে, পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে, জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন গুরুদয়ালবাবু।—তা, আমার কোন আপত্তি নেই সিতা। আমি আপত্তি করবো কেন? আমি আপত্তি করতে পারি না। শুধু এতদিন কিছু জানতে পারিনি বলেই…।

তেমনি শঙ্কিত মুখে সিতা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো।—কিসের আপত্তি বাবা?

গুরুদয়ালবাবু।—সেই ছেলেটি…গানের মাস্টার শিশির।

সিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুদয়ালবাবুর কথাগুলির মধ্যে না বুঝবার মত আর কোন হেঁয়ালি নেই। কাহিনীটা যেন আর শুধু অলক্ষ্য ক্ষোভ ও অভিমানের জাল বুনে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সংসারের পরীক্ষায় কাহিনীটা আজ নিজের আবেগে কঠিন সমস্যার মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে। সংসারের রূঢ় নিয়মেই এমনি করে সব খাপছাড়াকে একদিন হেস্তনেস্ত করার ডাক এসে পড়ে। গুরুদয়ালবাবু তাই যেন সিতাকে আজ ডেকেছেন।

সিতার কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন না গুরুদয়ালবাবু। পারুলের চিঠিটা প্রখর দিবালোকের মত হঠাৎ সম্মুখের সব আবছায়া সরিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য ও অকর্তব্যের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছে। যে-পথে চলে গিয়ে জীবনে সুখী হবে সিতা, কোন অতিস্নেহের দাবির গ্রন্থি দিয়ে সে-পথের মুখ আর বেঁধে রাখবেন না গুরুদয়ালবাবু।

গুরুদয়ালবাবু বিমর্ষভাবে হাসলেন।—বড় অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম সিতা। কিছুই জানতে পারিনি, অথচ নিজের ইচ্ছেমত আয়োজন করে বসে আছি। নইলে…।

একটা গভীর অনুশোচনার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে গুরুদয়ালবাবুর কথা-গুলি মিলিয়ে যেতে লাগলো।—তোর কোন দোষ নেই সিতা। আমারই জেনে নেওয়া উচিত ছিল। জিজ্ঞেসা করা উচিত ছিল।

সিতা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে গুরুদয়ালবাবুর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। চেয়ারের কাঁধটা ছুঁয়ে চুপ করে নিষ্পলক চোখে গুরুদয়ালবাবুকেই শুধু দেখছিল সিতা। সিতার দু'চোখের দৃষ্টির একেবারে কোলের কাছে যেন গুরুদয়ালবাবুর মাথাটা ঘেসে রয়েছে, কাঁচা-পাকা চুলের স্তবক এলোমেলো হয়ে উড়ছে, প্রবীণ আয়ুর উষ্ণীষের মত। সিতার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠছিল। এত বিজ্ঞ, এত প্রবীণ, এত দামী শালে জড়ানো মূর্তি! কিন্তু কত নিরীহ হয়ে অভিমানী শিশুটীর মত যেন চেয়ারের ওপর বসে রয়েছে।

সিতার বুকের কাছে গুরুদয়ালবাবুর মাথাটি যেন ধীরে ধীরে ভাসছে। ক্ষণিকের এক অনুভবের আবেশ সিতার চোখের দৃষ্টি আরও নিবিড় করে তুলছিল। ক্রোড়-ক্রীড়নক একটি ছোট্ট মানুষের মূর্তি যেন আশ্রয়ের লোভে সিতার বুকের কাছে মাথা গুঁজতে চাইছে।

সিতা ডাকলো।—বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—লুকোচ্ছিস্ কেন? সাম্‌নে এসে ব'স।

সিতা।—তুমি ভুল বুঝেছ বাবা। তুমি যে-আয়োজন করবে, সেই আয়োজন আমি মেনে নেব।

একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের বাতাসে গুরুদয়ালবাবুর মুখে ক্ষীণ হাসির শিখাটা চঞ্চল হয়ে উঠলো।—কী যে বলিস্ সিতা! আমার আয়োজনের কথা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোর জীবনের ব্যাপারে, তুই যে-আয়োজন করবি, আমি তাই আশীর্বাদ করে দেব।

সিতা।—না বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—কেন?

সিতা।—শিশিরকে তুমি চেন না।

গুরুদয়ালবাবু।—তুই যখন চিনেছিস্ তখন আমার আর চেন্‌বার দরকার নেই।

সিতা।—সে বড়লোককে ঘৃণা করে।

গুরুদয়ালবাবু একটু বিমূঢ় অবস্থায় পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তিত থেকে নিয়ে বললেন।—বুঝেছি, আমাকে ঘৃণা করে। তাতে কিছু আসে যায় না। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে।

সিতা।—কিছুই ঠিক হবে না বাবা, সে চিরকাল গানের মাস্টার হয়ে থাক্‌বে। এখানে সে আসবে না।

গুরুদয়ালবাবুর অবিশ্বাস ঠাট্টার সুরে ফুটে উঠলো।—যেদিন বুঝবে যে এটা তারই বাড়ি, আমার নয়, সেদিন সে বোধ হয় আর আসতে দেরি করবে না।

সিতা।—না, সে আসবে না। সে অন্য ধরণের লোক।

গুরুদয়ালবাবু একটা সংশয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।—কোন আদর্শ টাদর্শ আছে নাকি ?

সিতা।—হ্যাঁ, কংগ্রেসের কাজ করে।

গুরুদয়ালবাবু।—করুক্, কিন্তু তার জন্য কি দরিদ্র হয়ে থাক্‌তে হবে ? এরকম কোন নিয়ম আছে না কি ?

সিতা।—আমি জানি না বাবা। বড়লোকের সঙ্গে মিশ্‌লে বা বড়লোক হয়ে গেলে দেশের লোকের সেবার কাজে বাধা আসে, আদর্শ নষ্ট হয়—এই কথা তাঁরা বলেন।

গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।—কী অদ্ভুত আদর্শ সিতা ?

পর মুহূর্তেই বেদনাবিবর্ণ মুখে গুরুদয়ালবাবু বললেন।—থাক্ এসব কথা। তবু তুই যখন শিশিরকে···।

গুরুদয়ালবাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে সিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে নিলেন।—আমার ভুল হচ্ছে না তো সিতা ? সত্যি শিশিরকে বন্ধু হিসাবে যদি তুই সবচেয়ে বেশী···। অর্থাৎ, যার মানে, যাকে জীবনসঙ্গী পেলে তুই সবচেয়ে সুখী হ'ত পারতিস্···।

সিতা।—হ্যাঁ বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—শুনে সুখী হলাম সিতা। আর আমার কোন সংশয় নেই।

হঠাৎ ভয় পেয়ে যেন নিজের মনে বিড়-বিড় করতে লাগলেন গুরুদয়ালবাবু।—হ্যাঁ, ঠিক কথা। বড় বড় বাড়িতেই সুখ থাকে না। যদি সুখী হোস্, তবে গানের মাস্টারের ঘরই ভাল। যেখানে সুখ, সেখানেই ঘর। নিশ্চয়। আমি বাধা দেব কেন ? কোন দিন বাধা দিইনি···।

গুরুদয়ালবাবু নিজ মুখে সিতাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু

এই আশ্বাস যেন সিতার মনের ভেতর চিরদিনের আলোকে পুষ্ট যত প্রত্যয়ের ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের বুদ্‌বুদের মত ছড়িয়ে পড়লো। এই নির্বাধ মুক্তির সঙ্গে এক প্রচণ্ড অসহায়তাও যেন নির্বাধ হয়ে উঠেছে। গুরুদয়ালবাবুর অন্ধ বাৎসল্যের দাবি আর সিতার জীবনের পথে কোন আজ্ঞা ইঙ্গিত উপরোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

—শুধু জয়ন্তর কাছে আমি একটু ছোট হয়ে গেলাম সিতা।

গুরুদয়ালবাবু গলার স্বরে আবার সিতার শিথিল চেতনা সতর্ক হয়ে উঠলো। কথাগুলির মধ্যে সজীব উৎসাহ টেনে নিয়ে সিতা বললো—না বাবা, তোমাকে কারও কাছে ছোট হতে হবে না। তোমার কোন আয়োজন উল্টে দিতে হবে না। তুমি যা ভাল মনে কর, আমার কাছে তাছাড়া আর কোন ভাল নেই। নিজের ভাল ভাবতে আমি শিখিনি বাবা।

তবু গুরুদয়ালবাবু বোধ হয় ভুল বুঝলেন। সন্ত্রস্তের প্রার্থনার মত সিতার ঐ কথাগুলির আবেদন যেন তিনি শুনতে পেলেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্লভাবে গুরুদয়ালবাবু সিতার সব অভিমানকে যেন দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন।—না, না, কিছু ভাবিস্ না সিতা। শিশির ছেলেটি বেশ। খুব ভাল ছেলে। আমার ভুলে যদি অন্যরকম কোন ব্যাপার ঘটে যেত, বড় অন্যায় হতো সিতা। তাছাড়া তোর পক্ষেও···বড় অপমানের কথা হতো। যাক্, এখন ভালয় ভালয়·।

গুরুদয়ালবাবুর আচরণ সিতাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুলছিল। জীবনে আজ যেন প্রথম গুরুদয়ালবাবুকে চিনতে পারলো সিতা। এক দিন যে-বাৎসল্যের নিষ্ঠুরতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে মনে মনে আত্মত্যাগের গর্বে সান্ত্বনা খুঁজেছিল সিতা, সে-গর্ব চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আজ। জয়ন্তর

কাছে ছোট হয়ে যেতে, শিশিরের মত দাম্ভিককে ভালছেলে বলে প্রশংসা করতে, ডোভার লেনের প্রাসাদের আদরিণী হরিণীকে গানের মাস্টারের ঘরনী করে দিতে—এত বিষের জ্বালা সহ্য করে তবু আনন্দে হাসছেন গুরুদয়ালবাবু।' কিসের জন্য ?

সিতার মনের প্রশ্নটিকে উত্তর দিয়েই যেন গুরুদয়ালবাবু বললেন। —তুই সুখী হলেই আমি সুখী। এর ওপর আবার ভাববার কি আছে ?

সিতা।—কিন্তু, একটা কথা আছে বাবা, যে-কথা…।

গুরুদয়ালবাবু ব্যস্তভাবে আপত্তি করে উঠলেন।—আরে না, বোকা মেয়ে। আমাকে তোয়াজ করতে হবে না। আমি কারও ওপর রাগ করি না। কিছু ভাবিস না সিতা। তুই যা ভাল বুঝেছিস, তাই করবি।

আকাঙ্ক্ষিত ভাগ্যের দিকেই গুরুদয়ালবাবু খুশী মনে সিতাকে যেন হাত ধার পৌঁছে দিচ্ছেন। সিতা তবু দ্বিধায় পিছিয়ে পড়ছে। একের পর এক, এক-একটি প্রতিবাদের যুক্তি খুঁজছে সিতা। দুর্বোধ্য একটা আশঙ্কায় অস্থিরতায় আর অশোভন কাতরতায় যুক্তিগুলি নিছক অজুহাতের মত নির্লজ্জ হয়ে উঠছে। এত উদার মহৎ প্রসন্ন ও স্নেহপ্রবণ গুরুদয়ালবাবু, এতখানি আত্মত্যাগের বিনিময়ে, কোন জোর দাবি ভর্ৎসনার বালাই না রেখে, সিতার ভালবাসার সাধনাকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। কিন্তু সিতার আচরণ যেন ক্রমেই বিসদৃশ কুণ্ঠায় কুশ্রী হয়ে উঠছে। এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজছে সিতা। গুরুদয়ালবাবু যেন বলছেন —তোমাকে ডুবতেই হবে। সিতা ডুবতে চায় না।

গুরুদয়ালবাবুর খুশীর উচ্ছ্বাসকে কোন প্রতিযুক্তি দিয়ে আর আটক করে রাখতে পারছিল না সিতা। তাঁর আদরের মেয়েকে জীবনের অভিলষিত পথে যাত্রা করার ছাড়পত্র তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো সিতা। একটা অভিমানী চিন্তা যেন মুখভার করে বার বার সিতাকে বিব্রত করে তুলছিল।—এত সহজে তুমি আমায় মুক্তি দিয়ে দিলে বাবা! একটুও ভাবলে না, একটুও বাধলো না। কিন্তু বিশ্বাস হয় না বাবা, তোমার কাছে বাইশ বছর ধরে পাওয়া এই অফুরান অন্ধ-স্নেহ, এ-কি সবই মিথ্যা? না, তুমি নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলেছ। আজ তুমি যে এত খুশি হয়ে উঠছো, এটাই মিথ্যা। তুমি তো ছাড়পত্র দিয়ে দিলে, কিন্তু একবার ভাবলে না, কী দুর্গম পথে তুমি আমায় ছেড়ে দিতে চাইছ। আমার কাছে দুর্গম না হোক্ তোমার জীবনের কামনার কাছে এপথ অগম্য অস্পৃশ্য ও অবাস্তব। তোমার মেয়ে গানের মাস্টারের বউ হয়ে যাবে, তুমি কোন্ মনে এই বিসর্জন মেনে নিতে পারছো? তোমার ভালবাসার বন্ধন এতদিন নিষ্ঠুরভাবে আমার পথ বেঁধে রেখেছিল, তাও ভাল ছিল। কিন্তু আজ আর তুমি নিষ্ঠুর নও, তুমি সরে গেছ। সেই সঙ্গে তোমার হৃদয়টিও বোধ হয় সরে গেছে। আজ তুমি শুধু নির্বোধ।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে সিতার অসংবৃত চিন্তাগুলি আচম্কা ভয়ে ও লজ্জায় সতর্ক হয়ে উঠলো। ঘরে ঢুকলো জয়ন্ত।

হাসছিল জয়ন্ত।—আমি অনেকক্ষণ এসেছি সিতা।

বিষণ্ণভাবে হেসে সিতা বললো।—এসে আবার ফিরে গিয়েছিলে বোধ হয়।

জয়ন্ত।—না, তোমার বাবার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম।

পর মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো সিতা। সিতার মনের কৌতূহলগুলি একটিমাত্র প্রশ্নকে ঘিরে যেন ধ্যানস্থ হয়ে উঠছিল। সিতাকে নীরব দেখে জয়ন্ত শান্তভাবে বললো।—গুরুদয়ালবাবু বড় কোমল প্রকৃতির মানুষ।

সিতা একজোড়া নিষ্পলক শুষ্ক-দৃষ্টি তুলে তাকালো, যেন মনে মনে উত্তর দিল।—মিথ্যা কথা।

জয়ন্ত।—গুরুদয়ালবাবু তোমাকে এত বেশী ভালবাসেন যে…।

সিতা চোখ নামিয়ে নিল। মনের ভেতর একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান প্রতিবাদ করে উঠলো।—না, মোটেই সত্য নয়।

জয়ন্ত।—গুরুদয়ালবাবু আজ আমার কাছে মাপ চাইলেন সিতা।

হাত বাড়িয়ে আয়নাটার হুক থেকে একটা রুমাল তুলে নিল সিতা। মনের ভেতর একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উত্তর দিয়ে গেল।—সেটা তাঁর কৃতকর্মের ফল, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত।

জয়ন্ত।—আমিও মাপ চেয়ে নিয়েছি তাঁর কাছে।

জয়ন্তর শান্ত কথাগুলি শেষ দিকে যেন একটা আবেগে টলমল করে উঠলো।

এতক্ষণে সিতা বললো।—তুমি মাপ চাইলে কেন? তোমার মত এত শক্ত বুদ্ধিমান অধ্যবসায়ী উৎসাহী উন্নতিপরায়ণ কাজের মানুষ, হঠাৎ মাপ চেয়ে বসলে কেন?

জয়ন্ত।—ভুল করলে মাপ চাইতে হয়।

সিতা—কার ভুল?

জয়ন্ত।—আমার।

সিতা।—তোমারও ভুল হয়।

সিতার ব্যগ্র প্রশ্নগুলির পেছনে একটা বিদ্রূপের জ্বালা ঝল্‌সে ওঠার চেষ্টা করছিল। তেমনি গভীর নিস্পৃহায় শান্ত হয়ে জয়ন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিল।—ভয়ানক ভুল হয়।

সিতা হাসলো।—বিশ্বাস করতে পারলাম না জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—তোমার বাবা কিন্তু আমায় বিশ্বাস করেছেন।

সিতা।—কি বিশ্বাস করেছেন ?

জয়ন্ত।—তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, আমি শুধু তাঁর কারবারের অংশীদার। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমি তাঁর মেয়ের জীবনের পথে ওৎ পেতে বসে নেই। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর মেয়ে আমাকে শুধু ভয় করে।

সিতার উত্তেজিত মনের ওপর হঠাৎ একটু কোমলতার ছায়া পড়ে তার প্রশ্নটাকেও বিষণ্ণ করে তুললো, অনুযোগের মত শোনালো। —এসব কথা তুমি তাঁকে কেন বলতে গেলে জয়ন্ত ?

জয়ন্ত।—তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন তাই বলেছি।

সিতা।—কি জিজ্ঞাসা করলেন ?

জয়ন্ত।—শিশিরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে, আমি খুশী হব কি না ?

সিতা।—কিন্তু তুমি······ ।

জয়ন্ত।—হ্যাঁ, আমি খুশী। গুরুদয়ালবাবু বিশ্বাস করেছেন, এবং খুশী হয়েছেন।

রুমালটা কপালের ওপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে, নিশ্বাস সংযত করে, একটা অস্পষ্ট শঙ্কার দিকে তাকিয়ে যেন সিতা নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ নিঃশব্দতার পর সিতা জোর করে তার মনের বিচ্ছিন্ন ভাষাগুলিকে কোনক্রমে গুছিয়ে উত্তর দিল।—কিন্তু······কিন্তু তুমি তো খুশী হতে পার না জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—না সিতা। শুনে আমি খুশীই হয়েছি, এটাই হওয়া উচিত ছিল।

সিতা।—এ কি তুমি সত্যি সত্যি বলছো জয়ন্ত ?

জয়ন্ত।—হ্যাঁ।

সিতা।—তাহলে তোমাকে এতদিন ভুল বুঝে এসেছি ?

জয়ন্ত।—না, তুমি আমাকে ঠিকই চিনেছিলে, শুধু নিজেকে চিন্‌তে পারনি।

সিতা।—জয়ন্ত……।

জয়ন্তর চোখেমুখে একটা হাসিমাখা উৎসাহের আভা ছড়িয়ে পড়ছিল। —এখনো নিজেকে চিন্‌তে পেরেছ কি না সন্দেহ।

সিতা।—নিজেকে চিনতে পেরেছি জয়ন্ত। দোহাই তোমার, তুমি এত স্পষ্ট করে কথাগুলি আর বলো না। কি ছিলে আর হয়ে গেছ তুমি!

জয়ন্ত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসেছিল। সিতা বললো।—বাবা আর জাগৃতি সংঘ তোমাকে যতই শক্ত মানুষ বলে প্রশংসা করুক্, আমি তোমাকে কোনদিন তা মনে করিনি। তবু তুমি এত কঠিন হয়ে বদ্‌লে গেলে কি করে জয়ন্ত? তুমি……।

জয়ন্ত।—এসব কথা থাক্ সিতা।

সিতা।—তোমাকে কি এতদিন শুধু……।

জয়ন্ত।—ভালবাসতে অনেক চেষ্টা করেছ, কিন্তু ভালবাসতে তো পারনি।

সিতা হেঁটমুখ হয়ে, যেন মাথা পেতে, এই সত্যকে ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে নিল।

হঠাৎ মুখ তুলে সিতা একটু জোর গলায় যেন একটা কৈফিয়ৎ তলব করে বসলো।—তুমি ভেবেছ যে আমি শিশিরকে……

জয়ন্ত।—না, আমি বিশ্বাস করি না যে শিশিরকে তুমি ভালবাস।

সিতা অপ্রস্তুত ভয়ে ভয়ে বললো।—তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

জয়ন্ত।—তুমি শুধু নিজেকে ভালবাস সিতা।

সিতার কোন উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে জয়ন্ত ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জয়ন্তর মন্তব্যগুলি সহ্য করা সিতার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। যেন মুক্তপুরুষের মত যত মোহ ভ্রান্তি চাঞ্চল্য ও কামনার ওপারে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত আজ বড় বড় সত্য কথা বল্‌ছে। কোথাও এতটুকু ব্যথার সংকোচ নেই, একটু হিংসার খোঁচা নেই, ক্ষতির আপসোস নেই। এক বৈরাগীর ঔদার্য নিয়ে বড় বড় উপদেশ বিতরণ করে চলে গেল।

তবু সিতা যেন ইচ্ছে করেই জয়ন্তকে আজ বুঝতে চাইছিল না। চিরকালের আত্মাভিমানিনী সমুক্তিকা সিতা আজ জয়ন্তের প্রশ্ন ও মন্তব্যগুলিকে মুখের ওপর উত্তর দিয়ে জব্দ করতে পারছে না। জয়ন্ত সরে যেতে চাইছে, কিন্তু সিতা বোধ হয় সরিয়ে দিতে চায় না। তাই কঠোর এক একটা প্রত্যুত্তর মনের ভেতর আস্ফালন করে উঠলেও, ভাষায় মুখর হয়ে উঠতে পারছিল না। জয়ন্ত যেন সন্তপ্ত বালুকা-বেলার মত, সেখানে দাঁড়িয়ে শুধু দুঃসহ দাহে ছটফট্ করতে হয়। তবু তো দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু তার পরেই যে অতল জলের আবর্ত। একবার ডুবলে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। শিশিরের ভালবাসা তাকে শুধু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য যেন ডাকছে। সমস্ত ঘটনাগুলি একে একে পথ কেটে তার জীবনের পরিণামকে সেই ভয়ংকর প্রপাতের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। সবাই মুক্ত করে দিতে চায় সিতাকে। গুরুদয়ালবাবু ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন—আশীর্ব্বাদ করেছেন। জয়ন্ত শুভেচ্ছা জানাচ্ছে—সে খুশী হয়েছে। ডোভার লেনের এত বড় বিরাট বাড়িটার হৃদয়ে কোথাও একটু দীর্ঘশ্বাসের শব্দও

আর অবশিষ্ট নেই। সিতাকে মুক্ত করে দিয়ে সবাই যেন এক মুক্তির তৃপ্তিতে স্থির শূন্য উদার ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেউ জানলো না, সব মুক্তির বাণী যে মিথ্যে করে রেখেছে জ্যোৎস্না। কংগ্রেসওয়ালা অবনীবাবুর বোন জ্যোৎস্না। শিশিরের জীবনে দোসর হতে গিয়ে, অপঘাত মৃত্যুর মত এই অপমানকে কি স্বীকার করে নিতে হবে? তাহ'লে সিতা বসু আর রইল কই? এই লাঞ্ছনার যে কেউ জানে না। গুরুদয়ালবাবু জানেন না, জয়ন্ত জানে না। এই একটি বাধা, যে-বাধার সঙ্গে জীবন দিয়ে কোন আপোষ করা যায় না।

এতক্ষণে যেন একটা মনের মত ছুতো খুঁজে পেল সিতা। চারদিক থেকে সুপ্রসারিত মুক্তির ইঙ্গিত এতক্ষণ ধরে একটা আতঙ্কের ঘনঘটা সৃষ্টি করে তুলেছিল। নিজের দুর্বলতাকে এতক্ষণ ক্ষমা করতে পারছিল না সিতা—বোধহয় বুঝতে পারছিল না তাই। শিশিরকে তুমি ভালবাস না—কুৎসিত জয়ন্তর এই জিঘাংসার গর্জনও চুপ করে শুনতে হয়েছে তাকে। শুধু চুপ করে শোনা নয়, অহেতুক একটা আতঙ্কে কথাটা প্রায় মনে মনে মেনে নিতে বসেছিল সিতা।

কিন্তু জয়ন্ত অনেকক্ষণ হয় চলে গেছে, নইলে সিতা একবার তাকে উপযুক্ত উত্তরটা একেবারে স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দিতে পারতো —হোক্ সে গানের মাস্টার, যদি কাউকে ভালবেসে থাকি তবে তাকেই বেসেছি। যদি এতটা বিশ্বাস না কর, তবে শোন—সবচেয়ে তাকেই বেশী ভালবাসি।

এতক্ষণে নিজেকে ক্ষমা করতে পারলো সিতা। তার সকল সংকোচ ভীরুতা ও আতঙ্কের একটা হেতু আবিষ্কার করা গেল। সব আত্ম-দীনতাকে অস্বীকার করতে পারলো সিতা। তার ভুল হয়নি কোথাও।

যদি কারো ভুল হয়ে থাকে, শিশিরের হয়েছে। এই মুক্তিকে মিথ্যে করে দিয়েছে শিশির নিজে।

সে অবুঝ যদি কিছু না বোঝে, কে তাকে বোঝাবে? মানুষটিও যে তার রাগ-মহাদেশের মতই দুর্বোধ্য জটিল আর উদ্‌ভ্রান্ত। একে একে শুধু কতগুলি পরাজয়ের অপমান ছাড়া আর কোন্ উপহার সে এনে দিতে পেরেছে সিতাকে? ছেঁড়া মালার ফুলের মত সিতা আজ তার সত্তাটুকু হারিয়ে ফেলেছে। তাকে ধরে রাখতে কেউ আর দাবি করে না। কন্যাগত প্রাণ গুরুদয়ালবাবুও ত্যাগ স্বীকার করছেন। সিতার এক কণা প্রসন্নদৃষ্টির ভিখারী জয়ন্ত মজুমদারও খুশী মনে সব দাবি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কিন্তু সকল অবহেলাকে চরম করে দিয়েছে স্বয়ং শিশির। নইলে···।

তবু আজ মনে মনে শিশিরের সব ভুল মাপ করে দেয় সিতা। প্রতি মুহূর্তের ধ্যানে চিত্ত ভরে ধরে রাখার মত তার জীবনের একটি মাত্র পুরুষ শিশির। সব দিকে তার কাছে হার মানতে রাজি ছিল সিতা, হার মেনে যদি তাকে আপন করা যেত, যদি তাকে একা পাওয়া যেত—যদি জয় করা যেত।

সিতার ভাবনার প্রবাহ ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে আসে। সব অস্বস্তি বিরক্তি আশঙ্কা ও অমর্যাদার জ্বালা একে একে থিতিয়ে পড়ে। এই শান্ত স্থৈর্যের মধ্যে একটি শুধু ভাবনা দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—শিশিরের ভালবাসা। আত্মীয় স্বজন শ্রেণী গোত্র গৃহ সম্পদ—তার চিরদিনের কক্ষ থেকে ছিন্ন করে শিশিরের ভালবাসা তাকে লুঠ করে এক ছন্নছাড়া পৃথিবীতে নিয়ে চলে যেতে চায়। সিতারও প্রায় চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন? শিশিরের চেয়ে গুণী পুরুষ কি আর কেউ ছিল না?

ঐ রকম স্বপ্ন দিয়ে ছাওয়া অদ্ভুত দুটি ভুরু কি আর কাউকে সুন্দর করে রাখেনি? তবু কেন জানি মনে হয়, জীবনের পথে এর চেয়ে সুন্দরতর সাথী বোধ হয় আর কেউ হতে পারে না। তার হাত ধরে পাশে পাশে চলা—ক্ষণিকের জন্য জীবনের কটি মুহূর্তের আস্বাদ যেন বদলে যায়। শত অহংকারে সে যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সিতার সামান্য জ্বর হয়েছে, খবর শুনে ঐ অহংকারের চোখও একদিন ছলছল করে উঠেছিল। সব কথা মনে পড়ে সিতার। ভরানদীর জলের মত সিতার ভালবাসার লোভে ঐ উদ্ধত অহংকার এক পরম তৃষ্ণার বেদনায় ছায়া হয়ে নুয়ে পড়বে, সিতা বসু জীবনে প্রথম সত্য হয়ে উঠবে। কী বিশ্বাসে এতদিন স্বপ্ন দেখছিল সিতা! সেই বিশ্বাসের পৃথিবী মুছে গেছে আজ।

সিতা আজও বিশ্বাস করলো, তার নিজের হৃদয়ের প্রতিশ্রুতি কোন দিন শিথিল হয়নি। তার অন্তর জানে, সে কোন অপরাধ করেনি। শিশিরের জীবনে নতুন জ্যোৎস্নার উদয় হয়েছে। সিতার কাছে তাই সম্মুখের পথ এত অন্ধকারে ভরা—এত স্তব্ধ ও অবরুদ্ধ।

শিশিরের সব ভুল ক্ষমা করতে গিয়ে—সিতা নিজেকেও ক্ষমা করে দেয়। সারাদিনের ভাবনার অভিযানের শেষে হঠাৎ জ্যোৎস্না নামে এক অপরিচিতার মূর্তি যেন সিতার মুক্তির আতঙ্ক শান্ত করে দিল।

সিতা প্রস্তুত হয়ে নিল। গুরুদয়ালবাবুর সব নির্বোধ ব্যস্ততাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। নির্লজ্জ হয়ে, নিজের মুখে তার চরম পরাজয়ের কাহিনী শুনিয়ে দিতে হবে কন্যাবৎসল গুরুদয়ালবাবুকে। তিনি স্বকর্ণে শুনবেন, তাঁর গর্বের দুলালী রত্নোপমা মেয়ের বিফল তপস্যার কাহিনী। তিনি তো বিশ্বাস করে আছেন যে, তাঁর মেয়ের ভালবাসা চন্দ্রসূর্যের হৃদয় জয় করতে পারে। আজ তিনি শুনবেন—নিতান্ত এক গানের মাস্টারের ঘরের হৃদয়ে ততোধিক তুচ্ছ এক কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের বোন সগৌরবে

জয়িনী হয়ে বসে আছে। ডোভার লেনের সোনার হরিণী সিতা সেখান থেকে শুধু পরাজয়ের লাঞ্ছনা নিয়ে ফিরে এসেছে। পারুলদির চিঠি পড়ে একবার চেয়ারের ওপর মুষড়ে বসে পড়েছিলেন, আর একবার তেমনি অসাড় হয়ে বসে পড়তে হবে তাঁকে। জয়ন্তও শুনবে। শুনুক্।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। জানালার পর্দাটা সরিয়ে একবার পথের দিকে তাকালো সিতা। গুরুদয়ালবাবু হয়তো এখুনি বেড়াতে যাবার জন্য ডাকবেন। ড্রাইভার গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করছে। সিতা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এখনো স্নান করা হয়নি, সাজ সারা হয়নি।

তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালো সিতা। বয় ব্যস্তভাবে গুরুদয়ালবাবুর জন্য চা নিয়ে যাচ্ছে, বারান্দার সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে। আর সময় নেই। নিত্যদিনের মত গুরুদয়ালবাবু বেড়াতে বার হবেন, সিতাকে ডাকবেন। এতক্ষণ মিছামিছি কুঁড়েমি করে সময় নষ্ট করেছে সিতা। কোনরকমে আলগোছে একটু প্রসাধন সেরে নিয়ে, সাজ বদল করে তৈরী হয়ে নিল সিতা। যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ গুরুদয়ালবাবু! একবার ডেকে ফেললে শুধু পরিত্রাহি ডাকতে থাকবেন। হয়তো এই অহেতুক বিলম্বের জন্য অনুযোগ করে বসবেন। সে কৈফিয়তের লজ্জা এড়িয়ে যাবার জন্যই যেন সিতা তাড়াতাড়িতে একটা ছেঁড়া পশমী স্কার্ফ হাতে তুলে প্রস্তুত হলো। বাছাবাছি করারও আর সময় ছিল না।

সেইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে সিতা শুনলো, গুরুদয়ালবাবু ডাকছেন। কিন্তু সিতাকে নয়।

—জয়ন্ত এসেছো! গুরুদয়ালবাবু ধীরে ধীরে ডাকছেন। ড্রইং রুম থেকে উত্তর এল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটা হিমাক্ত শীতলতা সিতার সমস্ত স্নায়ুজাল আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। আড়ষ্ট মূর্তিটা শুধু জোর করে সজীব হয়ে দুকান দিয়ে গুরুদয়ালবাবুর সেই স্নেহাপ্লুত আহ্বানের স্বর শুনছিল—জয়ন্ত এসেছো।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এইরকম একটি বাৎসল্যললিত স্বর সিতাকে বেড়াতে যাবার আগে ডাক দিয়ে এসেছে। আজও গুরুদয়ালবাবু ডাকছেন। তবে সিতাকে নয়, তাঁরই কারবারের অর্ধ-অংশীদার জয়ন্ত মজুমদারকে। গুরুদয়ালবাবুর কারবারী হিসাবটা যেন আজ অঙ্কের সংকীর্ণতা পরিহার করে নতুন এক অপত্যে উদার হয়ে উঠেছে। যেন নিজের ছেলেকে আদরের স্বরে ডাকছেন গুরুদয়ালবাবু—জয়ন্ত এসেছো!

গাড়িটা স্টার্ট নিল, দারোয়ান ফটক খুলে দিল, গাড়িটা সশব্দে চলে গেল। জয়ন্তকে সঙ্গে করে বেড়াতে চলে গেলেন গুরুদয়ালবাবু। জড় মূর্তির মত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু কান দুটোকে কোনক্রমে অসহ কৌতূহলে সজীব রেখে, একে একে প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেল সিতা।

অনেকদিন পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বালিগঞ্জ প্লেসের বাসার ছোট বারান্দাটা একটি বাঞ্ছিত পদক্ষেপের শব্দে সাড়া দিয়ে উঠলো। শিশির ডাকলো—বিপিন!

শিশিরের গলার স্বরে ঘরের ভেতর সবগুলি আলোর বাল্‌ব্‌ যেন বহুদিনের অবহেলার কুণ্ঠা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে প্রখর পুলকে জেগে উঠলো। দুবার হোঁচট খেয়ে, একবার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, দুর্দম্য আনন্দে অস্থির হয়ে দৌড়ে এল বিপিন।

ঘরের ভেতর থেকে সোজা দৌড়ে এসে শিশিরের সামনে দাঁড়ালো বিপিন। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিজের মনের দুরন্ত আনন্দের আবেগগুলির

মধ্যে যেন কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেতে লাগলো। তার পরেই শিশিরের হাত দুটো দুহাতে নিবিড়ভাবে চেপে আস্তে আস্তে বললো।—এসেছ!

শিশির একটু বিস্মিতভাবেই বিপিনকে দেখছিল। দণ্ডবৎ করতে ভুলে গেছে বিপিন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার দুঃখ ও উৎকণ্ঠা তার ভৃত্য- ধর্মকে ক্ষণিকের জন্য ভুল করে দিয়েছে। একটি ব্যথিত বান্ধবের হৃদয় নিয়ে বিপিন শিশিরের হাত দুটো তেমনি তৃপ্তিভরা আবেগে ধরে রইল।

শিশির বললো।—হ্যাঁ, চলে এলাম বিপিন, বর্ধমান হাসপাতাল থেকে কাল ছাড়া পেয়েছি।

বিপিন কিছুক্ষণ কৌতূহলী হয়ে শিশিরের মুখের চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর একটু রাগের সুরে বলে ফেললো।—এ কি চেহারা করেছ! দুটো অক্ষর লিখে একটা চিঠি ছেড়ে দিলে আমি কি হেথায় চুপ করে বসে থাকতাম? আর তুমিই বা হোথায় একা একা অসুখে আপদে পড়ে থাকতে?

বিপিনের ভাষার মধ্যে হঠাৎ এই তুমিত্বের প্রসার শিশিরের সব চেয়ে বেশি মজার লাগছিল। বিপিনই স্বয়ং যেন গৃহস্বামীর মত এক প্রিয় অতিথিকে সাগ্রহে সংবর্ধনা ক'রে ঘরে ঠাঁই দিতে এগিয়ে এসেছে। শিশিরের হঠাৎ মনে হয়—তবে কি বিপিন ঘর ফিরে পেয়েছে? হতে পারে।

গেঁয়ো বাঙালী চাষীর ছেলে বিপিন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আধপেটা খেয়ে সুখে থাকাই ওর রক্তের ধর্ম। ভিক্ষে করতে জানে না, অপরাধ করতে বুক কাঁপে, শুধু অমিত সহের পৌরুষে সারা দেশের কাপুরুষতার কলঙ্ককে ওরা কোনমতে ঢেকে রাখে। এক আত্মীয়তাহীন জাতির কোলে জন্ম নিয়েও সে-দুর্ভাগ্যকে ওরা ক্ষমা করে দেয়। দেশের মাটির প্রাণটুকু ওদেরই হাতের আলবাঁধা ক্ষেতে ও মাঠে যুগ

যুগ ধরে সবুজ হয়ে ফুটে আছে। যত দেশী বিত্তলম্পট আর বিদেশী শাসকের ব্যভিচারী আম্‌লার সুখের প্রদীপে ঘি যোগাতে গিয়ে ওরা নিজেরাই সারা হয়ে যায়। মাত্র কটি মাস উচ্ছন্ন বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে এই অবিধির অবাধ লীলা দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে শিশির। ইতিহাসের নিয়মে কি করে এত বড় একটা অনর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে, ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পায়নি শিশির। এত মহৎ ত্যাগের শক্তিও ওদের আজ আজ আর বাঁচাতে পারলো না। যুদ্ধের অছিলায় সেই যুগব্যাপী পাপের ষড়যন্ত্রটা যেন একেবারে নির্লজ্জ হয়ে উঠলো। মরলো তারাই, যারা এতদিন নিজেরা মরিয়া হয়ে সবাইকে বাঁচিয়ে এসেছে। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে, সারা দেশে লুটতরাজ চুরি দাঙ্গার সংখ্যা নাকি এই বছরেই সব চেয়ে কম। এতই ধীর স্থির সংযত মনুষ্যত্ব! অন্নাভাবে শুধু এরা ভিখিরী হয়ে পড়ে, কেড়ে খেতে জানে না। এই মুমূর্ষু মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার মত একটিমাত্র মন্ত্র ছিল—কেড়ে খেতে শেখাবার মন্ত্র। অভাগাদের হাতে মার না খেলে কখনো ইতিহাসের কোন অনাচার স্তব্ধ হয়নি। আজও হবার নয়…।

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো শিশির। চাষাভুষোর ভাল মন্দ নিয়ে এই প্রগল্‌ভ সমবেদনার আজ আর কোন সার্থকতা নেই। চিন্তাগুলি যেন এক বিস্মৃতির ফাঁকে নেহাৎ ভুল করে অনধিকার চর্চা করে চলেছে। কিন্তু আর নয়, আর দ্বিতীয়বার ভুল করতে চায় না শিশির। এই ভুলেরই ভয়ানক ধাঁধাঁ থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছে শিশির। এ খবর কেউ জানেনা।

বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশিরের ক্লান্ত মস্তিষ্কে পরক্ষণেই একটা বিরুদ্ধ চিন্তা ছটফট্ করে উঠলো।—এই যে সামনে দাঁড়িয়ে

রয়েছে, এই সুস্থ সবল জোয়ান চাষীর ছেলে, পেটের দায়ে চাকর হতে এসেছে, এই মূর্খগুলির ঘর বাঁধবার শক্তি নেই, তবু এরা কেন এত গৃহসুখকাতর ?

যেন আত্মধিক্কারের একটা গ্লানিকে বিপিনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করছিল শিশির। কেমন বিমর্ষ বিষণ্ণ ও অবসন্ন হয়ে ফিরে এসেছে শিশির। বর্ধমান হাসপাতালের রোগশয্যায় পনের দিন ধরে ছটফট করে যেন চুপে চুপে চলে এসেছে সে। তার কর্ম-জীবনের সব গর্ব কিসের একটা অভিমানের সংকোচে লজ্জিত হয়ে একটা ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

শিশিরের অবান্তর চিন্তার উত্তেজনা হঠাৎ ছোট একটা ঘটনার আবির্ভাবে শান্ত হয়ে গেল। বিপিনের পেছনে একটি অবগুণ্ঠিতা পল্লী-নারীর মূর্তি সসংকোচে এসে দাঁড়ালো। বিপিন এক পাশে সরে গেল শিশিরের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো টুনার মা।

শিশিরের বিস্ময় একটা রূঢ় আনন্দধ্বনির মধ্যে বেজে উঠলো।—এ কি বিপিন ? টুনার মা সত্যিই এসেছে ? কবে এসেছে ? টুনা কই ?

বিপিন।—টুনা আর এল না বাবু!

বিপিন আর বিপিনের বউয়ের চাপা কান্নার অর্থটা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই শিশির ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরের ভেতর চুপ করে বসে স্বস্তি পাচ্ছিল না শিশির। চারদিকে যেন কতগুলি ব্যর্থতার ছায়া লুকিয়ে রয়েছে। বাজনাগুলির দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়—এক গাদা বিফলতার আবর্জনা। তবু টুনার কথা থেকে থেকে মনে পড়ে। টুনাকে জীবনে কখনো চোখে দেখেনি শিশির। তবু শিশিরের শোকার্ত কল্পনার কোণে, টোকো মাথায় পাচনবাড়ি হাতে একটি ন্যাংটো চাষী-শিশুর বিচিত্র মূর্তি দেখা দেয়।

টুনার মতই তারও সকল কাজের সাধ যেন অকালে মরে গিয়েছে। ব্যর্থ হয়ে, ভয় পেয়ে, ব্রতভঙ্গ করে, বিশ্বাস হারিয়ে অপরাধীর মত ফিরে এসেছে শিশির।

বিপিন যেন সত্যিই অতিথিসৎকার করছে। কাজের উৎসাহে চীৎকার করে, টুনার মাকে দুবার ধমক দিয়ে, শিশিরকে হাত-পা ধোয়ার জন্য জল দিয়ে বাজারে চলে গেল বিপিন।

শিশিরের নজরে পড়লো, ঘরের দেয়ালের ব্র্যাকেটে বিপিনের একটি ধুতি ও গামছা ঝোলানো রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা সিঁদূরের কৌটা ও আলতার শিশি।

শিশিরের দৃষ্টিটা ক্রমেই অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণতায় যেন হিংস্র হয়ে উঠছিল। বিপিনের বৌ তখন উনুনে আগুন ধরিয়েছে। ঘরের ভেতর পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া স্বচ্ছন্দে এসে ঢুকছে। বোধ হয় চায়ের জল চড়াবার আয়োজন হচ্ছে। বিপিন নিশ্চয় খাবার আনতেই বাজারে গেছে—অতিথি সংকারের জন্য। আর একটু পরেই ফিরে আস্‌বে। তারপর?

ব্যর্থতায় শতদীর্ণ, ভগ্নোদ্যম মনের ধ্বংসের ওপর, শিশিরের একটা বিষাক্ত সখ ধীরে ধীরে সাপের মত কেৎরে উঠলো—ফিরে আসুক বিপিন। তারপর দুজনকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? চাকর চাকরানীর আর প্রয়োজন নেই তার। এ বাসা হয়তো শীঘ্রই ছাড়তে হবে। বোধ হয় কলকাতা ছেড়েই চলে যেতে হবে। এখানে মুখ দেখাবার আর জায়গা নেই। ফিরে আসুক্ বিপিন।

বাইরের আলো যখন আর ভাল লাগে না, তখন ঘরেতে অন্ধকারই ভাল লাগে। শিশিরের শুধু মনের অবস্থা নয়, মনের ইচ্ছাও এখন কতকটা সেই রকমের। বিপিনের এত সখ্যের উচ্ছ্বাস আর প্রীতির উৎসাহ ভাল লাগছিল না শিশিরের। ঘরের ভেতরে বিদ্যুতের বাল্‌ব্

এত প্রখর আলো ছড়াচ্ছে—শিশিরের অস্বস্তি হচ্ছিল। বিপিনের বৌ প্রণাম করে গেল—সেটা যেন হঠাৎ ভুল করে ভাল লেগে গিয়েছিল শিশিরের। বোধ হয় সেসময় একটু আন্‌মনা হয়ে ছিল, সেই জন্যই। এই আন্‌মনা চিন্তার ফাঁক পেয়েই বোধ হয় 'কল্পনায় টুনার স্মৃতিটা হঠাৎ ক্ষণিক শোকের আবেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল। নইলে শিশিরের আজ আর এসব ভাল লাগার কথা নয়।

সংসারের আশার মর্যাদা আছে, প্রেমে নিষ্ঠার মূল্য আছে, স্নেহে ও প্রীতিতে পর আপন হয়, কামনা ও প্রার্থনা সফল হতে পারে, বিরহ কভু মিলনে মহিম হয়ে উঠতে পারে—এসব সত্যিই কি জীবনের নিয়ম, না ব্যতিক্রম? শিশিরের সন্দেহ হয়। ত্যাগের মধ্যে সত্যিই কোন শক্তি আছে কি? আদর্শ? আদর্শ সফল হবেই একথা কে বলতে পারে? মহৎ হলেই সেটা দুরূহ হবে, এটাই বা কোন্ নিয়ম? দুরূহ আদর্শ ছাড়া কি আদর্শ হয় না? যা সহজ স্বচ্ছন্দ সুমধুর—তাই দিয়ে কি জীবন সাজানো যায় না? একটু অলস রঙিন শান্ত জীবন—হলোই বা? ক্ষতি কি?

বিপিন তখনো বাজার থেকে ফেরেনি। বহুদিন পরে বালিগঞ্জ প্লেসের এই ছোট বাসার ঘরটা আবার এক নিভৃত নীড়ের ভীরুতা ও সোহাগ দিয়ে যেন শিশিরের পলায়ন-ক্লান্ত কর্মীজীবনের সকল শৌখিন সংগ্রামের চপলতাকে ক্ষমা করে ধীরে ধীরে আপন করে নিচ্ছিল। এখানে এইভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে বাইরের সব সত্য যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। মনে হয়, সংসারে ঝড় নেই রোদ নেই। থাকলেও তার কোন সার্থকতা নেই। সেসব বাইরেই থাক। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম—কংগ্রেস অবনী অরুণা—এসব যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর ঝঞ্ঝা। কতগুলি অতি নিষ্ঠুর ছলনা। একটা মোহ।

আমি ও আমার স্বর—বেশ তো সুখে ছিলাম! মনের গহনে একটা ক্ষোভ যেন কাতরভাবে চোখ মেলে বার বার শিশিরকে অনুযোগ করতে থাকে। তবে কেন বহুজনের বিড়ম্বনার বোঝা সখ করে মাথায় বইতে যাওয়া এবং ব্যর্থ হওয়া?

প্রশ্নটা আরো নিবিড় অনুশোচনায় দীর্ণ হয়ে ওঠে। তুমি ও তোমার সিতা—আরও সুখের আলো উঁকি দিয়েছিল তোমার একাঘরের জীবনে। তবে কপাট বন্ধ করে দিলে কেন? সরে পড়লে কেন? এ কোন্ মূঢ়তা তোমার?

বর্ধমান হাসপাতালের রোগশয্যার রাতজাগা আতঙ্কটা আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত চিন্তার ওপর অন্ধকারের গুমোট টেনে আনে। তিনকোপ জীয়ন পুরের এক হাজার নরকঙ্কালের পায়ের শব্দ যেন সেই অন্ধকারে দৌড়দৌড়ি করে বেড়ায়। বোধ হয় তারা পৃথিবীর ঘাট মাঠ চুঁড়ে ফিরছে—শিশিরকে খুঁজছে—আগুন লাগিয়ে দিয়ে যে-লোকটা আল্‌গোছে পালিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ঘটনাটা যে একেবারে সত্য। তিনকোপ থেকে জীয়নপুর যেতে, গ্রামে ঢোকবার আগে, পথের পাশে একটা ভাঙা একচালা ঘরের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়েছিল শিশির। চালাঘরের পেছন দিকে একটা কাঁঠালীচাঁপার গাছ। পাশে আরও দু'তিনটে ছোট ছোট ঘরের শুধু ভিটের চিহ্ন দেখা যায়। ঘরের চারদিকে কতগুলি ছিন্ন সংবাদপত্রের টুকরো কাদামাটির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে আছে। একটা কাঠের ভাঙা সাইনবোর্ড সামনের আঙিনায় ঘাসের ওপর পড়ে আছে—বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে লেখাগুলি।

আগন্তুক শিশিরের পাশে এক একটি করে পথচারী গাঁয়ের লোক আরও বেশী কৌতূহলী হয়ে এসে দাঁড়ালো।—কি দেখছেন বাবু? ওটা কংগ্রেস আপিস ছিল।

এই কথাটাই শোনবার জন্য যেন শিশিরের সমস্ত হৃদয় উৎকর্ণ হয়েছিল। শোনামাত্র অদ্ভুত এক পুলকের রোমাঞ্চ তার গা-ভরা জ্বরের জ্বালাকে স্নিগ্ধ প্রলেপের মত জুড়িয়ে দিল কিছুক্ষণের জন্য। যেন এক পুরাতন যুদ্ধক্ষেত্রের পুণ্য মাটির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে সে। পরিত্যক্ত কংগ্রেস আপিসটা এক বিধ্বস্ত শিবিরের গৌরব নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

শিশির বললো।—আপিসটাকে সারিয়ে তুলতে হবে ভাই, এই কাজের জন্যই আমি এসেছি। এস সবাই—সাহায্য কর।

সে-রাত্রে সত্যিই কাঁঠালীচাঁপার তলায় একটি তক্‌তকে খড়ো একচালার ভেতর নতুন একটি প্রদীপ জ্বলে উঠলো। কংগ্রেস আপিসের জীর্ণদেহটা নতুন বাঁশ খুঁটি আর মাটির সাজ পরে আবার এক প্রাণপূর্ণ নিকেতনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল।

পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার ক্ষুধার্তের সভা হয়ে গেল—সত্যাগ্রহ হবে। সেই দুর্দ্ধর উৎসাহ আর কোন ভ্রম সংশয় সংকটের বাধা মানছিল না। তারা শুধু তাকিয়ে দেখছিল—কাঁঠালীচাঁপার তলায় নতুন কংগ্রেস আপিস—যেন নতুন এক যজ্ঞের শিখা জ্বলছে। তারা দেখছিল শিশিরকে—দেবতার দূত আবার ফিরে এসেছে।

পরের দিন দুপুর হতে না হতে জীয়নপুরের চালের গোলার চারদিকে ক্ষুধার্তের দল ধর্না দিয়ে ঘিরে রইল। চাল না পেলে তারা নড়বে না। দূরে দাঁড়িয়ে জীয়নপুরের থানাটা শুধু এ-দৃশ্য দেখলো আর মনে মনে হাসলো।

গোলাদারের চাকরেরা বস্তা বস্তা শুক্‌নো লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া ছড়াতে লাগলো চারদিকে। পিচকারিতে গরম জল ভরে নিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো। কতকগুলি কুকুর অবিশ্রান্ত চীৎকার করে এই অপার্থিব দৃশ্যের বীভৎসতাকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ক্ষুধার্তেরা যেন এক উৎকট ধর্না দেওয়ার সুখে বোধশক্তিহীন হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে রইল।

শিশির বোধ হয় জানতো না যে গোলাদারের লেঠেলরা পেট ভরে খেতে পায়—তাঁদের লাঠির জোর আছে। বিকাল হতে না হতে ক্ষুধার্তদের সত্যাগ্রহের হর্ষ আর্ত চীৎকারে বেজে উঠলো। তখন সূর্য ডুবছিল। কাঁঠালীচাঁপার তলায় দাঁড়িয়ে শিশির শুনলো, সেই আর্ত চীৎকারটা প্রহত ঝড়ের মত দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে যেন ছুটে আসছে। তার পরেই দেখলো—তারা দৌড়ে আসছে। ক্ষুধাজীর্ণ কতগুলি চলমান কঙ্কাল শোণিতস্নান সেরে যেন দৌড়ে আসছে—মাথা ফাটা, নাক ফাটা, কান ফাটা। গোলাদারের লেঠেলরা ফাটিয়ে দিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে জীয়নপুরের থানা শুধু চুপ করে এ-দৃশ্য দেখেছে, টাটকা ঘুসের নতুন নোট গুনেছে, খৈনি টিপেছে আর বিড়ি ফুঁকেছে।

প্রথম হতভম্বতা ভাল করে ভাঙতে না ভাঙতেই শিশির শুনলো—লাঠি লাঠি লাঠি। শিশিরকে ঘিরে তারা চীৎকার করছিল।—এত মার সহ্য করবো না বাবু। আমাদিগের কি লাঠি নাই? চলুন বাবু, দেখে নেব আজ, কত চিঁড়া খেয়েছে লেঠেলরা।

লাঠি লাঠি লাঠি—তারা লাঠি খুঁজছিল, শিশিরকে ডাকছিল। বাঁশের ঝাড়গুলি পট্ পট্ শব্দে উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। এক একটা ক্রুদ্ধ জনতা চীৎকার করে বাঁশঝাড় ছিঁড়ে লাঠি তৈরি করছিল। একটা ছেলে দৌড়ে একটা শাঁখ নিয়ে এল, আর একজন নিয়ে এল একটা ঢাক। ওদের রক্তে প্রতিশোধের বান ডেকে গেছে, চোখগুলি যেন এক সর্বনাশের নেশায় লাল হয়ে উঠেছে। সব বিবেচনার বালাই আজ ওদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। শাঁখে ফুঁ দিয়ে, ঢাক বাজিয়ে, লাঠিগুলি এক মারাত্মক আনন্দে দুলতে লাগলো।

—চলুন বাবু। ক্রুদ্ধ জনতার ফেনিল উল্লাসের একটা ঢেউ সরোষে ভেঙে পড়ে শিশিরকে আহ্বান করলো। শিশির যেন সেই ঢেউয়ের শীর্ষে চড়ে ভেসে গেল—এগিয়ে চললো।

বেশী দূর এগুতে হয়নি। সবচেয়ে আগে পথ রোধ করে দাঁড়ালো জীয়নপুরের থানা। দশজন লাঠিধারী আর ছ'জন বন্দুকধারী কনস্টেবল আর একজন পিস্তলধারী সাব-ইনস্পেক্টর। জীয়নপুরের থানার আত্মাটা যেন এতক্ষণে, এই চীৎকারে খৈনির স্বপ্ন ভেঙে শান্তি ও শৃঙ্খলার ঝুঁটি ধরবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। লেঠেলরা বোধ হয় আছে আরও পেছনে, আর এক দফা চিঁড়ে ক্ষেতে বসেছে। গোলাদারেরা আরও একটু দূরে—নিজের নিজের গদিতে, সিদ্ধিদাতা গণেশের ঠিক মুখোমুখি।

অন্নপিশাচ গেঁয়ো কঙ্কালগুলির কাঁচা বাঁশের লাঠি উন্মত্ত হয়ে ওঠার আগেই কতগুলি আলোহীন মুহূর্ত যেন শিশিরের সংজ্ঞা স্তব্ধ করে দিল। আড়াল থেকে যেন এক সরীসৃপের ঠাণ্ডা শোণিত তার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। মাথার তালু থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছিল শিশিরের—ঘামে ভিজে উঠছিল। পেছন ফিরে একবার অবারিত মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো শিশির—অস্তাচলের আকাশ ক্রমেই বিষণ্ণ হয়ে উঠছে।

বর্ধমান হাসপাতালের রোগশয্যায় প্রথম জ্বরের বিরামের মধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রথম বুঝতে পারলো শিশির—সে পালিয়ে এসেছে। কেমন করে, কোন্ পথে পালিয়ে এল—ঠিক মনে পড়ে না। কেন পালালো? ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না শিশির।

কাঁকুলিয়া রোডে সেই সর্বনেশে এক যাদুকরের আস্তানার মত বাসাটার মধ্যে এখনো বেঁচে আছে অবনীনাথ, যার সকল আয়োজন আর বিশ্বাসের পিঠে পেছন থেকে ছুরি মেরে সে আজ পালিয়ে এসেছে। অরুণার নামে

কিসব আবোল-তাবোল লিখে ফেলেছে চিঠিতে! সে ধরা পড়ে গেছে। কি ভাব্‌লো অবনীনাথ? অরুণাও নিশ্চয় সেসব চিঠি পড়েছে। অবনীকে হিংসে করার এ দুঃসাহস কোথা থেকে পেল শিশির!

হাসপাতালের রোগশয্যার শুয়ে দুঃস্বপ্নটা আরও যন্ত্রণাকর হয়ে ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে যায় শিশিরের। জেগে উঠে চোখ মেলে তাকায়, বুঝতে পারে, সবদিক দিয়ে তার সব পথ আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

জীবনে নিজের ওপর কখনো এতখানি দরদ অনুভব করেনি শিশির। কোন্ দুঃখে পরের জন্য ফুরিয়ে যাবে সে? তার দুঃখে পরের চোখে কতটুকু কান্না বরাদ্দ আছে? কিছু নয়, এই হাভাতেরা বেঁচে থাকলে তার চিতার ওপর সোনার দেউল গড়ে তুলবে না। নিজের ভাগ্য বোঝে না হাভাতেরা, তবে সে-ই বা কেন বৃথা তাদের জন্য নিজের ভাগ্য বিলিয়ে দেবে? পরার্থে প্রাজ্ঞেরা উৎসর্গিত হতে থাক্, শিশির পারবে না।

শিশিরের আজ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, জনতার সেবা, মানুষের মুক্তি, সংগ্রাম—এসবই যেন কোন্ এক হিংসুক দার্শনিকের তৈরী কতকগুলি চতুর নীতিসূক্ত। একজনের সুখ দশজনের সহ্য হয় না বলেই আদর্শের নামে একটা কারসাজিকে বিচিত্র মোহ দিয়ে রঙিন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দুনিয়ার যত অবহেলার অভাজনগুলির সঙ্গে মিশে নিজের ভাগ্য খর্ব করতে হবে। একেই নাকি আত্মত্যাগ বলে—একটা আদর্শ। তবে আত্মহত্যা দোষের কেন?

নিজেকে নিয়ে সুখী হতে পারতো শিশির। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভুলের ঝড় এসে সব ওলটপালট করে দিল। এই ভুল আজ বুঝতে পেরেছে শিশির।

তাই বর্ধমান হাসপাতাল থেকে সোজা কলকাতায় চলে আসতে

হয়েছে। এবার থেকে আরম্ভ শুধু ভুল সাম্লাবার ব্রত। আত্মশুদ্ধির সাধনা।

সবার আগে মাপ চাইতে হবে সিতার কাছে। সিতা…।

মনের ভেতর একটা অপরাধের জ্বালাকে অনুনয়ে শান্ত করার জন্য যেন দুহাতে মাথাটা টিপে কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে রইল শিশির। মনে পড়ে, গত এক বছরের ইতিহাসে জীবনের এক পরম প্রাপ্তিকে কী অবহেলায় অপমান করেছে সে।

এতক্ষণে বিপিন ফিরেছে বাজার থেকে। ভেতরের বারান্দায় বিপিন আর বিপিনের বৌয়ের ব্যস্ত বাক্যালাপের শব্দ খুবই স্পষ্ট হয়ে শোনা যায়।

গান ছেড়ে দিতে হবে, বাজনাগুলো বেচে দিতে হবে, এই খদ্দরের সাজের ভণ্ডামিতে আজ থেকেই ইতি, পারুল বৌদিকে কাল চিঠি দিতে হবে, মেজদা একবার আসুক, আর আলমারি ভরা এই রাগ মহাদেশের যত স্বরলিপির জঞ্জাল অচিরে শেষ করে দিতে হবে—পুড়িয়ে হোক বা ছিঁড়েই হোক।

এই বাসাটাও ছাড়তে হবে।

বিপিন ডাকলো।—আসন হয়েছে বাবু, আসুন।

বিপিনের আহ্বানের শব্দে যেন আচম্‌কা একটা তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল শিশিরের।

—কিসের আসন? বিরক্ত হয়ে শিশির প্রশ্ন করলো।

কৃতার্থতার আবেগে ধন্য হয়ে বিপিনের প্রত্যুত্তর আবার শোনা গেল।—খাবেন আসুন।

কোন উত্তর দিল না শিশির। বিপিন নামে এই নগণ্য জীবটার গলার স্বরেও আজ কী স্পর্ধার সুর! সুখী হতে ও ঘর বাঁধতে সবাই

শিখেছে। আড়ালে অগোচরে সকলেই শুধু যেন শিশিরকে বাদ দিয়ে জীবন ভরে তৃপ্তি আর সফলতা কুড়িয়ে ফিরছে।

শেষ পর্যন্ত বিপিন একেবারে সামনে এসেই বিরক্তির স্বরে অনুযোগ করলো।—বার বার ডাকছি যে বাবু।

শিশির বিপিনের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল। ঈর্ষায় আবিল অথচ তীব্র একটা দৃষ্টি। বিপিনের সকল উৎসাহের শিখা যেন একটি ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে শিশির বললো।—কেন ডাকাডাকি করছো?

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল বিপিন। ধীরে ধীরে তার সারা মুখের দীপ্তি মুছে গিয়ে সেই পুরাতন দরিদ্র ভরণ্যভুক্ জীর্ণ মানুষের মূর্তিটা ফুটে উঠতে লাগলো।

শিশির বললো।—তোমাদের তো আর এখানে থাকা চল্‌বে না।

মেজের ওপর অবসন্নের মত বসে পড়লো বিপিন। ঘরের মধ্যে এই আকস্মিক নিস্তব্ধতাকে সন্দেহ করেই বোধ হয় বিপিনের বৌ দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

শিশির বললো।—আজই চলে যাও তোমরা। আমার অসুবিধা হচ্ছে।

আকস্মিক একটা আঘাতে মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে গিয়ে বিপিনের শরীরটা কুঁচকে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছিল। দু'হাঁটুর ফাঁকে তার ভয়ার্ত মুখটাকে জোর করে গুঁজে দিচ্ছিল বিপিন। পেছনে দরজার আড়াল থেকে বিপিনের বৌ ডাকলো।—শোন।

একবার উঠে গিয়েই আবার ফিরে এল বিপিন। বললো।—হাঁ বাবু, এখুনি চলে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু আপনি আগে খেয়ে নিন।

বিপিনের অনুরোধটা যেন অপমানের চাবুকের মত শিশিরের সারা অন্তরাত্মার ওপর আছড়ে পড়লো। কী উদার, কী উদ্ধত হয়ে উঠেছে

বিপিন! কত সহজে, অবাধে, সে আজ শিশিরের মত প্রভুকেও অনুকম্পা করছে!

উদ্যত আক্রোশটাকে চাপা দিয়ে শিশির শুধু দুটি স্থশাণিত কথায় তার শেষ নির্দেশ জানিয়ে দিল।—যাও তোমরা।

বিপিন তবু দাঁড়িয়েছিল। বিপিনের বৌ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিপিনের হাত ধরে একটা টান দিল।—চল।

চলেই গেল। আলোকিত বৈঠকখানা ঘরের দরজাটা পার হয়ে বারান্দার অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা দুজনে যেন ছায়া হয়ে গেল। পায়ের শব্দ আর শোনা যায় না। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো শিশির, তার জীবনের সব সুখ শান্তি ও কামনার সমাধির ওপর ওরা দু'জনে যেন ভুতুড়ে প্রতীকের মত হঠাৎ দীপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল।

গুরুদয়ালবাবু আর জয়ন্তকে নিয়ে মোটর গাড়িটা সহর্ষে ফটক পেরিয়ে উধাও হয়ে যাবার পরেই কিছুক্ষণের জন্য একটা একটানা স্তব্ধতা সিতাকে অভিভূত করে রাখলো। ডোভার লেনের প্রাসাদোপম বাড়িটা এই মুহূর্তে একটা ভগ্নপ্রাকার পরিত্যক্ত দুর্গের মত বান্ধবহীন শূন্যতায় সিতার কাছে যেন নিরর্থক হয়ে উঠেছে। বাঁচবার মত এখানে আর কোন আশ্রয় নেই, আস্পদ নেই। কেউ তাকে বাঁচাতে চায় না। তাই সবাই একে একে দূরে সরে পড়ছে। স্বয়ংবরার সকল গর্ব এক মুহূর্তের চক্রান্তে যেন জহর অনলের শিখা হয়ে উঠেছে, তার আত্মলুপ্তির অভিশাপকে সত্য করে তুলেছে।

বড় দুঃখে লজ্জা অনুভব করছিল সিতা। নিজের ভীরুতা ও দুর্বলতার জন্য নয়। গুরুদয়ালবাবু কত সহজে ধরা পড়ে গেলেন। এখনো চূড়ান্ত কিছুই হয় নি। শুধু পারুলদির একটি চিঠি একটা

সুগোপন সত্যকে ব্যক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এই সামান্য চিঠির মর্ম টুকুই যেন গুরুদয়ালবাবুর বাৎসল্যের জগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে তাঁর সোনার হরিণী মেয়ে তাঁর কাছে মাটী হয়ে গেছে। আর দুদিন পরে হয়তো চিনতেই পারবেন না। তাঁর বাইশ বছরের প্রতিটি উৎকণ্ঠা উদ্বেগ স্নেহ ও ভালবাসা ঊর্ণাজালের মত কী ক্ষীণ বন্ধনে গ্রথিত ছিল, তার মধ্যে এতটুকু হৃদয়ের সত্য ছিল না। গুরুদয়ালবাবু আজও হয়তো মুখে স্বীকার করবেন না, কিন্তু আর কোন্ প্রমাণের বাকি আছে? তাঁর আচরণেই এই সত্যটা আজ সব দিক দিয়ে নির্লজ্জ হয়ে ওঠেনি কি?

সে ভীরু, সে দুর্বল—তাই সে আজ পরাভূত। সিতা মনে মনে তার সব অপরাধকে অকপটে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষিতা নারীর অপমানের জ্বালার মত দুঃসহ একটা ক্ষোভ তার উত্তেজিত চিন্তার পরতে পরতে হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। হিতাহিত বিবেচনার দ্বিধা, অভিমানের সংকোচ, নিরীহতার বাধা চূর্ণ করে একটা প্রতিশোধের অভিলাষ মরিয়া হয়ে ওঠে।

সিতা আজ বুঝতে পারে, সোনার হরিণী সে নয়। ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর ডোভার লেনের বাড়িটাই সত্যিকারের স্বর্ণ তপোবন। এর বাইরে থাকলে সিতার কোন মূল্য থাকে না।

বেশ তো! তাই বলে কি প্রতিশোধ নেওয়া যায় না? গুরুদয়াল-বাবুর স্তব্ধীভূত বাৎসল্যের স্নায়ুগুলিকে কি কোন উপায়ে আবার আকুল করে তোলা যায় না? খুব পারা যায়। ভাবতে ভাবতে সিতার মুখটা কঠোর হয়ে ওঠে। আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, সারা মুখটা কী ভয়ানক কালো হয়ে উঠেছে! হোক্।

সত্যিই যেন তার চিন্তার গহনে একটি পথ আবিষ্কার করতে পেরেছে সিতা। আত্মলুপ্তি ছাড়া যদি গতি নেই, তবে সেই পথই ভাল।

এই স্বর্ণ তপোবনের বাইরে যেন শুধু বনজঙ্গল পড়ে রয়েছে—গুরুদয়ালবাবু বোধ হয় তাই মনে করেন। কিন্তু হীরা মরকতের তপোবনও যে আছে। পয়সা আর পুঁজির জোরে ব্রোকার গুরুদয়াল বসুকে কিনে ফেলতে পারে, এমন বড়লোকও যে আছে, সেকথা কেন ভুলে আছেন তিনি?

দেরাজ হাতড়ে ধীরে ধীরে একটা পুরনো চিঠি বার করে সিতা। লীলা পিসিমার চিঠি, প্রায় বছরখানেক আগেকার লেখা। রাজসাহী থেকে লীলা পিসিমা এক বিয়ের প্রস্তাব করে লিখেছিলেন, সিতার সম্মতি জানতে চেয়েছিলেন। এই চিঠিতেই পাত্রের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে—মতিগঞ্জ রাজস্টেটের বার আনির মালিক কুমার অনিমেষ রায়, সুশ্রী যুবক, বিলাত ফেরত, বড় ব্যবসায়ী, বড় অমায়িক সরল সদয়, দানী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান; প্রথমা পত্নী বিগতা, বিয়ের এক বছর পরেই।

চিঠিটা চোখের সামনে টেনে নিয়ে পড়ছিল, যেন একটা বিষের মোড়ক খুলে দেখছিল সিতা। সিতার চোখে যেন সেইরকম একটা আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা। এক বছরের মধ্যে যে-চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি, সিতা আজ সেই চিঠির উত্তর দেবে। একটা কদর্য সঙ্কল্পের ছায়া পড়ে সিতার নিস্প্রভ লাবণ্যহীন মুখটা আরও কুৎসিত হয়ে উঠলো।

তবু একটা সান্ত্বনা নেশার মত সিতার এই নিদারুণ হঠকারিতাকে মোহগ্রস্ত করে তুলছিল। পরিণামের কথা নিয়ে ভাবনার আর কোন প্রয়োজন নেই। সিতা শুধু দেখতে চায়—গুরুদয়ালবাবুর নির্বাসিত বাৎসল্য আবার এই হীরার জলুসের ধাঁধা লেগে হঠাৎ কোন্ মূর্তিতে দু'বাহু তুলে অধীর আগ্রহে ছুটে আসে, ক্ষমা চাইতে, করুণা কুড়োতে—মতিগঞ্জের বধূরাণী সিতাকে শতবার নিজের মেয়ে ভেবে ধন্য হতে।

সিতা দেখ্‌বে—উদ্ধত জয়ন্তের ছায়া একেবারে ব্যর্থ হয়ে গুরুদয়ালবাবুর বাড়ি আর হৃদয়ের আঙিনা থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে।

দরজার বাইরে পর্দার আড়ালে একটা মূর্তি উসখুস করছিল। সিতা ডাকলো—কে ?

বয়টা এগিয়ে এসে বললো—দশটা বেজে গেছে দিদিমণি। টেবিল দেব ?

—না, শরীর ভাল নয়। খাব না।

একটা হিস্টিরিয়ার আবেশের মধ্যে যেন কাজ করে চলেছে সিতা। চিঠির প্যাড আর ফাউণ্টেন পেন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে লিখতে বসলো।

একটি লাইনও লিখতে পারলো না সিতা। গভীর রাত্রির শব্দহীন শান্তি ধীরে ধীরে সিতার ছন্নছড়া চিন্তার বিকার সুস্থ করে আনতে লাগলো। আত্মহত্যার মত এই প্রতিশোধের লিপ্সা, এই কৃত্রিম জয়ের কল্পনা—নিছক মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। এভাবে অবশ্য বুড়ো গুরুদয়াল-বাবুকে হারিয়ে দিতে পারা যায়, জয়ন্তকে জব্দ করা যায়—কিন্তু সবার আগে যার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত, সেই খেয়ালী শিল্পী আর দেশকর্মী শিশির নামে সকল অপরাধের প্রধান আসামীর জীবনে এক তিল শাস্তির জ্বালা স্পর্শ করবে না। রাগ মহাদেশ, জাতিসেবা, কংগ্রেস—কতগুলি ফাঁকির আড়ালে, সিতার জীবনের প্রথম অভ্যর্থনাকে পরিহাস করে, সেই বরমাল্যবিলাসী গুণীর আত্মাটি আজ অগোচর হয়ে গেছে। তার ক্ষতি করার কোন সুযোগ নেই। প্রাপ্তির প্রাচুর্যে সেই অপরাধীর সব কামনা ধন্য হয়ে আছে ; এক নতুন তৃপ্তির গোধূলি তার দীক্ষিত জীবনের আকাশ রঙে ও আলোকে ভরে রেখেছে। সব নাগালের বাইরে চলে গেছে সে।

সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া যেত, যদি কোন বিভ্রম আজ

শিশিরকে অলীক করে ফেলতে পারতো, তার প্রথম অনুরাগের ডাক যদি সত্যি করে পথ ঘুরে, হৃদয়ের দিক দিয়ে আজ দ্বিতীয় কোন সুজন খুঁজে নিতে পারতো—জয়ন্ত মজুমদারই হোক্, বা কুমার অনিমেষ রায় হোক্।

হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো সিতা। এই কুৎসিত চিন্তার ক্লেদ তার মনের ভিতর কী নোংরামির তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলেছে! জয়ন্ত আর কুমার অনিমেষ—হয়তো তারা ডোভার লেনের বাড়ির যোগ্য অতিথি, তারা গুরুদয়াল বসুর বংশ বিত্ত ও শ্রেণীর সুহৃদ, আত্মার আত্মীয়, আপন জন। কিন্তু সিতার মনের রাঙামাটীর পথে পথিক হবার মত কি যোগ্যতা আছে তাদের? অসম্ভব।

কাঁদছিল সিতা। নিজেকে কঠিন করে রাখবার মত আর কোন শক্তি ছিল না সিতার। এই মুক্তিপথহীন অসহায়তার বেদনা যেন দু'চোখ ফুঁড়ে ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়ছিল। কিছুই করা যাবে না, কোন উপায় নেই। সিতা বসু নামে কোন শিক্ষিতা আধুনিকা প্রগতিবাদিনী ভিন্নপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই। ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ, ভিন্ন কোন সত্তা নেই! ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর বিত্তকৌলীন্যের প্রতিটি রুচি সাধ অহংকার দিয়ে সিতার বাইশ বছরের জীবনের অস্থিমজ্জা রচিত। সব কিছুর আগে তাকে গুরুদয়াল বসুর মেয়ে হয়ে থাকতে হবে। এর ব্যতিক্রম হ'লেই একেবারে ভুয়ো হয়ে যাবে সিতা।

আয়নার ওপর নিজের প্রতিচ্ছবিটার দিকে দরদীর মত তাকিয়ে দেখছিল সিতা। বিনা দোষে এক প্রচণ্ড শাস্তির জ্বালা সহ্য করে অদ্ভুত রকমের করুণ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে ঐ মূর্তিটা। সংসারের স্বরূপ বেশ ভাল করেই চিনে ফেলেছে সিতা। জীবনের প্রত্যেকটি লালিত প্রত্যয় এক একটি ছলনা ছাড়া কিছু নয়। গুরুদয়াল বসুর বাৎসল্যের রহস্য চেনা গেছে। আর শিশির? সে তো সকল

অনিয়মের হৃদয়হীনতাকে চরম করে দিয়েছে। এত মিথ্যার সঙ্গে লড়বার মত শক্তি নেই তার। পুরাতন সিতা মরে যাক্, আলোহীন বাসরের মত এক অনিয়মের পৃথিবীতে সকল ঘটনার ব্যভিচার ভীরুচিত্তে মেনে নিয়ে, শুধু ঠাঁই খুঁজে বেড়াবে সিতা। তবু ঠাঁই পাওয়া যাবে না। জীবনে এই সত্যটুকুকেই নিয়ম বলে স্বীকার করে নিয়ে, আজ তাকে শান্ত হ'তে হবে।

সিতা সত্যিই শান্ত হলো। সকালবেলা বিছানায় উঠে বসে প্রথম মনে পড়লো, রাত্রিটা যেন একটা স্বপ্নহীন একটানা ঘুমের সমাধির মধ্যে চকিতে পার হয়ে গেছে। সারা দেহে ও মনে একটা রোগমুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিল সিতা। কত লঘু ও নির্ভার মনে হচ্ছে। সব বেদনার শক্তি ফুরিয়ে গেছে, নিছক বৃত্তান্তের মত সবকিছু অক্লেশে মনে মনে আদ্যোপান্ত পাঠ করা যায়, কিন্তু সেসব স্মৃতি বর্তমানের মুহূর্তগুলিকে খুঁচিয়ে আর বিষন্ন করতে পারে না। অত্যন্ত অতীত, অতি দূর ও ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে ঘটনাগুলি। শিশিরকে আজ স্বচ্ছন্দে স্মরণ করতে পারে সিতা। সমস্ত কাহিনীটি মনের পাতে লেখা কতগুলি অক্ষরের আড়ম্বর বলে মনে হয়, তার সঙ্গে তিলমাত্র ব্যথার রেশ মিশে নাই। জীবনের ইতিহাসটা যেন নিছক বিবরণ হয়ে গেছে। এক অবাধ নিশ্বাস নেবার বাতাসভরা অবকাশ পড়ে রয়েছে। নতুন বেদনাহীন পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়েছে সিতা। নতুন করে চল্‌তে হবে, আর যেন কোন ভুল না হয়।

ভুলের ব্যাপারে সত্যিই খুব সাবধান হয়ে গেল সিতা। প্রতিদিনের নিয়ম মত স্নানের জন্য গরম জলের দরকার ছিল। গরম জল হয়েছে কি না, কোন চাকরকে ডেকে আজ আর প্রশ্ন করার সাহস পেল না সিতা। এতটা দাবি করার সাহস না থাকাই ভাল। ভুল হবে। এই

বিচিত্র সংকোচ জীবনে প্রথম অনুভব করলো সিতা। এ-বাড়ির সকল সমাদরের পরিমাণ নিক্তির তৌলে মাপা আছে। দাবি করতে গিয়ে কোথায় কখন্ মাত্রার বেশি হয়ে পড়বে কে জানে! কতটুকু দাবি এখানে গ্রাহ্য—সে-নিয়ম যখন জানা নেই, তখন চুপ করে থাকাই ভাল। অনাহূত অতিথির মত নিজের দীনতায় সংকুচিত হয়ে কোন হাঁকডাক না করে, ঠাণ্ডা জলেই স্নান সেরে এসে বসলো সিতা।

বয়টা চা-খাবার দিয়ে গেল। শুধু চা-টুকুই যথেষ্ট, খাবারগুলি নিতান্ত বাহুল্য মনে হয়। বহুদিন ধরে নিতান্ত না বুঝেই যেন এই অপব্যয়ের ভাগী হয়ে এসেছে সিতা। কেউ মুখ ফুটে না বললেও, একটা অশ্রুত প্রতিবাদ যেন আড়ালে বসে এই অপচয় লক্ষ্য করছে।

সিতা বুঝতে পারে, আজ তার চিন্তা ও আচরণ পদে পদে একটা কুণ্ঠায় জড়িয়ে পড়ছে। সদাব্রতের সত্রের মত পিতৃভবনের এই উদার দানের কৃপা গ্রহণ করতে একটা লজ্জার বাধা ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে সিতা।

এর পর একটু বেড়াতে বের হওয়া উচিত ছিল। চকচকে পন্টিয়াক গাড়ি-বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বৃথা পেট্রল পুড়বে, বৃথা হয়তো কারও কষ্টের ঐশ্বর্য খানিকটা ক্ষয় হয়ে যাবে। কারও জীবনের সবচেয়ে বড় মোহের ওপর উৎপাত করতে চায় না সিতা। সিতা বুঝতে পারে, তার সেই সাহসও আজ আর নেই।

পরাভূত হয়েছে সিতা, আকাঙ্ক্ষার সব উত্তাপ উপে গেছে, শান্ত লঘু ও নির্ভুল হয়ে গেছে সিতা। ডোভার লেনের এই বিরাট বাড়িটার দু'চার কণিকা করুণার উঞ্ছ কুড়িয়ে এক কোণে যেন পড়ে থাকতে চায় সিতা—তবু এই বাড়িটারই একটি কোণে। আশ্চর্য!

ডোভার লেনের বসু-ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশির একটা শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। জানালার পর্দার আড়াল থেকে ঘটনাটাকে স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না সিতা। শিশির দাঁড়িয়ে আছে, যেন একটা অবাস্তব আবির্ভাব, অস্তগত সূর্যের স্থশান্ত প্রতিবিম্বের মত উত্তপ্ত বাতাসের পটে ক্ষণিকের জন্য মূর্তি ধরে রয়েছে। এ ছবি এখনি মিলিয়ে যাবে। নির্লিপ্তভাবে সিতা শুধু দেখছিল—যেন বস্তুজগতের সীমানার বাইরে, অতি দূরের একটা ছবি!

পরক্ষণেই সিতা দেখলো, কাগজের স্লিপের ওপর শিশির তার নাম লিখে বেয়ারার হাতে দিচ্ছে। দৃশ্যটার ছোঁয়াচ লেগে সিতার সমাধিস্থ চেতনার পাথরটা বোধ হয় নড়ে উঠলো। বুকের ভেতর শ্বাসবায়ুর উদ্দাম আলোড়ন সমস্ত শক্তি দিয়ে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলো সিতা। কাঁপছিল, হাঁপিয়ে উঠছিল, এক ঝলক রক্তাভ উত্তেজনার চূর্ণ পরাগ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত রকমের সুন্দর করে তুলছিল সিতাকে। জীবনে কোন দিন, কোন পুলকে প্রসাধনে ও মানে-অভিমানে এত সুন্দর দেখায়নি তাকে।

বেয়ারা এসে শিশিরের লেখা স্লিপটা দিয়ে গেল। চুপ করে রইলো সিতা। বেয়ারা একটা নির্দেশ আশা করেই একবার বললো।
—বাবুটি দাঁড়িয়ে আছেন দিদিমণি।

সিতা—আমিই যাচ্ছি।

বেয়ারা নিজের কাজে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই সিতা ফিরে প্রশ্ন করলো—বাবা কোথায়?

—লাইব্রেরীর ঘরে আছেন, কাগজ পড়ছেন।

চলে যাচ্ছিলো বেয়ারা। সিতা ডাকলো—শোন। তুমিই যাও, বাবুটিকে এই ঘরে নিয়ে এস।

মাত্র পাঁচ মিনিট আগে যে-অনিয়মের পৃথিবীর কাছে শুধু পরাভব মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল সিতা, মাত্র পাঁচটি মিনিট পরেই সে পৃথিবীর রূপ একেবারে মিথ্যা হয়ে গেল। এক নিমেষেই যেন তার চেতনার সেই প্রচণ্ড অবরোধ ঘুচে গেছে। ছোট ছোট ঝড় ছুটে আসছে আবার, পতিত অনুভবের রিক্ততা ছাপিয়ে যত নির্বাসিত শোক হর্ষ বেদনা ও কামনার খরধারা সব ডুবিয়ে দিতে ছুটে আসছে। এই আবেগময় কয়টি মুহূর্তের প্লাবনের মধ্যে পুরনো দিনের সব মোহ জীবন হয়ে ভেসে উঠলো আবার।

—আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেচি সিতা।

ঘরে ঢুকে সিতার দিকে একবার ভাল করে তাকাবার আগেই এক নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শিশির। যেন বহু ক্লেশে কথাগুলির বল্‌গা ধরে রেখেছিল।

একথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সিতা। শিশিরের রুগ্ন ও বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাল-মন্দ কিছু অনুমান করার শক্তিও দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। শিশির যেন সেই পুরনো দিনেরই একটি মেঘস্তবকের মত একেবারে নিকটে নেমে এসেছে। কিন্তু বৃষ্টি না বজ্র? কোন্ উপহার নিয়ে এসেছে শিশির কে জানে!

সিতার বিস্ময় ক্রমে বিমূঢ়তার মতই হয়ে উঠছিল। তবু শান্তভাবে উত্তর দিল।—কেন মাপ চাইছ?

—আমার ভুলেই তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ সিতা। তাই মাপ চাইছি। এবার থেকে আর আমাকে ভুল বুঝো না।

—কি ভুল করেছ তুমি?

—ও-সব কংগ্রেস ফংগ্রেস ছেড়ে দিলাম।

—কেন?

—ওর মধ্যে শান্তি নেই।

—শান্তি খোঁজার জন্যে কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়েছিলে?

—না। শান্তির কথা ছেড়ে দাও, ওর মধ্যে কোন সত্য নেই।

—তবে কি দেখে ওর মধ্যে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, ওর মধ্যে গোঁয়াতুর্মি আছে, সেই গোয়াতুর্মির একটা মোহ আছে। তাই গিয়েছিলাম বোধ হয়। কিন্তু বেশী দিন সে-মোহ থাকে না।

সিতা হাসলো—যা বললে, তার মধ্যে সব কথা বলা হয়ে গেল কি? এছাড়া আর কোন মোহ ছিল না?

শিশির অপ্রস্তুত হয়ে বললো।—এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না সিতা।

সিতা।—সব চেয়ে সত্যি কথাটা এড়িয়ে গেলে শিশির।

শিশির।—আজও তুমি আমাকে কেন বিশ্বাস করতে চাইছ না সিতা?

শিশিরের কথাগুলির মধ্যে একটা কাতরতা ছিল। সিতার প্রশ্নগুলি যেন অতিরিক্ত স্পষ্টতায় আলাপের বদলে আঘাত হয়ে উঠছে। ক্ষণিকের জন্য একটা মমতা সিতার সংশয়ের রূঢ়তাগুলিকে একটু নরম করে দিল।

সিতা বললো।—কবে ফিরে এলে?

—কাল এসেছি।

—সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—বুঝলাম না সিতা।

সিতা চুপ করে গেল। তার সকল কথার সহজ স্রোতে যে প্রশ্নটা ভেসে আসতে চাইছে, বার বার চেষ্টা করেও তাকে বাধা দিয়ে সরিয়ে রাখতে পারছিল না।

সিতা।—জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা হয়নি?

শিশির।—জ্যোৎস্না ?

সিতা।—হ্যাঁ

হেসে ফেললো শিশির। বিষণ্ণ হাসিটা যেন সিতার মনগড়া সংশয়ের অভদ্রতাকে মৃদু ধিক্কার দিল।—না, দেখা হয়নি, দেখা করার কথা কোন দিনও মনে হয়নি, এখনো কোন প্রয়োজন নেই।

একটু চুপ করে থেকে শিশির বললো।—এইখানেই তোমার ভুল সিতা। আমি সত্যিই ভেবে পাই না, তোমার মত মানুষের মনেও সেকেলে মেয়ের এই দুর্বলতা কেমন করে থাকতে পারে। যেটা একেবারেই অলীক, অসম্ভব…।

সিতা হঠাৎ অস্বস্তিতে ছটফট্ করে উঠে হেঁটমুখ হয়ে রইল। চোখের সজলতাটুকু লুকিয়ে ফেলার জন্য বোধ হয় উত্তর দিতে গিয়ে সিতার গলার স্বর ক্ষীণতর হয়ে এল।—আর কিছু বলো না শিশির। আমি বিশ্বাস করছি, আজ তুমি সবই সত্য বলছো। হ্যাঁ আমারই দুর্বলতা, কিছু মনে করো না শিশির। জানি না, কোন্ দুঃখে আমাকে এই দুর্বলতায় পেয়েছিল।

শিশির।—আমি গান ছেড়ে দিলাম সিতা।

সিতা।—কেন ?

শিশির।—তোমার জন্য।

সিতা।—এ-কি অদ্ভুত কথা!

শিশির।—গান আমার অনেক সময় নষ্ট করেছে। একদিন তোমাকে দূরে বসিয়ে রেখে আমি গান গেয়েছি, গান শেষ হলে তোমায় দেখতে পেয়েছি। আমি কি ভয়ানক মূর্খ ছিলাম সিতা।

দু'হাত তুলে চোখ আর কপালটা চেপে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল সিতা।

শিশির।—অবনীবাবুকে আমি চিনে ফেলেছি সিতা। আমার জীবনের বাঞ্ছিত পথ ভুল করে দেবার সাধ্য তার নেই। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার।

সিতার মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ছিল, আরও নিবিড় একটা আড়াল খুঁজছে যেন।

শিশির।—খদ্দরের ভণ্ডামি ছেড়ে দিলাম সিতা। পারুল বৌদিকে চিঠি দিয়েছি……মেজদা শীগ্‌গির আসবেন…তারপর আমি সুখী হতে চাই সিতা। সেই আয়োজনের জন্যই……।

শিশিরের কথায় উৎসাহে সাড়া দেওয়া দূরে থাক্‌, নিষ্প্রভ শিখার মত ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছিল সিতা। দেখে মনে হয়, শিশিরের কথাগুলি সিতার চারদিকে একটা দুঃসহ প্রদাহের বলয় সৃষ্টি করেছে, তারই ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করছে সিতা।

শিশিরের আগ্রহ আরও আকুল হয়ে উঠলো।—ওঠ সিতা, চল, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবো।

সেই মুহূর্তে সবেগে মুখ তুলে তাকালো সিতা। চোখের দৃষ্টিটা পুড়ছিল। আকস্মিক অপঘাতে পীড়িত হয়ে সিতার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন রুক্ষস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো।—কেন?

সুবিনীত আত্মনিবেদনের গৌরবে একটু কুঁজো হয়ে, গলার স্বরে অন্তরের সব আবেগ ছড়িয়ে দিয়ে শিশির বললো।—আজ আমি তোমার বাবাকে প্রণাম করবো সিতা।

ভেজা মাটির মূর্তির মত ভেঙে গলে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যাবে সিতা। মাথাটা হেঁট হয়ে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছিল। পৃথিবীর শেষ সম্ভ্রমের আবরণ ছিঁড়ে গেছে, সিতা তাই যেন তাকাতে পারছিল না।

গুরুদয়ালবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এইমাত্র লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে শিশির। বলে গেছে, আজ সন্ধ্যায় আবার সে আসবে।

গুরুদয়ালবাবু পরিত্রাহি সিতাকে ডাকছিলেন, উচ্চস্বরে, উৎসাহের সঙ্গে। সিতা ব্যস্ত হয়ে সাড়া দিয়ে লাইব্রেরী ঘরে গুরুদয়ালবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো। যেন একটানা নির্বাক একটা যুগের পর আজ প্রথম সিতাকে আহ্বান করলেন গুরুদয়ালবাবু।

খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল গুরুদয়ালবাবুকে। সিতা সামনে এসে দাঁড়াতেই একটা নকল তিরস্কারের সুরে যেন আদর করবার জন্য বললেন—তুই তো বড় মিথ্যুক রে সিতা।

গুরুদয়ালবাবু এতখানি পুলকচাঞ্চল্য তবুও সিতার মুখ-চোখের গভীর বিষণ্ণতার আবরণটুকু দূর করতে পারছিল না। সিতা শুধু কৌতূহলী হয়ে স্পষ্টতর কোন বক্তব্য প্রত্যাশা করে দাঁড়িয়ে রইল।

গুরুদয়ালবাবু বললেন।—শিশিরের নামে তুই অযথা কতগুলি অপবাদ দিয়েছিস্ সিতা। প্রত্যেকটি কথা তুই উল্টো করে বলেছিস্।

একটু চুপ করে থেকে গুরুদয়ালবাবু বললেন।—শিশিরের তো কোন আদর্শ টাদর্শ নেই। সে নিজের মুখেই বলে গেল যে……।

সিতা আস্তে আস্তে উত্তর দিল—না বাবা সে-সব কিছু তার নেই।

গুরুদয়ালবাবু।—শিশির তো কংগ্রেস ফংগ্রেস পছন্দ করে না।

সিতা।—না।

গুরুদয়ালবাবু।—শিশির বড়লোককে ঘৃণা করে, এই আর একটা বাজে কথা তুই বলেছিলি।

সিতা।—হাঁ।

গুরুদয়ালবাবু।—ছেলেটি মোটেই দাম্ভিক নয়।

সিতা চুপ করে রইল।

গুরুদয়ালবাবু।—গান টানও তো ছেড়ে দেবে বলে গেল। কারবার করতে চায়।

শক্তভাবে নিজেকে সংযত রেখে শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছিল সিতা। সত্য কথা বলবে বলে যেন শপথ করেছে সে। তবু গুরুদয়ালবাবুর শেষ কথাটা শুনে তার নিরীহতার শেষ শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেল। মনের ভেতর একটা দুঃসহ যন্ত্রণার উৎপাত চাপতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়লো সিতা। গলার স্বর কেঁপে উঠলো।—কি বললে বাবা ?

গুরুদয়ালবাবু।—কারবার করতে চায় শিশির। ভেবেছিলাম, জয়ন্তর অ্যাসিস্ট্যান্ট করে দেব, কিন্তু তার চেয়ে ভাল বরং……।

সিতার অন্তরাত্মা যেন মরিয়া হয়ে নিঃশব্দে প্রার্থনা করে উঠলো— তার চেয়ে বরং ভাল মুটে মজুর চাষা বা ভিক্ষুক হয়ে যাক্ শিশির। এই কথা যেন বলেন গুরুদয়ালবাবু। এই অধঃ-পতনের ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদে অন্ততঃ এইটুকু মনুষ্যত্বের গৌরব ধ্বনিত হোক্।

কিন্তু সিতার এত আন্তরিক প্রার্থনাটাও বাস্তবে সফল হলো না। গুরুদয়ালবাবু বললেন।—ভেবে দেখলাম, সেটা ভাল দেখায় না। বরং আমার অফিসে এসে বসুক, কাজ শিখুক, তারপর…… ।

একটু সুস্থির হয়ে সিতা বলে।—যদি সে আপত্তি করে……।

গুরুদয়ালবাবু হেসে ফেললেন।—আপত্তির কথা তুলছিস্ কেন সিতা ? সে রাজি হয়ে গেছে। খুশী মনে রাজি হয়েছে।

সিতার বিরুদ্ধে যত মিথ্যাবাদিতার অভিযোগগুলিকে সংক্ষেপে বিচার করে যেন শেষে রায় দিলেন গুরুদয়ালবাবু।—বাস্তবিক, তুই যত সব বাজে কথা বলে আমাকে বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি সিতা। শিশির ছেলেটি বেশ ! কোন দম্ভ নেই, কোন লম্বা-চওড়া বিদ্‌ঘুটে আদর্শ নেই।

বেশ ছেলেটি! মোটেই অহংকারী নয়, রাগী নয়—কিছু নয়। ছেলেটি একেবারে কিচ্ছু নয়।

সে-সাহস থাকলে সিতা আজ চীৎকার করে গুরুদয়ালবাবুর মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে পারতো।—সে যে সব কিছুই ছিল বাবা। আজ সে একেবারে কিছু-নয় হয়ে গেছে। আমার সব সত্য আজ মিথ্যে হয়ে গেছে।

মাথা হেঁট করে দ্বিতীয় কোন কথা উচ্চারণ না করে সিতা ধীরে ধীরে লাইব্রেরী ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর কিছু বলবার মত সাহস তার নেই। ঠিক একথাও সত্য নয়—তার আর কিছু বলবারও নেই।

সন্ধ্যা হবার কিছু আগে থেকেই বাড়ির গেটের কাছে পায়চারি করছিল সিতা। পোষাক আর প্রসাধনের রকম থেকে বোঝা যায় বেড়াতে যাবার জন্যই সিতা প্রস্তুত হয়ে আছে। গাড়িটা গেটের বাইরে সড়কের ওপর এক পাশে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার একটু আড়াল করে ফুটবোর্ডে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

ড্রাইভার একবার উঁকি দিয়ে দেখলো, তেমনি অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিদিমণি। কারও প্রতীক্ষায় রয়েছেন কি? তা'ও মনে হয় না। বেড়াতে যাবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে অথচ।

হয়তো মজুমদার সাহেব আসবেন এখনি। চিন্তার গবেষণা থামিয়ে হঠাৎ ড্রাইভার কেতাদুরুস্ত কায়দায় উঠে দাঁড়ালো। এক ভদ্রলোক সরাসরি গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এই বাবুটিকে এর আগে কখনো দেখেনি ড্রাইভার। এই রহস্যের আভাস একটু আঁচ করে নেবার জন্য বোধ হয় সে আর একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল, দেখলো এবং শুনলো, দিদিমণি বলছেন—তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি শিশির।

সিতা যেন পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। শিশির কিছু বলার আগেই সিতা বললো।—বেড়াতে যাচ্ছি, তুমিও চল।

শিশির আর সিতা গাড়ির কাছে এসে একবার থামলো। শিশির একটু নিরুৎসাহ হয়ে বললো।—তোমার বাব্যর সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত ছিল আমার।

সিতা।—কেন ?

শিশির।—একটু কাজের কথা ছিল।

সিতা।—বেশ তো, আর এক সময় বলো। আজ সকালে এসেছ, সন্ধ্যায় একবার এলে, না হয় রাত্রিবেলা আর একবার আসবে। তার জন্য ভাবছো কেন ?

শিশির।—আচ্ছা। এখন কোন্ দিকে যাবে ?

সিতা।—কোন্ দিকে যেতে চাও ?

শিশির।—ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে চল।

সিতা।—না, তার চেয়ে ভাল……

হঠাৎ একটা তীব্র কৌতূহল শিশিরের চেতনার বধিরতাকে আঘাত দিল। সতর্ক হয়ে সিতার কথার আবেগটাকে যেন পাহারা দিতে লাগলো শিশির। উৎকর্ণ হয়ে রইল। শিশির জানতে চায়, ডায়মণ্ডহারবার রোডের সান্ধ্য শোভা আর বাতাসের মদিরতা তুচ্ছ করে কোন্ ভাললাগা ঠাঁই আজ সিতাকে এত আপন করে টানছে ?

সিতা বললো —চল জয়ন্তবাবুর বাড়ি।

গাড়ি চলছিল। চুপ করে বসেছিল শিশির। সিতা বললো।—জয়ন্তবাবুর সঙ্গেও তোমার পরিচিত হওয়া উচিত নয় কি ?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে সমবেদনার সুরে বললো।—এর মধ্যে তোমার কোন অসুখ হয়েছিল কি ?

শশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—কি হয়েছিল ?

শিশির।—কিছু না, সামান্য একটু জ্বর।

সিতা।—এই সামান্য জ্বরেই তুমি এত কাহিল হয়ে পড়লে ? আমার কাছে অনেক কিছু চেপে যাচ্ছ শিশির।

শিশির।—না না, তুমি কি জানতে চাও বল ?

সিতা।—তুমি কংগ্রেসের প্রচারের কাজে মফঃস্বলে গিয়েছিলে না ?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—চলে এলে কেন ? কি হলো ?

শিশির। অভিজ্ঞতা হলো। ঠেকে শেখাই বোধ হয় সত্যিকারের শিক্ষা। যেদিন বুঝলাম আমার ভুল হয়েছে, সেদিন চলে এসেছি।

সিতা।—কিসের ভুল ? অবনীবাবুর থীসিস্‌ও ভুল হয় ?

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে রুক্ষস্বরে শিশির উত্তর দিল।—শুধু আমারই ভুল, একথা বিশ্বাস করি না আমি। পৃথিবীতে অবনীনাথদেরও ভুল হয়।

সিতা হেসে ফেললো।—আমি তো সেই কথাই জানতে চাইছি। অবনীনাথের কোন্ ভুল তোমাকে এত ভোগালো ?

শিশির।—পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করতে হলে শুধু সংগ্রাম করেই করতে হবে, এর কোন মানে হয় না। অনেক বড় বড় কাজ নীরবে শান্তভাবে, কারও সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হৈচৈ না করেও করা যায়।

সিতা সন্দিগ্ধভাবে শিশিরের প্রত্যেকটি কথার গোপন মর্মটুকু ধরবার চেষ্টা করছিল। আধিগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসার মত সিতা যেন এক একটি প্রশ্নের টোপ ফেলে শিশিরের এই মানসিক বিক্ষোভের ভেতরের গলদটি উপরে টেনে তুলতে চায়।

সিতা।—হ্যাঁ, দেশের লোক-ক্ষেপানো কাজ এমন কিছু মহৎ কাজ নয়—কঠিন কাজও নয়।

শিশির।—লোকগুলো ক্ষেপেই আসে সিতা। ওদের সঙ্গে মিশতে গেলে পদে পদে বিপদ।

সিতা।—যাক্, সে বিপদ থেকে যে তুমি আগে ভাগে সরে আসতে পেরেছ, এটাই সৌভাগ্য।

শিশির।—এতখানি হিতাহিত জ্ঞানের অভাব, এত মূর্খতা, এতটা খাই-খাই ভাব, বিশ্রী রকমের এই খুনোখুনি করার স্বভাব—এই সব উপাদান দিয়ে কি কখনো বড় কাজ হয় ?

সিতা।—কাদের কথা বলছো ?

শিশির।—গাঁয়ের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকগুলো।

সিতা।—তুমি দেখছি তোমার এত সাধের 'জনসাধারণের' ওপর খুব চটে গেছ।

শিশির হাসলো।—ঠিক চটিনি সিতা। একটা ভরসা ভেঙে গেছে। পেটে ভাত নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই—এই রকম কতগুলি জীব নিয়েই তো জনসাধারণ। এদের দিয়ে কি কাজ হবে বল ? এরা নিজেরই ভাল করতে জানে না—আমার ভাল আর কি করবে ?

সিতা।—তাহলে তোমারও একটা ভিন্ন ভাল আছে ?

শিশির।—একশো বার আছে। আমি সে-কথা আজ বিশ্বাস করি সিতা। আমারও সুখী হবার, যশ খ্যাতি সম্মান পাবার অধিকার আছে।

সিতা।—তুমি তো আগে এরকম কথা বলতে না শিশির। দেশের লোকের সঙ্গে এক হয়ে থাকাই নাকি তোমার সব চেয়ে আনন্দ ছিল ? তোমার সেই 'দুই বিঘা জমি' গানটার সুর এখনো মনে পড়ে। কী ভয়ানক অথচ কী সুন্দর সুর দিয়েছিলে শিশির !

সিতার কথায় শিশিরের বাচাল উচ্ছ্বাস হঠাৎ যেন ঘা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিমনা হয়ে চলন্ত পথচ্ছবির দিকে দৃষ্টিটা সঁপে দিয়ে চুপ করে

বসেছিল শিশির। সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন সিতা আর একটু আগ্রহভরে বললো—যাক্, তোমার কোন ক্ষতি হয়নি তো? কোন অপমানের ব্যাপার হয়নি তো? ভুল সবারই হয়, সেজন্য মন খারাপ করে……।

আড়ষ্টতা একটু কাটিয়ে উঠে শিশির যেন একটা অপরাধের গ্লানি স্খালনের জন্য বললো—দেশের লোক বা ঐ সব জনসাধারণকে আমি যতটা নিন্দে করছি, অবশ্য ঠিক ততটা সত্য নয়। তারা সব কিছুই করতে পারে, তবে……

সিতা।—কি?

শিশির।—আগে তাদের উন্নত হয়ে নিতে হবে। শিক্ষিত হতে হবে, অন্ন-বস্ত্র স্বাস্থ্য পেতে হবে। তারপর সংগ্রাম।

সিতা মুখ টিপে হাসছিল—অবনীনাথের থীসিস্‌টা যে একেবারে উল্টে দিলে শিশির।

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ ফেরালো শিশির। সিতা লক্ষ্য করেছে, অবনীনাথের নাম শোনা মাত্র শিশির একটা বিরক্তিভরা অস্বস্তিতে ছটফট্ করে ওঠে। সিতার অনুমান চূড়ান্তভাবে সত্য করে দিয়ে শিশির বলে উঠলো—অবনীর আর কিসের ক্ষতি? সব পেয়েছে সে। ও-সব কাজ তারই সাজে, তার ভাল লাগে। তাই সে সফল কৃতী ভাগ্যবান……।

সিতা।—ওরে বাবা! রাগের মাথায়ও অবনীকে যে মহাপুরুষ করে তুলছো তুমি।

শিশির।—অবনী কত বড় স্বার্থপর তা আমার আর জানতে বাকি নেই।

গলার স্বর অস্পষ্ট করে যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো শিশির—সব কিছু পেয়েছে অবনী, সবচেয়ে বড় পাওয়া পেয়েছে, সবচেয়ে সেরা জিনিস! ভাগ্যই বল আর যাই বল…।

সিতা—কি বললে ?

একটা নিষ্পলক গভীর দৃষ্টিকে যেন শিশিরের অন্তর্লোক পর্যন্ত প্রসারিত করে সিতা তাকিয়ে রইল।

চকিতে সিতার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে শিশির বললো—বলছিলাম, অবনী একজন সুবিধাবাদী। সে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী ভড়ং করে।

এক বিচিত্র হেঁয়ালির মধ্যে সিতার সকল কূটপ্রশ্নের অভিযান যেন আবার দিশাহারা হয়ে পড়লো। সিতাকে নিরব দেখে শিশির একটু অনুতপ্তের মত বললো—চুপ করলে কেন সিতা ? আমার কোন কথায় রাগ করলে না তো ? কোন ভুল কথা বললাম কি ?

সিতা—না।

শিশির—তুমি বিশ্বাস কর সিতা, সব ভুল থেকে রেহাই পেয়ে গেছি আমি। আর কোন মোহ নেই আমার।

সিতা যেন শুনতে পায়নি, সোজাসুজি কতগুলি তীক্ষ্ণ মন্তব্য দিয়ে শিশিরকে যাচাই করার জন্য প্রস্তুত হলো।—তুমি কাজ করতে গিয়েছিলে। সেকাজ তোমার সহ্য হয়নি, তাই পালিয়ে এসেছ।

শিশির—পালিয়ে আসবো কেন ? ভাল লাগলো না, চলে এসেছি।

সিতা—তুমি যা কিছু বিশ্বাস করতে, আজ তা সবই অস্বীকার করছো।

শিশির—ভুল বুঝতে পেরেছি, তাই।

সিতা—তুমি আজ ভয় পাচ্ছ, লজ্জা পাচ্ছ, লুকিয়ে থাকতে চাইছ।

শিশির—তুমি যদি তাই মনে কর তবে…।

সিতা—তুমি সব ভরসা ছেড়ে দিয়েছ। নতুন একটি আশ্রয় খুঁজছো।

শিশির—হ্যাঁ সিতা।

সিতা—তুমি বড়লোক হতে চাইছ।

শিশির—ঠিক বড়লোক নয়। প্রয়োজন আছে বলেই টাকার ওপর লোভ আছে।

সিতা—টাকার ওপর লোভ হয়েছে বলেই ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর ওপর তোমার শ্রদ্ধা হয়েছে।

শিশির—ছিছি, বড় রূঢ় কথা বলছো সিতা!

সিতা—রাগ করো না; আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। তোমার পথ হারিয়ে গেছে, তাই নতুন পথ খুঁজছো।

শিশির—হ্যাঁ সিতা।

সিতা—তাই তোমাকে হতাশ হয়ে মুষ্‌ড়ে পড়লে চলবে না। নতুন করে কাজের জীবন আবার গ্রহণ করতে হবে।

শিশির—তুমিই বলে দাও সিতা, আমি এখন কি কাজ করতে পারি? তুমি যা বলবে, তাই হবে।

সিতা—তোমাকে কম্যুনিষ্ট হতে হবে। তোমাকে জাগৃতি সংঘে ঢুকতে হবে।

শিশির—এ কাজ আমার দ্বারা হবে কি সিতা?

সিতা—তুমিই এখন এ কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রকাশবাবু, তোমার মত লোক পেলে খুশি হবেন।

কী নিরহংকার হয়ে গেছে শিশির! আর তাকে বাধা দিয়ে আটক করার কোন প্রশ্ন আসে না। একেবারে সোজা সুপথে চলে এসেছে। আর তাকে মিনতি করে কিছু বোঝবার নেই—সে নিজেই সব বুঝে ফেলেছে। আর তাকে ভয় পাবার কিছু নেই—বিদ্রোহ করতে সে ভুলে গেছে।

আর আত্মরক্ষা করারও কোন প্রয়োজন নেই সিতার। কারণ পরাভবের কোন আশঙ্কাও নেই। জয় করবার গৌরবের আশাটুকু পর্যন্ত পরিণাম থেকে মুছে গেছে। সেই অজেয় মানুষটী আজ বিনা সর্তে শুধু কৃপার আশ্রয় খুঁজতে একেবারে কাছে চলে এসেছে। সেই উদ্ধত ব্যক্তিত্ব কত ভাবে নত হয়ে গেছে আজ।

ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়ে যদি ঝড় না আসে—সেই শূন্যতার বিদ্রূপ বড় অস্বস্তিকর। ফাঁকিটা অপমানের মতই মনের ওপর বাজে, একটা বিস্বাদ টেনে আনে। সব পসরা জলে ডুবিয়ে দিয়ে, শূন্য নৌকার মত পুরনো ঘাটে ফিরে এসেছে শিশির।

এভাবে না এসে, যদি দুরন্ত এক দূরান্তরের স্রোতে, ঝড়ের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে, নাগালের বাইরে চলে যেত শিশির, তাও ভাল ছিল। দুঃখ করার, কষ্ট পাবার, একটু নীরবে কাঁদবার তৃপ্তি পেত সিতা।

কার কাছে অভিযোগ করবে, কাকে ধিক্কার দেবে আজ সিতা? —ছি ছি ছি। এত অহংকার তোমার ছিল, তাই না তুমি এত সুন্দর ছিলে? কি হয়ে গেলে তুমি? তোমাকে করুণা করতেও যে আজ কোন তৃপ্তি নেই।

জাগৃতি সংঘের সভায় সিতা আজ যায় নি। শিশির গিয়েছে। ওপরতলায় একটি ঘরে চুপ করে বসে ছিল সিতা। আজ শুধু ভাল করে ভাববার জন্য এই নিরালা অবকাশটুকু বেছে নিয়েছে সিতা। গত তিন-চার দিনের ঘটনাগুলির দিকে যত গম্ভীর হয়েই দেখুক না কেন সিতা—শেষ পর্যন্ত তার হেসে ফেলতেই ইচ্ছে করে। ভদ্রলোক যেন কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এক দৌড়ে ফিরে এল—ভয় পেয়ে, হতাশ হয়ে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে। সিতাও যেন সেই মুহূর্তে এক পুরাতন অপরাধীকে বন্দী করে জয়ন্ত মজুমদার নামে এক প্রহরীর হাতে সঁপে দিয়ে এল। জয়ন্ত

মজুমদারও তাকে যথোচিত স্থানেই নিয়ে চলে গেল, কোন্ সংঘের খোঁয়াড়ে, না ভাগাড়ে, না শ্মশানে !

জীবনে এত আবেগ দ্বন্দ্ব ও সংকটের পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত বঞ্চনাটা এভাবে দেখা দেবে, কখনও কল্পনা করতে পারেনি সিতা। এত অসার, এত হাস্যকর। এ কাহিনী যে কোন গোপন ডায়েরীর পাতায় লিখতেও লজ্জা হবে।

এই প্রহসনের ওপর এখানেই যবনিকা যদি পড়ে যায় তাহলেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে সিতা। জাগৃতি সংঘের আশ্রয়ে থাকুক শিশির। সিতার কাছে আশ্রয় পাবার মত আর কোন ঠাঁই নেই। চরম ভাবে সে ঠকে গেছে। সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ের মত নিরাবেগ নির্মোহ ও শুচিকঠোর হয়ে গেছে সিতা।

মনে মনে একটা আতঙ্কের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে সিতা। শিশির যদি হঠাৎ এখুনি একবার সোজা এখানে চলে আসে, এই নিভৃত সান্নিধ্যের মোহে ভুল করে সিতার হাত ধরতে আসে ? হয় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে, কিংবা ঘর ছেড়ে নিজেকেই পালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই সিতার। সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ ইতিহাসকে আবার কখনও নতুন করে প্রশ্রয় দিতে পারে না সিতা।

এই দাঁড়ালো শেষে ! প্রতি মুহূর্তে সিতাকে অতীতের একটা ব্যগ্র বন্ধন থেকে শুধু স্পৃশ্যতা বাঁচিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। সর্বদা সাবধানে থাকতে হবে। এই তার ভবিষ্যৎ ! প্রতি মুহূর্তে অদৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষার চারিদিকে একটা টিটকারি শুধু টিক্‌টিক্ করে বাজতে থাকবে ! স্বপ্নে জাগরণে পলে পলে স্মরণ করিয়ে দেবে তার ভুল, তার ব্যর্থতা, তার প্রায়শ্চিত্ত।

এত শাস্তি সইবার কোন প্রয়োজন নেই। সিতার মন থেকে এই

দুর্বলতার খাদ হঠাৎ পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মনের ভেতর একটা সংকল্প গুপ্ত ছুরিকার মত ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। এ বন্ধনের গ্রন্থি এখানেই চিরকালের মত ছিন্ন করে দিতে হবে—সবার আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এভাবে ডুবতে চায় না সিতা। ডুবতে হলে কোন ক্ষেপা গাঙের জলের ঘূর্ণিই ভাল। হাঁটু জলে ডুবে মরে কোন সুখ নেই।

গুরুদয়ালবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন। ফিরে আসতে আর বেশী দেরি নেই। ফিরে আসুন, তারপর কোন অস্পষ্টতার লজ্জা না রেখে শেষ অনুরোধ জানিয়ে দিতে হবে তাঁকে।—পারুলদির চিঠির কোন উত্তর দিও না বাবা। আমার সর্বনাশ করো না।

দুর্বহ ক্লান্তির মত চিন্তাগুলি সিতাকে অবসন্ন করে ফেলছিল। গুরুদয়ালবাবুর গাড়ি এসে সশব্দে বারান্দার কাছে দাঁড়িয়েছে, সশব্দে গ্যারেজে চলে গেছে। গুরুদয়ালবাবু তাঁর লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন, চাকরদের সঙ্গে কথা বলেছেন, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তবু কোন সাড়া পায়নি সিতা। সিতার সমস্ত সত্তা যেন বধির হয়ে বসেছিল। শুধু জয়ন্ত মজুমদারের একটা অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী সিতার সমস্ত চিন্তা জুড়ে সগর্বে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছিল—'তুমি শুধু নিজেকেই ভালবাস সিতা'। কি ভয়ানক অথচ কি সত্য লোকটার কথাগুলি!

সিতা বুঝতে পারলো, সে কাঁদছে! নিজেরই ওপর রাগ করে ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। চোখ মুখ ধুয়ে সুস্থির হয়ে, টেবিল পাখার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে, একটা ছবির এলবাম টেনে নিয়ে শান্ত মনে বসলো।

—সিতা!

একটা আর্তস্বরে চমকে উঠে সিতা দেখলো শিশির এসেছে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্বাভাবিক রকম শান্ত স্বরে সিতা বললো।—আমি আজ বড় অসুস্থ। তুমি লাইব্রেরী ঘরে যাও, বাবা আছেন।

অস্বাভাবিক রকম বিচলিত স্বরে শিশির বললো।—আমি আর কোন ঘরে যাব না সিতা। শুধু তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

আতঙ্কগ্রস্থ আঘাত-জর্জরিত ও উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছিল শিশিরকে। সিতা একটু বিস্মিত হয়ে দেখছিল। শিশিরের চোখের দৃষ্টিটাও অস্বাভাবিকতায় কেমন কঠোর হয়ে উঠেছে।

সিতা বললো।—আমার কাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে কি?

শিশির।—হ্যাঁ সিতা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তাই তোমার কাছেই শুনতে চাই।

সিতা।—কি?

শিশির।—এই জাগৃতি সংঘ, কিসের সংঘ সিতা?

সিতা।—তুমি কি এখুনি……।

শিশির।—আমি এখুনি জাগৃতি সংঘের এক জরুরী বৈঠক থেকে আসছি।

সিতা।—কি হয়েছে?

শিশির।—দেখলাম জাগৃতি সংঘের পত্রিকায় আমার নাম বের হয়েছে।

সিতা।—আমি আগেই দেখেছি।

শিশির।—কিন্তু এসব কি লিখেছে আমার নামে? আমি তো জাগৃতি সংঘে মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছি। পত্রিকায় লিখেছে পাঁচশো টাকা। এ কি ব্যাপার সিতা?

হাসি চাপতে গিয়ে মুখ নামিয়ে ফেললো সিতা।

শিশির।—কোত্থেকে টাকা পায় এই সংঘ? খরচের হিসাবটার সাফাই দেবার জন্যই কি এই গোঁজামিল? আমি বুঝতে পেরেছি সিতা, চুরি ডাকাতির চেয়ে খারাপ উপায়ে টাকা যোগাড় করে সংঘ।

সিতা।—তা আমি কি ক'রে বলি?

শিশির।—'বীটোফেন ও তানসেনের প্রতিভাকে একত্রে বাঁটিয়া লইলে যে প্রচণ্ড প্রতিভা হয়, তাহাপেক্ষা উচ্চতর প্রতিভা যাঁহার আছে, সেই স্বরশিল্পী শিশির রায় জাগৃতি সংঘের আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন'...... এসব অসত্যের মত কথা ওরা কেন লিখেছে সিতা?

সিতা।—ভালই তো। বিনি পয়সায় নাম কিনছো।

শিশির।—'কমরেড শিশির রায় গত তিন মাসে পাঁচ হাজার পল্লী-বাসীকে পঙ্কবাহিনী কংগ্রেসীদিগের খপ্পর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন'...... এই সব আবোল তাবোল মিথ্যা কথা জাগৃতি সংঘের কাগজে লেখা হয়েছে কেন?

সিতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল—তুমি যদি নিজে না বুঝতে পার, আমি কি ক'রে বলি?

শিশির কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিতা বার বার তিনবার শিশিরের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল।

শিশির।—আমি যাই সিতা। ভেবেছিলাম, তুমি অন্ততঃ সত্য কথা বলবে। যাক্...... ।

শিশির দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সিতা ডাকলো।—শোন।

শিশির থামলো, মুখ ফিরিয়ে তাকালো। শিশিরের উদ্দীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে সিতা কিছুক্ষণ কথা বলতে ভুলে গেল। সেই অহংকার মাথা হারানো মুখচ্ছবিটি যেন আবার কুড়িয়ে পেয়েছে শিশির।

মৃদু ভয়জড়িত স্বরে সিতা আস্তে আস্তে বললো—আমি সত্যিই কিছু জানি না শিশির। আমাকে জিজ্ঞেসা করো না।

শিশির।—সংঘের এত বড় অন্তরঙ্গ সভ্যা হয়েও তুমি কিছু জান না, একথা বললে……।

সিতা।—আমি কারও অন্তরঙ্গ নই শিশির। সে ক্ষমতা আমার নেই। বোধ হয় সেই যোগ্যতাও নেই।

শিশির।—তাহ'লে তুমি মিছামিছি……।

সিতা।—তা বলতে পার শিশির। হ্যাঁ, তোমার কথাই সত্যি। ডায়মণ্ড হারবার রোডে আমি মিছামিছি বেড়াতে যাই, তেমনি জাগৃতি সংঘেও মিছামিছি যাই। আমার সব কিছু মিথ্যা। শুধু এই কথাগুলি তোমায় সত্যি করে বললাম। বিশ্বাস কর।

শিশির।—শুনে খুশী হলাম সিতা। এবার উঠি।

সিতা।—আবার এস।

শিশির।—কেন ?

সিতা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মনের এত সাধের বিশস্ত একটা সিদ্ধান্তকে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে যেন কথাটা বলে ফেলেছে শিশির। সিতা দেখছিল—সেই উদ্ধত মনুষ্যত্ব যেন সব মিথ্যা করুণা ও সৌজন্যের ছলনাকে অবজ্ঞা করে আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

সিতা।—না আসবার কি কারণ থাকতে পারে ?

শিশির।—এখানে আসবার কোন কারণ ছিল না সিতা। সোজা পথে হেঁটে এখানে কোনদিন আসতে পারি নি। চোরাপথে পালিয়ে এসেছিলাম এখানে। সে-কাহিনী কিছুই তোমার অজানা নেই।

সিতা চুপ করে শিশিরের কথাগুলি শুনছিল। মাথা হেঁট করে

বসেছিল। শিশিরের কথাগুলিকে যেন অন্ততঃ এই মুহূর্ত টুকুর মত সে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ অভিবাদনে বরণ করে নিতে পারছে।

মুখ তুলে সিতা বললো।—তুমি একটু বসো শিশির। যাবেই তো, একটু বসলে সময় ফুরিয়ে যাবে না।

শিশির।—সত্যি আমার সময় ফুরিয়ে যেতে বসেছে সিতা।

সিতার কৌতূহল প্রখর হয়ে উঠলো।—কেন এরকম ছটফট্ করছো? কোথায় যাবে।

শিশির।—নিজের কাছে ফিরে যাব। আর যে আমার অন্য জায়গা নেই সিতা।

সিতা।—জাগৃতি সংঘ তোমার ওপর কোন কাজের ভার দেয়নি?

শিশির।—দিয়েছে। এক অতি মহৎ ও পবিত্র কাজের ভার দিয়েছে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার, সে ভার নেবারও ক্ষমতা হলো না।

সিতা।—তুমি ঠাট্টা করছো।

শিশির।—একটা অভিশাপকে ঠাট্টা করছি, আর কাউকে নয়।

সিতা।—কোন্ কাজের ভার পেলে?

শিশির।—ইন্‌ফরমেশন নামে একটা কাজ। এটাও নাকি জাগৃতি সংঘের কর্মযোগের একটা ফ্রন্ট। অবনীনাথ নামে একটা দুর্বৃত্তের হাঁড়ির খবর যোগাড় করে এনে দিতে হবে সংঘকে। আর খুবই ভাল হয়, যদি অবনীনাথের স্ত্রীকে কোনমতে এনে জাগৃতি সংঘে ভর্তি করাতে পারি। বীটোফেন-তানসেনের চেয়ে বড় সুরশিল্পী কমরেড শিশির রায়ের ওপর এই স্ট্র্যাটেজিক কর্তব্যের দায় ন্যস্ত করা হয়েছে। এত বড় কাজ শিশির রায় ছাড়া আর কে করতে পারে?

সন্ত্রস্তের মত সিতা বলে উঠলো।—তুমি একাজের ভার নিলে?

একটা আনন্দের জ্যোতি শিশিরের বিক্ষুব্ধ মুখের ওপর ঝিলিক

দিয়ে গেল। সিতার সন্ত্রস্ত স্বর কোন সুরের মীড়ের চেয়েও মধুময় হয়ে শিশিরের কানে যেন বেজে উঠেছে।

এই আনন্দের মাধুর্যকে আর একবার যাচাই করার জন্যই বোধ হয় শিশির বললো।—তুমি যদি বল, তবে একাজের ভার নিতে পারি।

সিতা।—না, একাজ নিতে হবে না।

শিশিরের সারা মুখে তার তৃপ্ত ও সুপ্রীত অন্তরের আভা যেন হাসি হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।—বাঁচালে সিতা। তোমার মনের এই মনুষ্যত্বের প্রতিধ্বনিকে আমি চিরকাল মনে রাখবো। তোমাকে ঘৃণা করার দুঃখ যেন জীবনে না পাই। তোমার কথাই সত্য হবে। শুধু একাজ নয়, জাগৃতি সংঘের কোন কাজ আমার সইবে না।

পরমুহূর্তে মাত্রাহীন ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো শিশির।—মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে তোমার বাড়িতে এসে ঢুকেছিলাম। তোমার বাড়ি থেকে জাগৃতি সংঘে গিয়েছিলাম। আমার সেই পলাতক মনুষ্যত্বের মাথায় লাঠির বাড়ি পড়েছে আজ। তাই আবার ফিরতি পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। জাগৃতি সংঘ থেকে চরম বিদায় নিয়ে তোমার বাড়িতে এসেছি। এখান থেকে চরম বিদায় দিয়ে আবার পথে গিয়ে দাঁড়াবো।

সিতা।—তারপর ?

শিশির।—জানি না।

সিতা উঠে এসে শিশিরের হাত ধরলো। সিতার চেতনা যেন হঠাৎ ঘুম-ভাঙা অস্ফুট কাকলির মত ভাষা ধরে শিশিরের কানের কাছে গিয়ে সাগ্রহে অনুনয় করলো।—তুমি শান্ত হয়ে বসো। যার কাছে বিদায় না নিয়ে তোমার চলে যাবার অধিকার নেই, সে তো এখনও তোমায় বিদায় দেয়নি শিশির !

শিশির বিচলিত হয়ে পড়লো।—বিদায় না করে দিয়ে তার উপায় নেই। তার দোষ নেই। ডোভার লেনের বসুভবনের সেফ ডিপজিট ভল্টে বন্দী হয়ে তার আত্মা ধুকধুক করছে। পথের ধূলোয় এসে দাঁড়াবার তার সাধ্য নেই। সে হয়তো কোন হাঘরে গানের মাস্টারকে ভুল করে ভালবাসতে পারে, কিন্তু তার জীবনে সঙ্গিনী হতে পারে না। বড়লোকী প্রেমে এ চুরিটুকু না থেকে পারে না সিতা। এটাই নিয়ম।

সব ভুল হয়ে গেল সিতার। দুহাতে শক্ত করে শিশিরের গলা জড়িয়ে সিতা যেন তার ভবিষ্যৎকে বন্দী করে ধরলো।—বিদায় নেবার ছুতো করে তুমি আজ আমায় অপমান করতে এসেছ শিশির? এত করেও তোমার সাধ মেটে নি? দাম্ভিক, নিষ্ঠুর, হিংসুক, রাগী, অকৃতজ্ঞ……।

শিশির একটু বিড়ম্বিত ভাবেই বলে উঠলো।—ভুল করো না সিতা। আমার সব আবার গোলমাল করে দিও না।

সিতা। -আমি তোমার সর্বনাশ করবো।

শিশির।—এসব কি বলছো তুমি?

সিতা।—হ্যাঁ, এখুনি এইখান থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাব লাইব্রেরী ঘরে, বাবার সাম্‌নে। দেখি তুমি কত বাধা দিতে পার?

শিশির।—বাবার সাম্‌নে? কেন?

সিতা।—আজ প্রথম আমরা দু'জনে মিলে বাবাকে প্রণাম করবো।

শিশির।—কিন্তু……।

সিতা।—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।

শিশির।—কিন্তু তারপর?

সিতা।—তারপর আর কিছু নেই?

শিশির।—তারপর যে অনেক কিছু রয়েছে সিতা। গানের মাস্টারের ছোট ঘর……।

সিতা যেন নিজের দুঃসাহসের গর্বে ও আনন্দেই শুধু হাসছিল। এ তার আত্মহত্যা না নবজন্ম, এই বোধটুকু যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে। —তুমি বৃথা ভয় দেখাচ্ছো শিশির। আর কি ভয় দেখাবে? দু'বেলা রান্না? হিসেব করে খরচ করা? সস্তা দেখে জিনিস কেনা? কাপড় কাচা, বাসন মাজা?

শিশির একটু বিরক্ত হয়ে বললো।—আরও আছে সিতা? ডোভার লেনের বসুভবনের বাইরের পৃথিবীটা শুধু কাপড়-কাচা বাসন-মাজার পৃথিবী নয়।

সিতা।—বল।

শিশির।—আমাকে আবার গান গাইতে হবে। গানের একটি স্কুল খুলবো আমি। রামচন্দ্র নামে আমার একটি ছাত্র আছে এক দূর পাড়াগাঁয়ে। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আনতে হবে। গাঁয়ের পথঘাট খুঁজে রামচন্দ্রের মত যত ছাত্র পাব, সবাইকে এনে আমার স্কুল ভরে ফেলতে হবে। স্কুলের জন্য টাকা যোগাড় করতে হবে। তার জন্য যত কিছু দুঃখ ক্লেশ······।

সিতা।—বেশ তো, টাকা পাবে।

শিশির।—কে দেবে টাকা?

সিতা।—আমি।

তীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে সিতার দিকে তাকিয়ে শিশির বললো—তুমি টাকা দেবে কোথা থেকে সিতা?

সিতা কি একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করে থেমে গেল।

শিশির একটু রূঢ় হয়ে বললো।—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, তুমি বোধ হয় ভবিষ্যৎটা এখনো অনুমান করতে পারছো না সিতা।

শিশিরের কথার আঘাতে সেই দীন ভবিষ্যতের রূপটা যেন মুহূর্তের

মত সিতার বর্ণান্ধ কল্পনার চোখ ছুটিকে খোঁচা দিয়ে গেল। সে ভবিষ্যৎ নিতান্তই গানের মাস্টারের ঘরণীর ভবিষ্যৎ। ডোভার লেনের বসু-ভবনের সোনার নাড়ীর সঙ্গে সে ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই।

সকল প্রসঙ্গ প্রশ্ন ও উত্তরের আবর্তের মধ্যে পড়ে সিতার ভাবনার দুঃসাহস হঠাৎ কেমন নাকাল হয়ে যায়। নিতান্ত অবান্তরভাবেই হঠাৎ মনে পড়ে নিরুপমার কথা। সিতারই স্কুলের বন্ধু সহপাঠিনী নিরুপমা। নিরুপমা ছিল সবচেয়ে সুন্দর দেখতে, গানে সেলাইয়ে ও পড়ায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পেত নিরুপমা। এখনো নিরুপমাকে মাঝে মাঝে দেখতে পায় সিতা। হাজরা রোডের ফুটপাত দিয়ে দুপুরের রোদে একটি ছোট ছেলে কোলে করে হেঁটে হেঁটে মাসিমার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে নিরুপমা। রিক্সা দূরের কথা, বাসেও চড়ে না নিরুপমা। কোন্ এক কাপড়ের দোকানে কাজ করে নিরুপমার স্বামী। সিতার জানতে ইচ্ছে করে, এ ভবিষ্যৎ কি আগে বুঝতে পারেনি নিরুপমা? এবার পথে দেখা হলে একবার জিজ্ঞেসা করবে সিতা—এ দুঃখ কি করে সইতে পারছে নিরুপমা।

শিশির।—তুমি কি সত্যি ভাবনায় পড়লে সিতা?

সিতার মনের গোপনের কতকগুলি অপরাধী চিন্তার ছদ্মবেশ রূঢ়ভাবে ছিঁড়ে দেবার জন্য শিশিরের প্রশ্নটা বিদ্রূপের মত বেজে উঠলো। একটা শিথিল নিশ্বাসের শিহর কোন মতে সংবরণ করে সিতা যেন নিজেকে প্রেরণা দেবার জন্য বললো।—না না। কোন ভাবনার ধার ধারি না আমি। তোমার গানের স্কুলের দিন দিন উন্নতি হবে। তার জন্য যদি আমাকে……।

শিশির।—তার জন্য আমার সঙ্গে সব দুঃখ কষ্ট শ্রম ভাগ করে নিতে হবে তোমাকে। আমি যখন থাকবো না, তখন তুমিই সব দায় তুলে নিয়ে স্কুলকে বাঁচাবে।

নিবিড়তর আবেগে শিশিরের গলা জড়িয়ে ধরে সিতা রাগ করে বললো।—থাকবে না? এ-সব কী জঘন্য কথা বলছো শিশির? ভয়ানক দুর্মুখ হয়ে উঠেছো তুমি। তোমাকে চিরকাল এমনি করে আমার কাছে আড়ালে আড়ালে আপন করে রাখবো শিশির।

শিশিরের চোখের তারা দুটো বিস্ময়ে ও বেদনায় স্তব্ধ হয়ে রইল। এক শূন্য সংকেতকুঞ্জের প্রবঞ্চনার দিকে তাকিয়ে যেন শিশির বললো।—এ কি বলছো সিতা? তোমার কাছে? আড়ালে আড়ালে? এর মানে?

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শিশির বললো।—তোমার কিছুতেই ভুল ভাঙছে না সিতা! আমি যে আবার কাজের জীবনে ফিরে যাব। তোমাকেই নির্ভুল হয়ে আমার সঙ্গে আসতে হবে। আমার কাজকে প্রিয় করে তুলবে যে, তুমি সেই প্রিয়া হবে……।

সিতা।—আবার তোমায় কাজের নেশায় পেয়েছে শিশির। জীবনে কাজের চেয়ে কি বড় কোন নেশা নেই?

শিশিরের মুখের ওপর ভাসা-ভাসা দুটি চোখের বিহ্বলদৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়ে সিতা তাকিয়ে রইল।

দুঃসাহসী লুণ্ঠকের মত সিতাকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরলো শিশির। সেই সঙ্গে যেন প্রচ্ছন্ন একটা হারিয়ে ফেলার ভয়ে ভীত হয়ে শিশিরের কথাগুলি করুণ আবেদনের মত বেজে উঠলো।—আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব সিতা। কোন বাধা আমি গ্রাহ্য করবো না।

সিতা।—কে বাধা দিচ্ছে তোমায়?

শিশির।—এই বস্থ-ভবনের মোহ। এই মোহ তোমার সব ভালবাসাকে ভুল করিয়ে দিচ্ছে সিতা। তোমার নিঃশ্বাসে মিথ্যা ভয়

ছড়িয়ে দিয়েছে এই বসু-ভবনের মায়া। এই ভয় ভেঙে যাক্ তোমার। আমি বলছি, তুমি সুখী হবে সিতা।

সিতা।—তা মিথ্যে বলনি শিশির।

ভয়ার্ত গুঞ্জনের মত সিতার কথাগুলি গুন্‌গুন্ করে উঠলো।

শিশির।—যে পৃথিবীতে তোমায় নিয়ে যাব সিতা, সেখানে গিয়ে তুমি ঠকবে না। এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

সিতা।—কোথায় নিয়ে যাবে ?

সিতার পরিচিত খেলার পৃথিবীটাকে কেড়ে নেবার জন্য যেন কেউ নিষ্ঠুরের মত টানছে। প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসের সুরে সিতার কথাগুলি কাতর প্রতিবাদের মত শোনালো।

শিশির।—তোমাকে একেবারে নতুন দেশে নিয়ে যাব সিতা। আমার নতুন গান, আমার নতুন গানের স্কুল, নতুন সুখ-দুঃখ, নতুন প্রীতি স্নেহ বন্ধুত্ব, নতুন সংগ্রাম, নতুন সংঘ—সব দেখতে পাবে তুমি ?

সিতা।—এত নতুন কোথায় পেলে তুমি ?

দুর্লঙ্ঘ্য এক সংশয়ের প্রাচীরের ওপারে দাঁড়িয়ে সিতা যেন শিশিরের সকল আকাঙ্ক্ষাকে মিষ্টি ভাষায় তুচ্ছ করে উঠলো।

শিশির।—সব পেয়েছিলাম একদিন, আবার ফিরে পাব।

কোন উত্তর না দিয়ে নিঝুম হয়ে রইল সিতা। জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তকে আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে। জয় করা হয়ে গেছে। এক বিজয়িনীর প্রসন্নতা তাকে আত্মহারা করে যেন এই মুহূর্টিকে ভিন্ন কোন গ্রহলোকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখানে পৌঁছে শিশিরের কোন প্রশ্ন আর শুনতে পাচ্ছে না সিতা। আর যেন শোনবার প্রয়োজন নেই। মানুষের মত একটা মানুষকে পরাভূত করে বসু-ভবনের সিতা বসুর অভিজাতক প্রেমের আত্মা এতদিনে তৃপ্ত হয়েছে।

শিশির ডাকলো।—কথা বল সিতা।

উত্তর দিতে ভুলে গেল সিতা। শিশিরের সাগ্রহ বাহুবন্ধন একটা দুঃসহ জ্বালার ছোঁয়া লেগে খুলে পড়লো।

শিশির আবার ডাকলো।—তুমি আমার সব অনুরোধ এড়িয়ে গেলে সিতা।

এই ক্ষণিকের বিমনা আবেশ থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠে সিতা বললো।—সবার কাছ থেকে কেড়ে, তুমি এত আপন করে কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাও শিশির? আমাকে নিয়ে এত গর্ব করার কি পেলে তুমি?

এতদিনে অকপট হয়েছে সিতা। এইখানে এইভাবে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে সিতা। এই বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে চিরকাল এমনি করে মায়া ছড়াবে, ক্ষণে ক্ষণে তার ব্যক্তিত্বের মূল্যকে মদের পেয়ালার মত চুমুক দিয়ে আস্বাদ গ্রহণ করবে, হাসবে কাঁদবে, হা-হুতাশ করবে, তবু এক পা নড়তে পারবে না সে। তার জীবনের ধর্ম তাকে বাধা দেবে। সিতা যাবে না।

নিঃস্ব পথিককে হত্যা করে ডাকাত যেভাবে ব্যর্থতা-জর্জর দৃষ্টি নিয়ে পথিকের শূন্য থলির দিকে তাকিয়ে থাকে, শিশিরের চোখের দৃষ্টিটা তেমনি। সিতা তার বুক ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে—শুধু একটা মেয়ে মানুষের শরীর। এত ক্লেশ ক্ষতি অপচয়ের বিনিময়ে এই তার পাওয়া! এরা শুধু ঐশ্বর্যের নারী, এদের নারীত্বে কোন ঐশ্বর্য নেই। প্রেমের অপমান করার সুখের জন্যই জীবনে এদের প্রেম প্রয়োজন। সোনার সুতোয় গাঁথা নকল ফুলের মালা মাত্র এরা।

শিশিরের মনের ভেতর এক প্রহরী যেন ডাক দিয়ে গেল, সাবধান করে দিল। তোমাকে সব দিক দিয়ে জয় করে এক কৈতবিনীর হৃদয় নিজের গরবে আত্মহারা হয়ে গেছে। তার কাজ ফুরিয়ে গেছে। ভেঙে

করার জন্যই সে তোমাকে এতদিন সোহাগে অনুরাগে, মানে ভিমানে, অনুরোধে আর প্রতিশ্রুতিতে বড় করে সাজিয়ে নিয়েছে। ই কীর্তির স্মৃতি এক অক্ষয় অহমিকা হয়ে সিতার জীবনের পথে আনন্দ গিয়ে যাবে চিরকাল। তোমার শ্রেণী সমাজ পৃথিবীর শ্রদ্ধা খর্ব করে িয়ে এই লক্ষপতি ব্রোকারদুহিতার প্রেমের খেয়াল নির্লজ্জভাবে সরে ড়েছে। আর দেরি করা উচিত নয়। এইবার তাকে টেনে নামিয়ে াও—একেবারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র নগণ্য করে নাও। সুযোগ হারিয়ো না। সই সব চেয়ে বড় সত্য কথাটা বলে দাও।

শিশির বললো।—তোমাকে নিয়ে সত্যিই গর্ব করতে পারতাম সিতা, দি আজ এখান থেকে……।

সিতা।—বল।

শিশির।—যদি আজ তোমায় হাত ধরে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতাম, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, বলতে পারতাম যে আমিও……।

সিতা।—কোথায় ?

শিশির।—অবনীনাথের কাছে। অবনী দেখতো, জীবনে আমি ব্যর্থ হয়ে যাইনি। মানুষের গান ও প্রেমকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে আমি ফিরে এসেছি। আমার সকল পরীক্ষার ক্লেশ শেষ উপহারের প্রসাদে ধন্য হয়ে গেছে। অবনী দেখতো, আমিও অরুণার মত একটি গর্বকে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সিতা যেন এই দুঃখস্বপ্নের মধ্যে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো।—অরুণার মত ? কে সে ?

শিশির।—অরুণা,—অবনীনাথের স্ত্রী অরুণা।

এক ভয়ংকর প্রবঞ্চনার বিভীষিকাকে মিথ্যে করে দেবার জন্যে চোখ

বুঁজে, উতলা নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য গুছিয়ে আস্তে আস্তে সিতা বললো—এতদিন কি অরুণার মত একটি গর্বকে শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—তুমি চাও, সিতা বসু প্রাণে রূপে গুণে অরুণার মত হয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবে?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—জীবনে অরুণাকে না-পাওয়ার শূন্যতা সিতাকে দিয়ে পূর্ণ করতে চাও?

শিশির।—হ্যাঁ, তবে শুধু সিতাকে দিয়েই। আর কাউকে দিয়ে নয়।

সিতা।—কিন্তু সিতা যে কখনো অরুণা হতে পারবে না। সিতা সিতাই থাকবে চিরকাল।

শিশির।—আজ আমি তাই বিশ্বাস করছি সিতা।

সিতা দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালো। এতক্ষণে যেন সে একটা তপ্ত পাথরের মূর্তিকে ভুল করে জড়িয়ে ধরেছিল।

ডানা-ভাঙা পাখির মূর্তির মত করুণ হয়ে একটা চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে মাথা হেঁট করে বসেছিল সিতা। তার আকাশের আশা মিথ্যা হয়ে গেছে, মাটীতে বঞ্চনা। তার অনুতপ্ত চৈতন্য যেন এক মুহূর্তে শতবার মার্জনা ভিক্ষা করে বসু-ভবনের সোনার খাঁচার আশ্রয়টুকু প্রার্থনা করছে।

লাইব্রেরী ঘর থেকে গুরুদয়ালবাবু তখন চেঁচিয়ে ডাকছিলেন—সিতা সিতা।

ডোভার লেনের বসু-ভবনের বাইশ বছরের বাৎসল্যের ইতিহাস লুণ্ঠিতা সিতাকে বুকে তুলে নেবার জন্য যেন উল্লাসে আহ্বান করছিল।

সিতা সাড়া দিয়ে উঠলো।—যাই বাবা।

শিশির বললো।—আমিও এইবার যাই।

ব্যস্তভাবে দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সিতা বললো।—চলুন।

সিঁড়ির মুখে এসে অনাহূত অতিথির মত বিব্রত শিশিরের মূর্তিটা তর্‌ তর্‌ করে নীচে নেমে গেল। সিতা চলে গেল অন্যদিকে, তার চিরদিনের পরিচিত কার্পেট-পাতা বারান্দার পথে, লাইব্রেরী ঘরের দিকে।

যেন এক রাজদীঘির পচা পানা ছেঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাজধানী কলকাতার যত পথ ও পার্কের অপহৃত শ্রী আবার ফিরে এসেছে। সেই আবর্জনার মত নিরন্ন জনতার বীভৎস সমারোহ আর নেই। হাওয়াতে মুমূর্ষুর হিক্কার শব্দ আর নেই, গলিত শবের উপদ্রব ক্ষান্ত হয়ে গেছে। ধনিকের নীড় শহর কলকাতার সভ্যতার পথে যেন এতদিন ব্যারিকেড তুলে উদ্বাস্তু উপার্জনহীন অন্নবঞ্চিত ও অর্ধোলঙ্গ গেঁয়ো অভাগা আর অভাগিনীর দল সবাকার শান্তি ক্ষুণ্ণ করছিল। সব চেয়ে বেশী হোঁচট খাচ্ছিল মিলিটারি লরির চাকাগুলি, বোধ হয় পদে পদে যুদ্ধোদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছিল। তাই তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্লেগের ইঁদুরকে যেভাবে খাঁচায় ভরে লোকালয়ের সীমার বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। শুধু মুক্তি দেওয়া হয়েছে জাত ভিখিরীদের, দুঃস্থ গেরস্থের শত দুঃখের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য বেছে বেছে ভিখিরী নামে অমানুষগুলিকেই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু যারা মানুষ, যারা প্রজা, যারা রাজস্ব যোগায়—পথকর জলকর থেকে সুরু করে প্রতি নিশ্বাসের জন্য কর দিয়ে যারা রাজকোষের ঐশ্বর্য অটুট রাখে, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু তাদেরই। পড়ো ভিটে,

শস্যহীন মাঠ, বীজ-বলদ-লাঙলবর্জিত শূন্য খামায়, মারী আর মড়কের উচ্ছন্নতার মুখে তাদের এক আইনের ঠেলায় ঠেলে নিয়ে গেছে। বাঁচবার হয় বাঁচবে, মরবার হয় মরবে, তার জন্য অবশ্য আইনের কোন দায়িত্ব নেই। রাজধানীর ছিরিটুকু বজায় থাকলেই হলো।

কিন্তু মড়ার বাংলা মনেপ্রাণে জানে যে সোনার কলকাতায় খাবার আছে। তাই তাড়িয়ে দিলেও তারা আবার ফিরে আসে। না এসে উপায় নেই। রেল লাইন ধরে, খালের পাশ দিয়ে, মাঠে, ঝোপ-ঝাপের আড়াল দিয়ে তারা আবার আসতে থাকে।। হয়তো তারা আসতো না, কিন্তু কারা যেন তাদের কানে কানে মন্ত্র পড়ে দিয়ে গেছে—এস এস, সবাই এস। এই রাজধানী কলকাতার যত চুরি ফাঁকি আর ভণ্ডামি তোমাদের সর্বনাশের মূল। যত চোরের আড্ডা এই শহরে। তোমাদের ক্ষেতের ধান লুঠ করে নিয়ে তারা এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। কলকাতাকে আরামে ঘুমোতে দিও না তোমরা। লোভী কলকাতার উজীরালি দালালি মজুতদারি, কলকাতার সাহিত্য শিল্প গান ফূর্তি হাসি —সব কিছুকে প্রতিমুহূর্তে বিব্রত কর অতিষ্ঠ করে তোল। ভাতের দাবি ছাড়বে না কেউ। তোমরা কোন অপরাধ করনি, তোমাদের মেরে কারও বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এস, দাবি কর, লড়াই কর, সত্যাগ্রহ কর—আইনের ফাঁকির বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াও।

অবনীর চাকরি নিয়ে পিসিমার নিত্য দুশ্চিন্তা আর গঞ্জনা মাঝে মাঝে বাড়ির আবহাওয়া বড় উত্যক্ত করে তোলে। অবনীর চেয়ে অরুণাকেই পিসিমার অনুযোগের আক্রমণ সইতে হয় বেশী। আজকাল নতুন একটা উদ্বেগ পিসিমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। অবনী বাইরে বের হয়ে গেলেই পিসিমা অরুণার কাছে প্রায়ই কথাটা একবার উত্থাপন করেন।—হিমাংশুর ছেলেমেয়েগুলো সদাসর্বদা দিদিমা দিদিমা করছে।

অরুণা বলে।—হিমাংশু কে ?

পিসিমা।—আমাদের হিমাংশু, আবার কে ?

অরুণা মনে মনে অনেক চেষ্টা করেও তার তিনকুলের কুটুম্বিতার শেষ সীমানা পর্যন্ত খুঁজেও কোন হিমাংশুকে আবিষ্কার করতে পারে না।

পিসিমা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন।—তোমাদের পিসের মাসতুতো দাদার আপন খুড়োর ছেলে ক্ষিতীশ।

অরুণা যেন নিঃশব্দে হাঁ করে তাকিয়ে পিসিমার বংশতত্ত্বের বিশ্লেষণটা দেখতে থাকে।

পিসিমা বলেন।—ঐ ক্ষিতীশের ছেলে হলো হিমাংশু, পাটনায় থাকে। হিমাংশু চিঠি দিয়েছে, তার ছেলেমেয়েরা শুধু দিদিমা দিদিমা করে। ছোটগুলো নাকি কান্নাকাটিই সুরু করে দিয়েছে !

অরুণা জানে, কদিন হলো পিসিমার একটি চিঠি এসেছে। ঠিক চিঠি নয়, খুব সম্ভব চিঠির উত্তর। আজ বোঝা গেল, পাটনা থেকে হিমাংশু বাবুই লিখেছেন। পিসিমা এক এক সময় হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়েন, আক্ষেপ করতে থাকেন।—আমার নাতিরা কাঁদছে সেখানে, অথচ এমনি কপাল করেছি যে একবার যাবারও উপায় নেই।

এই অভিনব পাটনাই নাতিদের জন্য পিসিমার বিচ্ছেদবেদনা অরুণাকে শুধু হতভম্ব করে দেয়। একটা দীনতার লজ্জায় সারা মন ছোট হয়ে আসে। পিসিমার আচরণে তবু এক তিল ক্ষুব্ধ হয় না অরুণা। বুঝতে পারে, কোন দোষ নেই পিসিমার, কোন দোষ নেই।

শেষ পর্যন্ত পিসিমার ধিক্কার বড় কঠোর হয়ে বেজে ওঠে। অরুণাকে নিভৃতে পেলে, পিসিমা একটু উত্তেজিতভাবেই মালা হাতে সুমুখ দিয়ে একবার ঘুরে যান। যেতে যেতে বলেন।—এ কি রকম সংসার তোমার অরুণা ?

অরুণা বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করে।—কি হলো পিসিমা ?

পিসিমা।—বড় লক্ষ্মীছাড়া তোমার সংসার অরুণা। শুধু নেই নেই নেই। চাল নেই, ডাল নেই, পূজো পার্বণ নেই, অতিথি কুটুম নেই, একটা কচি ছেলের সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই তোমার বাড়িতে। এত নেড়া সংসারে কি আমার মত মানুষ বাঁচতে পারে অরুণা ?

অরুণা মাথা হেঁট করে পিসিমার সব অভিযোগের আঘাত বিনা প্রতিবাদেই বরণ করে নেয়। একটু শান্ত হয়ে পিসিমা অন্য ঘরে চলে যান। শুধু শোনা যায়, জপ ছেড়ে দিয়ে পিসিমা উতলা হয়ে আপ্‌সোস করছেন, এক এক সময় ফুঁপিয়ে উঠছেন।—হিমাংশু, হিমাংশু, হিমাংশুর ছেলেমেয়েরা, আমার নাতিরা, আমার নাতনীরা, আমাকে দেখতে চায়, আমার জন্য কাঁদছে। কচি কচি ছেলেগুলো, কোল জুড়ানো ছেলে, একটু দিদিমার আদর পেলে না আজও……।

তিন দিন তিন রাত্রি কোথায় কাটিয়ে দিয়ে আজ ভোরে ঘরে ফিরলো অবনী। ফিরে এসেই ধপ্‌ করে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লো। অরুণা একটা পাখা হাতে করে এগিয়ে এসেই থম্‌কে দাঁড়ালো। মূর্ছার মত মনে হচ্ছে। বুকের ওপর হাত রেখে, চোখ বুঁজে, অসাড়ের মত পড়েছিল অবনী। আস্তে আস্তে নিশ্বাস টানছিল। অবনীর মুখের ওপর অরুণার সন্ত্রস্ত চোখ দুটো একেবারে ঝুঁকে পড়তেই, অবনী আস্তে আস্তে হাত তুলে অরুণার একটা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো।

কোন কথা না বলে, শুধু কলের মত একটানা পাখার বাতাস করে চলেছিল অরুণা।

—অবু এসেছিস্‌ নাকি ? পাশের ঘর থেকে পিসিমার ব্যগ্র প্রশ্নের স্বর কানে যেতেই অবনী একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলো। বাধা দিল অরুণা।—তুমি শুয়ে থাক, ঘুমোও।

পিসিমার প্রশ্নের উত্তর দিল অরুণা।—হ্যাঁ পিসিমা।

মাল্যা ছাড়াই মনে মনে নাম জপছিলেন পিসিমা। তাই সামনে উঠে আসতে পারলেন না। তবু তাঁর ভোরের ধ্যান থেকে থেকে ভেঙে যাচ্ছিল, প্রশ্ন না করে পারছিলেন না।

পিসিমার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।—চাকরি পেলি অবনী?

অরুণা উত্তর দিল না।

পিসিমা।—আশ্চর্য করলি বাবা। মুখ্খু নয়, পঙ্গু নয়, তবু চাকরি জুটবে না, এ কিরকম অদেষ্ট? আমার আর কি? আমার বাঁচলেই বা কি, মরলেই বা কি? কিন্তু তোরা? তোরা কেন এভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে………।

পিসিমার কথাগুলি দুঃসহ এক জ্বালা ছড়িয়ে আজকের ভোরের বাতাসের এত নীরব শীতলতাটুকু যেন শুষে নিচ্ছিল। পিসিমার শরীর ভাল নেই। কাল দুপুরে একবার মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। বড় কষ্ট হচ্ছে পিসিমার। বুড়ো মানুষ, একটুতে কাহিল হয়ে পড়েন। কাল সারাদিনের মধ্যে শুধু একমুঠো ভেজা মুগ খেয়েছেন। আগের দিনটা উপোসে গেছে। তার আগের দিন শুধু কয়েকটা কলা আর এক ঢেলা গুড়। অবনী এখনও জানে না যে, পিসিমা সেদিন হঠাৎ যুগলবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঐ কলা আর গুড় ওখান থেকেই এনেছেন। অরুণা অবশ্য পিসিমাকে এবিষয়ে কোন প্রশ্ন করেনি। তার যেটুকু বোঝবার সেটুকু সে বুঝেছে পিসিমার ক্ষুধালজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে। পিসিমা বলেছেন।—যুগলবাবুর বউ জোর করে গছিয়ে দিল

অবনী নিঝুম হয়ে শুয়েছিল। পাশের ঘর থেকে পিসিমারও আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবনী একবার ছটফট করে পাশ

ফিরতেই অরুণা জিজ্ঞেসা করলো।—শরীরটা কি খুবই খারাপ বোধ করছো ?

অবনী উত্তর দিল।—না, একটু বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অরুণা বললো।—আজ পনর দিনের ওপর হয়ে গেল, জোছুর একটা চিঠি এল না। একটা পৌছন সংবাদও পেলাম না।

উত্তর দেবার দায়িত্বটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই যেন অবনী অন্যদিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অবনীর নিরুত্তরতায় শঙ্কিত হয়ে উঠল অরুণা।—জোছুর খবর পেলে কিছু ? কথা বল অবন্, আমার যে আর ভাল লাগছে না কিছু।

অবনী।—খবর পেয়েছি।

অরুণা।—কেমন আছে জোছু ?

অবনী।—তা আমি জানি না।

দুর্বোধ্য একটা আতঙ্কে শিউরে উঠে অবনীর হাত দুটো চেপে ধরলো অরুণা।—কি ভয়ঙ্কর কথা বলছো অবন্, শীগ্গির বল জোছু কোথায় ?

উঠে বসলো অবনী।—এত ভয় পাবার মত কিছু ঘটেনি। ভালই আছে জোছু।

অবনীর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্বস্ত হলো অরুণা। অবনীর মুখ থেকে ধীরে ধীরে এই শান্ত গাম্ভীর্যের শেষ ছায়াটুকুও সরে গেল। চিন্তার অন্ধকার ঠেলে একটা গোপন পুলকের স্নিগ্ধ স্মিত আভা যেন ফুটে উঠছিল।

অবনী হেসে হেসে বললো।—জোছু আমাদের সবার উপর টেকা দিয়ে গেল।

অরুণার আতঙ্ক তবু নিঃশেষ হয়নি। বললো।—কেন ?

অবনী।—জোছুর ঠিকানা এখন আর পাবে না। ঠিকানা হারিয়েছে জোছু।

অরুণা।—কিছু বুঝলাম না। মোরাদাবাদে যায়নি জোছু?

অবনী।—না। জোছু তার জীবনের কাজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে। তাকে আমরা আর ফেরাতে পারবো না। ফেরারী হয়েছে জোছু। তাকে খুঁজতে গেলে, সে আরও বেশি করে হারিয়ে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিটা সঁপে দিয়ে অবনী যেন দূর দুর্নিরীক্ষ্য কোন গ্রহের উদ্ভাসিত রূপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। সারা মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। অবনী বললো।—আমাদের জোছু এখন দেশের গাঁয়ের পথে পথে গোপন ঝড়ের ছায়ার মত ছুটে চলেছে। মুমূর্ষুরা উঠে দাঁড়াবে, হতাশেরা জয়ধ্বনি করবে। মৃত্যুর ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের জোছু জীবনের বাণী ছড়িয়ে ফিরছে।

শুনতে শুনতে অরুণা যেন এতক্ষণ এক অবাস্তব রহস্যের আবর্তের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল। একটু সুস্থ হয়ে, মনে কৌতুহলগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে অরুণা বললো।—কি কাজ করতে বেরিয়েছে জোছু?

অবনী।—কংগ্রেসের প্রচারে বের হয়েছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অবনী যেন এক দুর্দম্য অহংকারের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো।—আমি বিশ্বাস করি অরুণা, যেপথ দিয়ে যাবে জোছু, দুপাশের যত মানুষের গাঁ গঞ্জ বস্তি কংগ্রেসের শিবির হয়ে যাবে। তারা লড়বে, তারা বাঁচবে। আমাদের মুক্তির মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। আমি তুমি সবাই বেঁচে যাব অরুণা।

দরজার কাছে পিসিমার মূর্তি দেখা দিল। অবনীর চেঁচানি শুনেই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছেন।

অরুণা একটু সরে বসলো। পিসিমা দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে

বললেন।—ঘরে এককণা চাল নেই, বার গণ্ডা পয়সা ফেলে রেখে তিন দিন ঘরের বাইরে কাটিয়ে এলি, একটা চাকরি যোগাড়ের চেষ্টা নেই, তোর কিসের আনন্দ রে অবু? এত বাজে কথা বক্‌ছিস কেন?

অরুণার হাতের দিকে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করে পিসিমা আবার বললেন।—ঐ দেখ, চোখ দিয়ে দেখে নে। এমন কিছু সোনার কাঁড়ি রাখিস নি যে বেচে বেচে দিন চল্‌বে।

হঠাৎ পিসিমার অনুযোগের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে অবনী আর অরুণার মূর্তি দুটোকে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। অবনীর বুকের হাড়, চোখের কোটর, ভাঙা গাল আর শীর্ণ গলার শিরাগুলি। অরুণার ফ্যাকাশে মুখ, ভেজা ভেজা চোখ আর হাতের ঢলঢলে নোয়াটা—কব্জির গিঁটটাও পার হয়ে একেবারে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত নেমে গেছে।

আর কোন কথা বলেন না পিসিমা। যেন প্রচ্ছন্ন একটা বিভীষিকার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। দেশের বাড়িতে, ভরা মানুষের সংসারে এই ক্ষুধাহত বিভীষিকার ছায়াই না তাঁকে দেশছাড়া করে এইখানে এনে ফেলেছিল? আবার এখানেও সেই ছায়া? পিসিমার দুর্বল শরীর কাঁপছিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল। দেয়াল ধরে ধরে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এসে বসলেন পিসিমা। আর কোন কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ ধরে একটা অস্বাভাবিক নীরবতার পর অবনী কথা বললো।—আজ আমার কাছে টাকা আছে অরুণা, ধার করেছি।

অরুণা—ভালই করেছ, তাড়াতাড়ি শোধ করার ব্যবস্থাটা করো।

অবনী।—এ-ধার আমি শোধ করবো না। যার কাছে এই ধার পেয়েছি, চিরকাল তার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে আমার।

অরুণা।—কে ধার দিলে ?

অবনী।—শৈলেশ মিস্ত্রি দিয়েছে। স্বরূপরামের কারখানায় কাজ করে শৈলেশ।

অরুণা।—সেই জন্যেই বুঝি তার টাকা শোধ দেবে না ?

অবনী।—আমি শৈলেশের ঘরের দাওয়ায় বসে সব শুনেছি, সব বুঝেছি।

অরুণা।—কি ?

অবনী।—বুঝলাম, শৈলেশ আর শৈলেশের বউ তাদের ছোট ছেলেটার হাত থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বালা জোড়া খুলে নিল। পেছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল শৈলেশ, বোধ হয় বালা জোড়া বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এল। সেই টাকা আমায় ধার দিয়েছ শৈলেশ।

অরুণার মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। প্রতিবাদ করলো অরুণা।—এটা ভাল কাজ করলে না অবন্! ভাল হলো না। ও-টাকা ছুঁতে আমার ভয় করবে।

অবনী।—আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে অরুণা। জীবনে এভাবে এমন একটি সাহায্য এই প্রথম পেলাম। বড় শখ ছিল, কোন একটা বড় হৃদয়ের কাছে একবার মাথা নিচু করি। শৈলেশ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। শৈলেশকে ঠকিয়ে তার কাছে ছোট হয়ে থাকতে আমার ভাল লাগবে। শোধ দিতে পারবো না।

অরুণা একটু সন্দিগ্ধভাবে বললো।—শৈলেশ হঠাৎ এতটা উদার হয়ে……।

অবনী।—তা জানি না, কেন এত উদার হলো শৈলেশ। তবে শৈলেশ শুধু জানে, একজন দুঃস্থ কংগ্রেসের কর্মীকে সে সাহায্য করেছে। শৈলেশ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—কংগ্রেস লড়বে, স্বরাজ হবে, সবার

দুঃখ দূর হবে। লোক যেমন ধার করেও দেবতার মানত পূর্ণ করে তৃপ্তি পায়, শৈলেশ তেমনি……।

অবনীর গলার স্বর হঠাৎ আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলো।—লোকের নীচতা দেখে মাঝে মাঝে রাগ করে ভুল বুঝে ফেলি অরুণা। মনে হয় এই ভয়ংকর নীচতার শক্তিই বুঝি সবচেয়ে বেশী। কিন্তু হঠাৎ এমন এক-একটা ভরসা পাই যে, আনন্দের সীমা থাকে না। ভুল ভেঙে যায়। তখন দেখতে পাই পৃথিবীতে শৈলেশদের সংখ্যা কম নয়।

পরমুহূর্তে মন থেকে কতগুলি ঘৃণ্য স্মৃতির বিরক্তিকর স্পর্শ ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যই যেন অবনী বলতে লাগলো।—জাগৃতি সংঘের নীচতার দাপট দেখে প্রথমে সত্যিই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম অরুণা। আজ আমি ঐ সংঘটিকে শুধু একটা ছারপোকার বাসা বলেই মনে করি।

অরুণা হেসে ফেললো।—গালাগালি দিচ্ছ কেন? যে যার কাজ নিয়ে আছে, থাকুক। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক।

মনের ভেতর কোন গোপন পরাজয়ের ক্ষত ও বেদনাকে চাপা দিতে গিয়েই বোধ হয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লো অবনী। ছারপোকারা মানুষের রক্ত খেতে পারে, কিন্তু তবু তারা মানুষের চেয়ে বড় জীব হতে পারে না; তারা পোকা মাত্র। তার জন্য কোন চিন্তা করি না। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত মানুষ কি করে ঐ সংঘ আর কম্যুনিস্ট পার্টি নামে একটা জোচ্চোরের দলের কদর্য ফাজলামির মধ্যে তার মনুষ্যত্বকে মানিয়ে নিতে পারছে, এ রহস্যের কোন হদিস খুঁজে পাই না আমি।

অরুণা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অবনীর এই আক্ষেপের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকবে, অনর্থক উত্তেজিত হতে থাকবে, যা মুখে আসে তাই বলবে—বেলা বাড়ছে, স্নানাহারের চিন্তাটাও চাপা পড়ে যাবে

একেবারে। এইখানেই অবনীকে থামিয়ে দেওয়া উচিত একটা অবান্তর প্রশ্ন করার জন্য অরুণা ডাকলো।—শুনছো।

বলতে গিয়েই অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল অরুণা। অবনীর চোখ দুটো জলে ভিজে চিক্‌চিক্ করছিল। ছেলেমানুষের মত ব্যর্থ অভিমানে অবনী যেন একবার ফুঁপিয়ে উঠলো।—ইন্দ্র, আমার ত্রিশ বছরের বন্ধু ইন্দ্র। ছেলেবেলায় ইন্দ্র আমায় ছুরি মেরেছিল। কিন্তু তার মধ্যে অপমান ছিল না। এবার ইন্দ্র আমায় অপমান করেছে। আমাকে ছোট করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ সেই অতি ক্ষুদ্রদের অহংকার বড় করে তুলেছে।

সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অরুণা।

অবনী।—আর শিশিরবাবুই বা কি কুৎসিত কাণ্ড করে বসলেন। ছি ছি ছি।

সন্ত্রস্তের মত চমকে উঠলো অরুণা।—শিশিরবাবু?

অবনী।—হ্যাঁ, শিশিরবাবু এখন জাগৃতি সংঘের সভ্য। সংঘের পত্রিকায় তাঁর নাম দেখতে পেলাম।

অরুণা।—জাগৃতি সংঘের সভ্য শিশিরবাবু? কেন? কবে থেকে? কি হয়েছে শিশিরবাবুর? কবে ফিরে এলেন? জ্বর সেরে গেছে?

অবনী হেসে ফেললো।—কোন দুশ্চিন্তা করো না। শিশিরবাবুর সব জ্বর সেরে গেছে। তিনি এখন বেশ ভালই আছেন। বিপিনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আর ......।

অরুণা।—সাগ্রহে প্রশ্ন করলো।—আর কি?

অবনী।—আরও কিছু শোনবার দরকার আছে কি? মোট কথা, তিনি বোধ হয় এখন জীবনে সুখী হবার আয়োজন করছেন। ডোভার লেনের এক দিদিমণির কথা শুনলাম বিপিনের কাছে। প্রকাণ্ড এক বড়লোকের মেয়ে। বোধ হয় তারই নাম সিতা বসু।

অরুণা যেন স্বগত বলে ফেললো।—জীবনে কি এমন অসুখী ছিলেন তিনি যে, সুখী হবার জন্য হঠাৎ……।

অবনী।—সেসব খবর তো আমি কিছু বলতে পারছি না অরুণা। হয়তো অসুখী ছিলেন কোন কারণে।

ধীরে ধীরে অরুণার মাথাটা হেঁট হয়ে এল। এক পরাজয়ের দুঃসহ ভারে যেন নত হয়ে পড়েছে অরুণা। কোন অপমানের বেদনা অরুণার চোখ দুটোকেও হয়তো মুহূর্তের মত সজল করে ফেলেছিল। অবনীর মনে অবশ্য সে-দৃশ্য দেখার কোন কৌতূহল ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনী আস্তে আস্তে ডাকলো।—দুঃখ করো না অরুণা।

এক উদার আকাশের অন্তর থেকে এক ঝলক ঝিকিমিকি রোদের সান্ত্বনার মত অবনীর কথাগুলি অরুণার সকল চেতনার মেঘভার ঘুচিয়ে দিল। কী দুর্লভ সান্ত্বনা!

অরুণা হঠাৎ ছটফট করে উঠে অবনীর বুকের কাছে মাথাটা গুঁজে দিল।—আমায় মাপ কর অবনু। শীগ্‌গির আমার মাথায় হাত দাও, নইলে আমার অমঙ্গল হবে।

অবনী।—মাপ করে দেবার মত মহাপুরুষ তো নই আমি অরুণা। তাছাড়া তোমাকে মাপ করবো কেন? কি-ভয়ানক এমন অপরাধ করেছ যে মাপ করবো?

অরুণা মুখ তুলে তাকালো।—অপরাধ করিনি আমি? দেখতে পাচ্ছ না অপরাধ?

অবনী।—না।

অরুণা।—সত্যি বলছো?

অবনী।—তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে আমি জানি না অরুণা।

অরুণা। অবন্, তুমি অদ্ভুত মানুষ অবন্……। অবনীর হাত দুটো ধরে যেন আরতির স্তবের মত সুতরল ছন্দে অরুণা আবৃত্তি করছিল।

অবনী।—শুধু দুঃখ রয়ে গেল অরুণা, শিশিরবাবু শেষ পর্যন্ত আমাদের এভাবে ঠকিয়ে হারিয়ে দিয়ে গেলেন।

অরুণা। কেউ ঠকাতে পারবে না তোমাকে। কেউ তোমায় হারিয়ে দিতে পারবে না অবন্।

মাঝরাত্রে বিছানা ছেড়ে অবনী আস্তে আস্তে ডাকলো।—অরুণা।

ঘুমকারত চোখে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে অবনীর হাতটা শক্ত করে ধরে রইল অরুণা।

অবনী বললো।—এইবার আমি যাই অরুণা। সময় হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে অরুণার হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল। অবনীর হাতটা ছেড়ে দিল। নিঃশব্দে অবনীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো অরুণা।

অরুণাকে হাত ধরে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এল অবনী। খিলটা খুললো। দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েই অবনী বললো। —চলি এবার, কপাট বন্ধ করে দাও।

একটা স্বপ্নের আবেশের মধ্যে যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অরুণা বললো—কপাট বন্ধ করতে পারবো না অবন্। তুমি যে আবার ফিরে আসবে।

হাসতে হাসতে বারান্দা থেকে পথে নেমে পড়লো অবনী।

ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার রোডের এক পাশে খেসো মাঠের ওপর একটা লোকের হাতে প্রকাণ্ড এক পতাকা উড়ছিল।

ত্রিবর্ণ পতাকা, যেন তিন রঙের তিনটি বহ্নিশিখার বেণী উড়ছে আকাশে। হাজার শহীদের শোণিতে ধৌত, ভারতের ইতিহাসের সংগ্রামী আত্মার প্রতীক এই পতাকা। কী অদ্ভুত শক্তি আছে এই পতাকায়! যে দেখে সেই সৈনিক হয়ে ছুটে আসে।

যার হাতে পতাকাটা দুলছে, সেই মজবুত কালো জোয়ান লোকটার নাম বিপিন।

মাঠের ঘাসের ওপর অবনী চুপ করে বসেছিল। দু-চারটে দল দূরে ও কাছে বসেছিল। রোড ধরে প্রতি দশ মিনিট পর পর এক-একটি গেঁয়ো নিরন্নের দল এসে মাঠের ওপর জমায়েৎ হচ্ছিল। আরও লোক আসবে, আর একটু বেলা বাড়বে, তারপর মিছিল বার হবে।

অদূরে স্বরূপরামের কারখানায় সিটি বাজছিল। মজুরেরা ছুটে চলেছিল দলে দলে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়লো, মাঠের ওপর কংগ্রেস পতাকা উড়ছে।

পথ ভুল হয়ে গেল তাদের। কারখানার শিঙারব আর যেন শুনতে পাচ্ছিল না তারা। কংগ্রেস জিন্দাবাদ! জয়ধ্বনি তুলে মজুরেরা মাঠের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

বেলা বাড়লো। জনতা যেন মাঠ ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়ছে। অদ্ভুত এক নির্ভয়ের নেশায়, মরণজয়ের প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানের গৌরবে হাজার হাজার মাথা ভরাট হ্রদের ঢেউয়ের মত উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

কয়েকজন কর্মী চারদিকে ছুটাছুটি করে জনতার কাছে সংকল্পবাণী পড়ে শোনাচ্ছিল।—এই যুদ্ধ আমাদের জীবনে অমঙ্গলের অভিশাপ নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে কোন সত্য নেই। আমাদের বিনাশের ওপর এই যুদ্ধের আয়োজন চলেছে। যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাছে যুদ্ধের সাহায্য চায়, সেই গভর্নমেণ্ট আমাদের অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

আমাদের বাঁচাবার বেলায় কোন গভর্নমেণ্ট নেই। আমরা মরতে চলেছি। আমরা প্রতিবাদ করবো। আমরা প্রতিটি চালের আড়তে, মার্কেটের ফটকে আর ট্রাম লাইনের ওপর পথ জুড়ে বসে থাকবো। আমাদের মেরে রেখে যারা বাঁচতে চাইছে, তাদের জীবন আমরা আচল করে তুলবো। আমরা খাদ্য চাই, আমরা বাঁচতে চাই। যে-আইন আমাদের ফাঁকি দেয়, সে-আইন আমরা মানবো না।

মত্ত জলস্রোতের মত মিছিলটা যেন মাঠ ছেড়ে রোডের ওপর এসে গড়িয়ে পড়লো। তবু হঠাৎ যেন ছন্দভঙ্গ হয়ে মিছিলটা সেইখানে থমকে গেল কিছুক্ষণের জন্য। মিছিলের পথ রুখে কয়েকটা মোটরকার আর গোটা বিশেক ভদ্রগোছের লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মোটরকারের গায়ে ছোট ছোট লাল পতাকা গোঁজা রয়েছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে অবনী একবার উঁকি দিয়ে দেখলো, চিনতে পারলো—হ্যাঁ তারাই এসেছে।

মিছিলের অগ্রবর্তী জনতার সঙ্গে আগন্তুক লোকগুলির একটা বিতণ্ডা পাকিয়ে উঠছিল।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললো—আমরা জাগৃতি সংঘের কর্মী, কম্যুনিস্ট পার্টির তরফে আমরা বলছি……।

আর একজন জাগৃতিওয়ালা কর্মী এগিয়ে এসে বললো।—খাদ্যের দরকার থাকে তো গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করুন। হাঙ্গামা করে কি লাভ হবে?

অপর একজন এসে আতঙ্কিতের মত চীৎকার করতে লাগলো। —ভয়ানক ভুল করছেন আপনারা। এভাবে খাদ্যের দাবি করলে যুদ্ধের সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে, জাপানীরা ঢুকে পড়বে।

ভিড় ঠেলে মিছিলের আগে এগিয়ে এল শৈলেশ মিস্ত্রি। জাগৃতি-

ওয়ালা কর্মীদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল। —খুব সত্যি কথা বলছেন মশাইরা। আমাদের উচিত ছিল, না খেয়ে দাঁত ছিরকুটে পথে মরে পড়ে থাকা। তাহলেই জাপানীরা পালিয়ে যাবে।

পরমুহূর্তে বিপিনের দিকে তাকিয়ে শৈলেশ মিস্ত্রি উত্তেজিতভাবে হাত দুলিয়ে ইশারা করলো।—এগিয়ে চল।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! জয়রোলে বাতাস আলোড়িত করে মিছিল এগিয়ে চললো। জাগৃতি সংঘের কর্মীরা তবু কিছুক্ষণ ঠেঁটা শেয়ালের মত যেন মিছিলের গা শুঁকে শুঁকে চললো। নানাভাবে আপত্তি করলো, প্রতিবাদ করলো, ঠাট্টা করতেও ছাড়লো না। একটি জাগৃতিওয়ালা কর্মী হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।—এখনো সময় আছে, ভালয় ভালয় মিছিল ভেঙে দিয়ে সরে পড়ুন। নইলে পুলিশ ডাকবো।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম অমানুষের রব এই প্রথম শোনা গেল আজ। জনতার ক্ষমার শক্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে সংযম হারিয়ে ফেললো। সরকারী বিবরের বিষাক্ত অন্ধকারের আশ্রয়ে পুষ্ট এই সাপের মূর্তিগুলির দিকে মিছিলের একটা দল সরোষে তাড়া করে এল। শৈলেশ মিস্ত্রিই দৌড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ জনতাকে বাধা দিয়ে অনুরোধ করলো —যেতে দাও। ছেড়ে দাও। ওদের কথায় কান দিও না।

অনেক দূরে একটা মোটর গাড়ির জানালা দিয়ে একটা লোক গলা বাড়িয়ে দেখছিল। জাগৃতি সংঘের কর্মীদের একটা ফ্যাসিস্তবিরোধী সংঘর্ষ যেন তদারক করছিল জয়ন্ত মজুমদার। হঠাৎ হাত তুলে ইশারায় কর্মীদের পরিত্রাহি ডাকতে লাগলো জয়ন্ত। মিছিলের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে কর্মীরা দৌড়ে চলে গেল।

মিছিল এগিয়ে চললো। বেলা বাড়লো। খিদিরপুরের পুলের

কাছে পৌঁছে গেল মিছিল। একদল পুলিশ আর দুজন সার্জেণ্ট মিছিলের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

দেখা গেল, জাগৃতি সংঘের কর্মীরাও আবার এসেছে। পুলিশদলের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক পরানুচালিত গাধাবোটের গর্বে গদগদ হয়ে ভাস্‌ছে।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! মিছিলের হর্ষ উদ্দাম হয়ে উঠলো। মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলছিল মাথার ওপর।

•

পিসিমার জন্য আজ আতপ চাল ঘি আর ফল আনিয়েছে অরুণা। কিন্তু পিসিমা সারা দুপুর অভিমান করে বসে রইলেন। শুধু মালা জপলেন, খেলেন না কিছুই।

সন্ধ্যেবেলা অনেক সাধাসাধি করার পর একটু ফল মুখে দিলেন পিসিমা। কোন কথা বললেন না। অরুণার দিকে একবার ভাল করে তাকাতেও চান না। অরুণা সামনে এসে দাঁড়ালে বরং কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। একটু সন্দিগ্ধ ও সতর্ক হয়ে ওঠেন।

সকাল থেকে শুধু বিভোরভাবে কাজ করেছে অরুণা। ঘরগুলি ধোয়ামোছা করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে, টেবিল আলমারি সাজিয়ে ব্যস্ত মৌমাছির মত তার একলা মন যেন সারা দিনটাকে কাজের গুঞ্জনের মধ্যে শেষ করে দিয়েছে। পিসিমা খেয়েছেন, তাই অরুণারও এতক্ষণে খাবার সুযোগ হলো, সারাটা দিন উপোসে কাটিয়ে এই সন্ধ্যেবেলা।

আলো জ্বালা হলো, সঙ্গে সঙ্গে সব কাজের খেলাও যেন শেষ হয়ে গেল অরুণার। আর কিছু করবার নেই।

এতক্ষণ জোর করে একটা কথা ভুলেছিল অরুণা—অবনীর কথা। অরুণা মন চায়, অন্যমনা ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ যেন সে চমকে উঠে

দেখতে পায়—অবনী এসে গেছে। সেই হঠাৎ দেখার আনন্দে একেবারে ডুবে যাবে অরুণা। এতক্ষণ সে তাই তার উদ্বিগ্ন মনের সব ভাবনাকে কাজের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। দোর খোলা আছে, সে ফিরে আসবেই। প্রতি মুহূর্তে ভেবে ভেবে আর কি লাভ হবে?

কিন্তু অবনী ফিরে আসেনি।

এক স্বপ্নের মধ্যেই যেন কোন্ ফাঁকে কাল রাতে সে পালিয়ে গেছে। তাকে ভাল করে বলা হলো না, শোনা হলো না, ছোঁয়া হলো না। একবার ফিরে আসুক, ভিরে এসে আবার যেন চলে যায়। কোন বাধা দেবে না অরুণা।

—দিদি আছেন? বারান্দায় উঠে কে যেন ডাকলো।

আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অরুণা। —কে?

—আমি সুকুমার!

—কোন খবর শোনাতে এসেছ নিশ্চয়।

—হ্যাঁ দিদি।

—বল।

—অবনীদা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—কখন্?

—আজ বিকেলে। আজ সারাদিন ধরে সত্যাগ্রহ চলছে দিদি। এখনো থামেনি। আমি যাই। মন খারাপ করবেন না, ভয় পাবেন না। আমি আবার আসবো।

ব্যস্ত সুকুমার কথাগুলি শেষ করে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কপাটটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল অরুণা। মেজের ওপর বসে রইল—মাটীর প্রদীপের মতই একটা শান্ত-মূর্তি।

অরুণা যেন জোর করে বিশ্বাস করতে চায়, সে একা নয়, তার জগৎ

ফাঁকা হয়ে যায়নি। তুমি আছ, তুমি আছ। চারদিকে আমার রয়েছ। নিজেকে একা মনে করলে ভুল হবে, তুমি দূরে সরে যাবে।

আলমারি থেকে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে নিয়ে আলোর সামনে বসলো অরুণা। নতুন পুরণো অনেকগুলি ফটো, অবনীর নানা বয়সের ফটো। একটা একটা করে ফটো চোখের কাছে তুলে দেখছিল। ছেলেমানুষের মতই চঞ্চল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন এক দুঃখ ভোলার খেলাপাতি খেলছিল অরুণা। তার জীবনের মাত্র চারটি বছরের বান্ধব অবনী। তবু জীবনের প্রথম শুভদর্শন ত্রিশ বছর বয়সের অবনীকে যেমন আপন করে চেনা যায়, বাইশ বছরের অবনীও যেন তাই। আঠারো বছরের অবনীকেও কত চেনা মনে হয়। জীবনে কোনদিন, কোন অতীতেও সে যেন অচেনা ছিল না।

বাক্সের ফটোর ভিড় ঠেলে হঠাৎ হাতে উঠলো তের বছর বয়সের অবনীর একটি ফটো। দেখা মাত্র অরুণার বুক ছাপিয়ে একটা চুমোর ঝড় ঠেলে উঠলো। সারা মুখটা হাসির ছটায় মুগ্ধ হয়ে রইল। কংগ্রেসের এক কিশোর ভলান্টিয়ার তের বছর বয়সের অবনী—মাথায় গান্ধী টুপি, বুকে একটা ব্যাজ, গঙ্গাসাগরের মেলায় এক সেবা সমিতির ক্যাম্পে দাঁড়িয়ে আছে।

বাক্স হাতড়ে বার বার খুঁজলো অরুণা। এর চেয়েও ছোট অবনীকে যদি পাওয়া যায়।

এর চেয়েও ছোট অবনী? অরুণার রক্তের অন্ধকারে সুষুপ্ত একটি আবির্ভাব হঠাৎ স্পন্দনে সাড়া দিয়ে ওঠে। একেবারে নিঝুম হয়ে যায় অরুণা। এক নবমুকুলের আবেগের ছোঁয়ায় তার সকল ভাবনার ডালপালাগুলি যেন নিঃশব্দে মদির বাতাস পান করতে থাকে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে অরুণা। সাথীহীন উৎসবের দুঃখের মত আবার

বড় ফাঁকা লাগে। বড় একা। আবার একটা ঝড়ের আতঙ্ক তার সব ভাবনার এই মধুর ঘুম পর মুহূর্তে শিউরে দিয়ে চলে যায়।

অরুণা ডাকলো—পিসিমা।

কোন উত্তর শোনা গেল না পিসিমার। অরুণা ব্যস্তভাবে উঠে এসে পিসিমার ঘরে ঢুকলো। পিসিমা নেই, পিসিমার নামাবলী, জপের মালা আর পেতলের ঘটিটিও নেই।

—যাবেন না পিসিমা। যাবেন না পিসিমা। ঘরের শূন্যতাকে করুণ করে দিয়ে অরুণার গলা থেকে একটা আর্তস্বর ঠিক্‌রে পড়ছিল।

ভেতরের বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো অরুণা। খোলা খিড়কির দরজাটার দিকে তাকিয়ে অসহায়তার বেদনা চরম হয়ে উঠে যেন মনে মনে ডুক্‌রে উঠলো।—যাবেন না পিসিমা, কচি ছেলের সাড়া শুনতে পাবেন, যাবেন না।

খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিয়ে, চোখ মুখ ধুয়ে আবার বাইরের ঘরে এসে বসতেই অরুণা শান্ত হয়ে গেল। এক কঠিন অটলতার শক্তি যেন আবার খুঁজে পেল অরুণা।

রাত হয়ে গেছে। নির্জন পথের সাড়া শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

—দিদি আছেন?

জানালাটা খুলে অরুণা উত্তর দিল—কে?

—আমি শ্রীমন্ত।

—কি খবর?

—অবনীদা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—শুনেছি।

—ইন্দ্রবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন।

জানালার গরাদটা শক্ত করে ধরে অরুণা বললো।—ইন্দ্রবাবু?

—হ্যাঁ। সন্ধ্যে পর্যন্ত ইন্দ্রবাবুই সত্যাগ্রহ চালিয়েছেন। বেচারা বিপিন বড় জখম হয়ে হাসপাতালে গেছে। বেপরোয়া গ্যাস আর লাঠি চার্জ চলছে দিদি।

বিচিত্র এক প্রসন্নতার প্লাবনে অরুণার সারা অনুভবের যত রিক্ততা, যত পরাজয়ের কাঁটা, আক্ষেপ অভিমান ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। শ্রীমন্ত তখনো দাঁড়িয়ে আছে। অরুণা বললো—আচ্ছা এস।

শ্রীমন্ত।—হ্যাঁ, আমি যাই। কোন ভয় করবেন না দিদি। আবার আসবো।

আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসলো অরুণা। আজ আর ঘুম আসবে না কিছুতেই। এইখানে বসে বসে যেন আজ প্রহর গুন্‌বে অরুণা।

একটা পুলিশের পেট্রল কড়া বুটের শব্দে পথের স্তব্ধতা মাড়িয়ে তড়্‌বড়্‌ করে চলে গেল।

আবার কে ডাকলো। —দিদি আছেন?

—কে?

—আমি নৃপেন।

—কি ব্যাপার?

—শিশির বাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—কেন?

—সত্যাগ্রহ করেছেন।

—ঠিক বলছো? সেই শিশিরবাবু তো? না, অন্য কেউ?

—সেই শিশিরবাবু, আমাদের গানের শিশিরবাবু।

—আচ্ছা, এস।

নৃপেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললো—আজ বোধ হয় সারা রাত ধরপাকড়

আর খানাতল্লাসী চলবে। আমি চল্‌লাম। ভাবনা করবেন না দিদি। ভয় নেই, আমরা আছি।

নৃপেন চলে গেছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। তবু আজ রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে পারে না। বসে বসে শুধু প্রহর গুন্‌বে অরুণা।

নিঃশব্দ অন্ধকারের হৃদয়ের তন্তুতে এক আলোকের সুরের তম্বুরা বিভোর হয়ে বাজে—ভয় নেই, আমরা আছি। ভোর হতেই বা আর কত বাকি?

সমাপ্ত